

বুদ্ধের জীবন ধর্ম ও ইতিহাস

THE LIFE, TEACHINGS & THE HISTORY
OF THE BUDDHA & BUDDHISM.



ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো
Ven. Prajnabangsha Mahathero



কল্পতরু বই পিডিএফ প্রকল্প

কল্পতরু মূলত একটি বৌদ্ধধর্মীয় প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান। ২০১৩ সালে “হৃদয়ের দরজা খুলে দিন” বইটি প্রকাশের মধ্য দিয়ে এর যাত্রা শুরু।

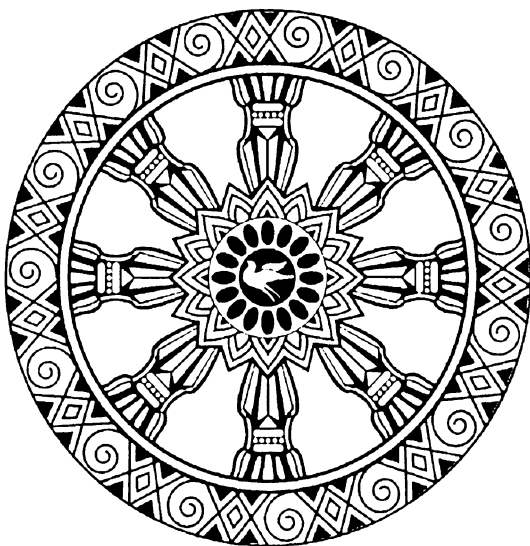
কল্পতরু ইতিমধ্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই প্রকাশ করেছে। ভবিষ্যতেও এ ধারা অব্যাহত থাকবে। কল্পতরু প্রতিষ্ঠার বছর খানেক পর “kalpataruboi.org” নামে একটি অবাণিজ্যিক ডাউনলোডিং ওয়েবসাইট চালু করে। এতে মূল ত্রিপিটকসহ অনেক মূল্যবান বৌদ্ধধর্মীয় বই pdf আকারে দেওয়া হয়েছে। সামনের দিনগুলোতে ক্রমান্বয়ে আরো অনেক ধর্মীয় বই pdf আকারে উক্ত ওয়েবসাইটে দেওয়া হবে। যেকেউ এখান থেকে একদম বিনামূল্যে অনেক মূল্যবান ধর্মীয় বই সহজেই ডাউনলোড করতে পারেন। আমাদের একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে, বর্তমান আধুনিক প্রযুক্তির যুগে লাখো মানুষের হাতের কাছে নানা ধরনের ধর্মীয় বই পৌঁছে দেওয়া এবং ধর্মজ্ঞান অর্জনে যতটা সম্ভব সহায়তা করা। এতে যদি বইপ্রেমী মানুষের কিছুটা হলেও সহায় ও উপকার হয় তবেই আমাদের সমস্ত শ্রম ও অর্থব্যয় সার্থক হবে।

আসুন ধর্মীয় বই পড়ুন, ধর্মজ্ঞান অর্জন করুন!
জ্ঞানের আলোয় জীবনকে আলোকিত করুন!

This book is scanned by Sarbajit Bhante

বুদ্ধের জীবন ধর্ম ও ইতিহাস

The life, teachings & the history
of the Buddha & Buddhism.



ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো

Ven. Prajnabangsha Mahathero

প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী

শ্রীশ্রী ভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার ও প্রজ্ঞাজ্যোতি ধ্যান কেন্দ্র
মোগলটুলি, আখাবাদ, চট্টগ্রাম।

বুদ্ধের জীবন ধর্ম ও ইতিহাস

প্রকাশনায় :-

বিদ্যানিধি চৌধুরী,
তদীয় পত্নী : অঞ্জনা চৌধুরী
পুত্র কন্যা : উৎপল বর্না চৌধুরী
বনশ্রী বর্না চৌধুরী ও গৌতম চৌধুরী
ফতেনগর, রাউজান, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকাল :-

শ্রাবণী পূর্ণিমা ২৫৫২ বুদ্ধবর্ষ
১৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৮ ইং
১৪১৫ বাংলা।

কম্পিউটার কম্পোজ :-

শ্রীমৎ মুদিতারত্ন ভিক্সু
ও
শ্রীমৎ শাসনজ্যোতি ভিক্সু
গহিরা শান্তিময় বিহার
রাউজান, চট্টগ্রাম।

সহযোগীতায় :-

শ্রীমৎ তিলোকাবংশ ভিক্সু
শ্রীমৎ সত্যপাল ভিক্সু
শ্রীমৎ করুণারত্ন ভিক্সু
শাসনবংশ শ্রামণ
শীলালংকার ব্রহ্মচারী
গহিরা শান্তিময় বিহার।

গ্রন্থসত্ত্ব :-

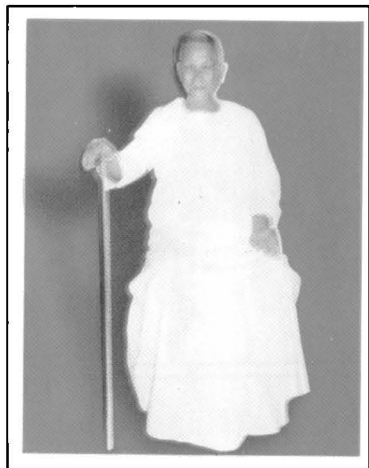
প্রজ্ঞাবংশ একাডেমী কর্তক সংরক্ষিত।

প্রাপ্তিস্থান :-

শ্রাশানভূমি শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার, চট্টগ্রাম।
গহিরা শান্তিময় বিহার, রাউজান, চট্টগ্রাম।
০১৭১৫-০৬৯৭৮২, ০১৮১১-৫৮২৩৮৭,
১৫০/- টাকা মাত্র। (পুণঃ মুদ্রণের জন্য শ্রদ্ধাদান)

শ্রদ্ধাদান :

যাদেৱপূণ্য স্মৃতি স্মরণে

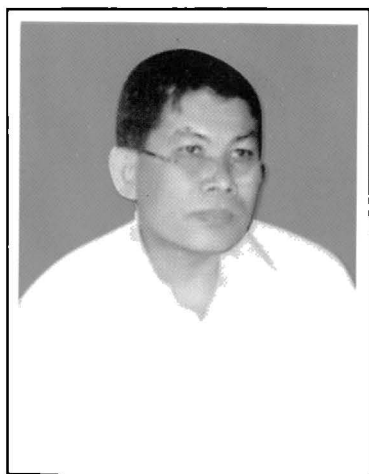


পিতা : আনন্দ মোহন চৌধুরী



মাতা : স্বর্গীয় ননীবালা চৌধুরী

প্রকাশক



পুত্র : বিদ্যানিধি চৌধুরী



পুত্র বধু : অঞ্জনা চৌধুরী



ঐশ্বক্যের উৎসর্গ

আমার জন্মদাতা পিতা

এবং

গর্ভধারিণী মাতাকে

ইতি

ভিক্ষু প্রজ্ঞাবংশ

প্রকাশকের কথা

বিশ্বের সমস্ত ধর্ম দর্শনের প্রবক্তারা জীবন সম্পর্কে ভাবতে শিখিয়েছেন। তাঁরা বলেছেন, আমি মানুষ হিসেবে আমার ভাবা উচিত, বর্তমান জীবনটা আমার কেমন হওয়া দরকার। এ প্রশ্নের সঠিক উত্তরটা পেতে হলে, অবশ্যই আমাকে ফিরে তাকাতে আমার জীবনের অতীত পটভূমিটি কেমন ছিল। জীবনের অতীত ইতিহাস নামক এই শিক্ষা গুরুটাই আমাকে বলে দেবে কিভাবে অতীত থেকে আমার বর্তমান উত্তোরণটি ঘটেছে। অতীত এবং বর্তমানকে যথা সম্যক উপলব্ধি বোধের জাগরণ ঘটাতে পারলেই একজন ব্যক্তি হয়ে যেতে পারেন যথার্থ ভবিষ্যত দ্রষ্টা তথা দার্শনিক। বুদ্ধ তথাগত ছিলেন তেমন একজন দার্শনিক। শুধু দার্শনিকই নহেন তিনি একজন অদ্বিতীয় অনতিক্রম্য বৈজ্ঞানিক ও বটে। মন-নামক চিন্তা বৃত্তিটিকে তিনি যেভাবে চুল ছেঁড়া বিচার-বিশ্লেষণ ও চিন্তা গবেষণা করেছেন, আধুনিক শ্রেষ্ঠ মননশীল ব্যক্তিত্বরা তাতে অবাক বিস্ময়ে খেই হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের অনেকেই বলে থাকেন, নির্বস্ত্র এই মন যা বাতাসের মতো কেবল অনুভব যোগ্য বিষয় মাত্র, তেমন মনটিকে মনোবিজ্ঞানী বুদ্ধ কেমন অসাধারণ, অভাবনীয় যুক্তি উপমা দিয়ে এত গভীর বিভাজন, বিশ্লেষণ করে গেলেন, আড়াই হাজার বছর আগে; তা ভাবলে অবাক বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

তেমন একজন মহান দার্শনিক, মহাবৈজ্ঞানিক বুদ্ধের জীবন তথ্য, তৎপ্রচারিত ধর্ম-দর্শন ও সেই ধর্ম-দর্শনের ক্রম বিবর্তন ইতিহাস প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরম শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়ের মতো বুদ্ধ-ধর্মাভিজ্ঞ একজন বৌদ্ধ সাংঘিক ব্যক্তিত্ব যেভাবে তুলে ধরেছেন তা আমাকে যথেষ্ট আকৃষ্ট করেছে। আমি উপলব্ধি করেছি, লেখক এ গ্রন্থটি শিশু, কিশোর, যুব-প্রবীণ সর্বস্তরের মেধা ও মননশীলতার সামর্থ্যকে তাঁর গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়েই গ্রন্থটির সমগ্র বিষয় বস্তুকে উপস্থাপিত করেছেন। তাই এ গ্রন্থটি সর্বস্তরের পাঠক সমাজের সহজ বোধগম্য এবং মঙ্গলদায়ক হবে মনে করেই পুণঃ প্রকাশের ইচ্ছা করেছি।

শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভাস্কর্যের সাথে আমাদের পরিবারের এক স্মরণীয় কৃতজ্ঞ বন্ধন আছে। তিনি আমার পিতৃতুল্য বড়ো ভাই 'বোধি'কে তাঁর প্রব্রজ্যা জীবনের এক সংকটজনক মুহূর্তে দেব তুল্য রক্ষার ভূমিকা পালন করেছেন। আমার ভাই 'বোধি' ঢাকার বাণিজ্যিক প্রাণ কেন্দ্র বাংলা বাজারে মটর পার্টস ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে চাকুরি করতে এসে তাঁর স্বভাব সুলভ সততা ও চারিত্রিক মাধুর্যতার স্থানীয় ব্যবসায়ী মহলে অতিশয় জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। সেই সুবাদে আমার জন্মভূমি রাউজান থানার ফতেনগর গ্রামে বহু বেকার সন্তানকে একে একে ঢাকার বাংলা বাজারের মটর পার্টস- এর বিভিন্ন দোকানে চাকুরীর ব্যবস্থা করে

দেন। নিজের ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠান পাশাপাশি ঢাকায় নিজস্ব জমির উপর একটি বসতবাড়ী ও গড়ে তোলেন। এত কিছু পরে ও তিনি হঠাৎ সবকিছুর দায়-ভার আমি অভাগার উপর ফেলে দিয়ে ভারতের বুদ্ধগয়ায় চলে যান এবং তথায় উষ্টর রাষ্ট্রপাল ভাস্তের নিকটে দিকপাল ভিক্ষু নাম প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন। বস্তুতঃ তাঁর এই বৈরাগ্য জীবন গ্রহণের মূল উদ্দেশ্য ছিল মহাকারুণিক বুদ্ধের পবিত্র সাধনপীঠ বুদ্ধগয়ায় আপন বিমুক্তি জ্ঞান সাধনার পাশাপাশি জ্ঞাতীপুত্র ভদন্ত রাষ্ট্রপাল ভাস্তের বিশাল কর্মযজ্ঞে সহায়তা দান করা। কিন্তু বিধিবাম। এক পর্যায়ে ভীষণ মর্মাহত হয়ে শ্রদ্ধেয় রাষ্ট্রপাল ভাস্তের সান্নিধ্য ত্যাগ করেন। সম্পূর্ণ অনিশ্চিত ভবিষ্যতকে সামনে নিয়ে বুদ্ধগয়া হতে যেদিন কোলকাতা ধর্মাস্থুরের অধ্যক্ষ মহাপণ্ডিত ধর্মাদার মহাস্থবিরের কক্ষে প্রবেশ করলেন, সেখানেই সাক্ষ্যাত পেলেন পরম শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞাবংশ ভাস্তের। এই সাক্ষ্যাতেই প্রব্রজ্যা জীবনের একটি সম্যক নির্দেশনা লাভ করলো আমার ভাই ভিক্ষু ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ থেরো হতে। তিনি ভাই ভিক্ষু দিকপাল মহোদয়কে নিজের সাথে করে শ্রীলংকা নিয়ে গেলেন এবং একই প্রতিষ্ঠানের আশ্রয়ে উভয়ে পালি ভাষা ও ধর্ম-বিনয়ে শিক্ষা লাভ করে ভারত ও বাংলাদেশে বুদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসারে এক ব্যাপক কর্ম পরিকল্পনা গ্রহণ করলেন। উভয়ের এই কর্ম পরিকল্পনা হতে পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাউজান থানার কদলপুরে জন্ম নিল বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ ও সাধনা কেন্দ্র, শাসন সেবক পালি কলেজ এবং ভারতের উত্তর ত্রিপুরা কাছনপুরে জন্ম নিল শাসন সেবক সঙ্ঘ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ ও সাধনা কেন্দ্র এবং কোলকাতায় ভারতীয় বিদর্শন সাধনা কেন্দ্র সহ আরো বহুবিধ কল্যাণময় কর্মযজ্ঞ।

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো মহোদয়ের সাথে আমাদের এই আত্মিক কৃতজ্ঞ বন্ধনকে অম্লান অক্ষুন্ন রাখার পুণ্যস্মৃতিতে আমাদের এই প্রকাশনা একটি পুণ্যস্মারক হয়ে বিরাজ করুক; এবং আমাদের প্রয়াত মাতা- স্বর্গীয় ননীবালা চৌধুরী ও জীবিত পিতা আনন্দ মোহন চৌধুরী, উভয়ের সদগতি, সু স্বাস্থ্য ও নির্বান শান্তি কামনায় আমরা ‘বুদ্ধের জীবন ধর্ম ও ইতিহাস’ নামক গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণের প্রকাশনা উৎসর্গ করলাম।

সকলের কল্যাণ হোক!

ইতি

২৫৫২ বুদ্ধবর্ষের ২রা জুলাই ২০০৮খৃঃ
বাংলা বাজার, ঢাকা।

ভবদীয় পুণ্যার্থী
বিদ্যানিধি চৌধুরী
পত্নী : অঞ্জনা চৌধুরী
পুত্র ও কন্যা :

উৎপল বর্না চৌধুরী,
বনশ্রী বর্না চৌধুরী, গৌতম চৌধুরী।

কডেনগার, রাউজান, চট্টগ্রাম।

ভূমিকা

বিহার ভিত্তিক শিশু শিক্ষা কার্যক্রমের পাঠ্য পুস্তক রূপে বইটির পাণ্ডুলিপি পরিকল্পিত হয়েছিল, মহামাণ্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদের কর্মকর্তাগণের অনুরোধ; সেই ১৯৮২ থেকে ৮৫খৃঃ পর্যন্ত আমার শ্রীলংকায় অবস্থান কালে। উদ্দেশ্য, বঙ্গীয় বৌদ্ধ বিহার সমূহে শিশুদেরকে শ্রীলংকার ন্যায় সপ্তাহের ছুটির দিনে বুদ্ধের জীবন, তৎপ্রচারিত ধর্ম ও সেই ধর্মের ক্রম বিবর্তনের ঐতিহাসিক রূপরেখার সাথে বৌদ্ধ শিশুদের পরিচিতি গড়ে তোলা। বৌদ্ধ পরিবারে জন্ম নিয়ে যে শিশু পরবর্তীকালে নিজেকে একজন বৌদ্ধ বলে ভাবতে থাকবে; অথচ সেই ধর্মের প্রবক্তা, তৎ ধর্ম দর্শন ও ইহার ক্রমিক বিবর্তন সম্পর্কে কোন সঠিকত ধারণা থাকবে না; তা তো আত্ম প্রবঞ্চনারই সামিল। আবার নিজেকে বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিয়ে কোন ব্যক্তি কেবল বুদ্ধের জীবনটা জানবে, কিন্তু তাঁর ধর্ম-দর্শন বা ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছুই জানবে না; এমনটিতো অন্ধের হাতি দর্শন তুল্যই হবে।

বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের সাধারণ মানুষ থেকে ব্যবহারিক উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি পর্যন্ত এ যাবত সেই আত্ম প্রবঞ্চক এবং অন্ধের তুল্যই আচরণ করে চলেছেন আপন ধর্ম দর্শন, তার প্রবক্তা ও ইতিহাস সম্পর্কে। অন্যান্য ধর্মে ঈশ্বর, স্রষ্টা-ইত্যাদির ন্যায় ধারণা বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনে আছে কি, না; এমন প্রশ্নের সঠিক জবাব দিতে গিয়ে অনেক উচ্চ শিক্ষিত বৌদ্ধ ও হতভম্ব হতে দেখা যায়; এবং ‘যেন তেন পকারেন’ উত্তর দিতে গিয়ে অনেক সময় বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের বহির্ভূত মনগড়া ধারণাই ব্যক্ত করে থাকে। অত্যন্ত লজ্জা এবং পরিতাপের বিষয় এই যে, বঙ্গীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শতকরা আশিজন ভিক্ষু পর্যন্ত বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের উপর প্রশ্ন করলে যথার্থ উত্তর দিতে এখনো অক্ষম।

বুদ্ধের জীবন, ধর্ম ও ইতিহাস- গ্রন্থটি বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের সেই কলঙ্ক মোচন করবে; এ প্রত্যাশায় গ্রন্থের পাণ্ডুলিপিটি তৈরী হয়ে ও বেশ কয়েক বছর মুদ্রণের মুখ দেখেনি। অতঃপর ১৯৮৯ খৃস্টাব্দে আমি রাউজানের কদলপুরস্থ বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র পরিচালনার দায়িত্ব আমার একান্ত সহকর্মী প্রয়াতঃ সুগতপ্রিয় ভিক্ষুর উপর ন্যস্ত করে, বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতির আহ্বানে চট্টগ্রাম মহানগরীর চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের দায়িত্ব গ্রহণ করি। সে সময়ে আছদগঞ্জের লব্ধ প্রতিষ্ঠ তরুণ ব্যবসায়ী ফটিকছড়ির জাঁহাপুর গ্রামের উপাসক দীপক বড়ুয়া ও তদীয় পত্নী পাণ্ডুলিপিটি প্রকাশনার স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ব গ্রহণ করেন ১৯৯১ খৃস্টাব্দে।

আজ বহু বছর গত হয়ে গেল গ্রন্থটির পুণঃ মুদ্রণ করতে। অথচ বহুদিন যাবত অনেকেই পেতে চেয়েছেন আমার লেখনি জীবনের প্রথম প্রকাশিত সেই গ্রন্থটির একটি কপি। আমার ভ্রাম্যমান জীবনে এ গ্রন্থটির একটি কপি, এমনকি আমার ও হাতের কাছে ছিল না। কোলকাতায় ভারতীয় বিদর্শন ধ্যান কেন্দ্রের প্রতিষ্ঠাতা আয়ুত্মান দিকপাল মহাস্থবিরের ভিক্ষু জীবনের সাথে আমার কর্ম সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার সুবাদে তার ছোট ভাই ঢাকা বাংলা বাজারের লব্ধ প্রতিষ্ট ব্যবসায়ী রাউজানের ফতেনগর (বড় মগের পাড়া) নিবাসী স্নেহ ভাজন উপাসক বিদ্যানিধি চৌধুরী ও তদীয় পত্নী অঞ্জনা চৌধুরাণীর উদ্যোগে এবার গ্রন্থটি পুণঃ মুদ্রণের মুখ দেখেছে। তাদের এ মহৎ ত্যাগের জন্যে জানাই আন্তরিক সাধুবাদ। বুদ্ধের জীবন, ধর্ম ও ইতিহাস- এর এটি দ্বিতীয় সংস্করণ ও বটে। তাই গ্রন্থটির বিভিন্ন পর্বে সংযোজিত ও সংশোধিত হয়েছে অনেক বিষয়। সেই সাথে 'বিবিধ পর্যায়' রূপে সংযোজিত হয়েছে বুদ্ধ ধর্ম ও বৌদ্ধ সমাজ বিষয়ক আমার লিখিত কয়েকটি প্রবন্ধ সংগ্রহে প্রকাশিত হয়েছে। আশাকরি, এই সংযোজন গ্রন্থটির পরিপূর্ণতার সহায়ক যেমন হবে; সেই সাথে গুরুত্ব ও বাড়াবে।

সাধুবাদ জানাই স্নেহভাজন বিদ্যানিধিকে তার পিতা-মাতার পুণ্যস্মৃতিতে শিশু যুব সকলের বুদ্ধজ্ঞান লাভে উপযোগী এ গ্রন্থটি প্রকাশনার স্বতঃস্ফূর্ত দায়িত্ব গ্রহণে। স্মরণীয় হয়ে রইলো সেদিনের স্মৃতিটি এ প্রকাশনার মাঝে। বহু বছর আগে সেই ১৯৮৫ খৃস্টাব্দে বিদ্যানিধির বড়ো ভাই স্নেহভাজন দিকপাল ভিক্ষুকে নিয়ে শ্রীলংকা হতে জন্মভূমি চট্টগ্রামে ফেরার পথে ঢাকার এই বাংলা বাজারে প্রথমবার এসেছিলাম। মাঝখানে আরো একবার এসেছিলাম চট্টগ্রাম নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারে উপাধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন কালে (১৯৮৯-৯৬)। তারপর নানা কারণে ঢাকার এই বাংলা বাজারে আর আসা হয়নি। ২০০৮ খৃস্টাব্দের ৪ঠা এপ্রিল শুক্রবারে আমার ভক্ত তরুণের পত্নী পপির ঐকান্তিক আগ্রহে চট্টগ্রামের গহিরা হতে ঢাকা বাংলা বাজারে আমি সশিষ্যে গমন করি। তাদের বাসায় সংঘদানে অংশ গ্রহণ করতে স্নেহ ভাজন বিদ্যানিধিও উপস্থিত হয়। আর সেখানে এক পর্যায়ে বিদ্যানিধি নিজেই প্রস্তাব করেন আমার লিখিত কোন একটি গ্রন্থ সে প্রকাশ করার দায়িত্ব গ্রহণ করতে ইচ্ছুক। তাঁর সেই সদৃষ্টিয়ার সূত্র ধরেই আজ বহুকাল ধরে দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ 'বুদ্ধের জীবন ধর্ম ও ইতিহাস'টি পুণঃ প্রকাশের সুযোগ এলো। বস্তুতঃ মদুনাখীল গ্রামের বর্তমান শ্রী সৌভাগ্যের মূলে রয়েছে পত্নীটির আপামর বাসিন্দাদের ধর্ম প্রানতা। প্রতিবেশী ছোট বড় সকল বৌদ্ধ পত্নী হতে এ পত্নীর জনগণের মধ্যে ত্রিরত্নে শ্রদ্ধা-ভক্তি, ভদ্রতা-নম্রতা, পারস্পরিক মান্য-গণ্যতা অতি সহজেই চোখে পড়ে। আমি প্রিয়ভাজন দিকপাল ভিক্ষুর মুখেই শুনেছি, তাদের এই ধর্ম প্রাণতার বীজ বপনকারী ছিলেন বিনয়াচার্য ভদন্ত জিনবংশ মহাস্থবির। সেই জিনবংশ

মহাস্থবিরের অত্যন্ত প্রিয়ভাজন ব্যক্তি ছিলেন এ গ্রন্থের প্রকাশক বিদ্যানিধি চৌধুরীর পিতা আনন্দমোহন চৌধুরী। সারাজীবন ভর তিনি পঞ্চশীলকে আপন জীবনের অঙ্গে পরিণত করে এখন সগৌরবে মহনীয় জীবনের প্রান্তসীমায় উপস্থিত হয়েছেন। সেই মহনীয় পিতারই দুই কীর্তিমান পুত্র আয়ুস্মান দিকপাল মহাস্থবির এবং স্নেহভাজন বিদ্যানিধি চৌধুরী। তারা উভয়েই পিতার ধর্ম প্রাণতাকে আপন জীবনে সগৌরবে সুরক্ষা করায় যে যত্নশীল তার প্রমাণ আয়ুস্মান দিকপাল প্রতিষ্ঠিত কোলকাতাস্থ ভারতীয় বিদর্শন ধ্যান কেন্দ্র এবং তার ভাই স্নেহভাজন বিদ্যানিধি কর্তৃক বিভিন্ন ধর্মীয় কর্মকাণ্ডের অন্যতম 'বুদ্ধের জীবন ধর্ম ও ইতিহাস' গ্রন্থের প্রকাশনা। আমি তাঁদের এই মাস্টলিক জীবনের উত্তোরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।

ঢাকার বাংলা বাজারস্থ বড়ুয়া ব্যবসায়ী ও কর্মজীবীদের নিয়ে কিছু কথা এ প্রসঙ্গে বলা প্রয়োজন মনে করি। এ বিষয়ে প্রারম্ভিক কথাগুলো আমার অতীব প্রিয়ভাজন ভিক্টু দিকপালেরই বলা কথা। বোধি- নামে গৃহী জীবনে সমধিক পরিচিতি আজকের দিকপাল মহাথেরো স্বগ্রামের বেকার যুবকদের কর্মসংস্থানের একক দায়িত্ব গ্রহণ করে, একে একে অনেকজনকে রাউজানের মদুনাখীল গ্রাম হতে ঢাকার বাংলা বাজারে নিয়ে এসেছিলেন; এবং স্ব জীবিকাস্থল মটর পার্টস এর ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহে তাদের চাকুরী পাওয়ার যাবতীয় দায়-দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। স্ব-রক্ত দরদী বোধি চৌধুরীর সেদিনের সেই মাস্টলিক উদ্যোগের ফলশ্রুতিতেই যুগ যুগ ধরে দারিদ্র পীড়িত রাউজান থানার এই ক্ষুদ্র বৌদ্ধ পল্লীর সন্তানেরা আজ বাংলাদেশের রাজধানী এই ঢাকা মহানগরীর বুকে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী বৌদ্ধ জনবসতির জন্ম দিল, চট্টগ্রামের আছদগঞ্জস্থ বড়ুয়া ব্যবসায়ীদের ন্যায়। মটর পার্টস- এর ব্যবসা বৌদ্ধিক আদর্শের অনুকূল এবং দ্রুত অগ্রসর মান আধুনিক যান্ত্রিক শিল্পের অন্যতম লাভজনক একটি জীবিকা। অতি স্বল্পতম পুঁজি নিয়ে শুরু করে বিশাল অংকের পুঁজি বিনিয়োগের সুযোগ সদা বিদ্যমান এই ব্যবসাটি শুরু করা তুলনামূলক নিরাপদ ও সহজ। তাই চট্টগ্রামের আছদগঞ্জের ব্যবসায়ীদের ন্যায় যুগ যুগ ধরে একই স্থানে সীমাবদ্ধ না থেকে ঢাকার বাংলা বাজারস্থ এই বড়ুয়া ব্যবসায়ীরা যদি সংঘবদ্ধ ভাবে তাঁদের শাখা ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশের সর্বত্রই ছড়িয়ে দেয়ার উদ্যোগ গ্রহণ করেন; সেই উদ্যোগে সাফল্য লাভের সম্ভাবনা খুবই উজ্জ্বল। বিশ্বের খ্যাতিমান ব্যবসায়ী আগাখান সম্প্রদায় এবং মারোয়াড়ী সম্প্রদায় দ্বয় স্ব সমাজের সকল যুবক-যুবতীদেরকে নিজেদের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান সমূহে প্রশিক্ষণ ও অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের সুযোগদানের মাধ্যমে সাংঘিক উদ্যোগেই সারা বিশ্বে পুণঃবাসন করে যাচ্ছেন শতাব্দী শতাব্দী ধরে।

তাই এ সম্প্রদায়ের লোকেরা জনসংখ্যায় বড়ুয়াদের ন্যায় স্বল্প হলেও শিক্ষা-দীক্ষা, অর্থ বিত্ত ও একতা শৃঙ্খলায় অতিশয় সম্মানিত সম্প্রদায় রূপেই বিশ্ব বুকে ঠিকে আছে। ঢাকার বাংলা বাজারস্থ এই বড়ুয়া ব্যবসায়ীরা এমন একটি আদর্শ সাংঘিক উদ্যোগ গ্রহণ করার পাশাপাশি বিশ্বের ধনী দেশ সমূহে অবস্থানরত বড়ুয়াদের মনযোগ আকর্ষণের উদ্যোগটা ও যদি গ্রহণ করে তাহলে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডলে তাঁদের ব্যবসাকে সম্প্রসারিত করতে খুব সহজেই 'বুডিস্ট ব্যাংক' প্রতিষ্ঠায় সক্ষম যে হবেন, এতে সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস রাউজান থানার ক্ষুদ্র বৌদ্ধ পল্লী মদুনাখীল গ্রামজাত সন্তানেরা নোবেল বিজয়ী ডক্টর ইউনুসের জোবরা গ্রামস্থ তেভাগা খামার ও গ্রামীণ ব্যাংক তুল্য আত্মশক্তির এক মহনীয় আসনে নিজেদেরকে সমাসীন করাটা মোটেই কোন অবাস্তব কল্পনা নহে। এজন্যে মূলতঃ দরকার মহাকারণিক বুদ্ধের 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়'- সেই উদাত্ত বাণীটির সম্যক উপলব্ধি। বড়ুয়া বৌদ্ধদের ন্যায় রাজনৈতিক ও ভৌগলিক অধিকার বিহীন এককালের অসহায় ইহুদী জাতিটি যেভাবে মেধাও বিত্তের বিকাশ ঘটিয়ে আজ আত্মনির্ভর মর্যাদাশীল জাতিতে পরিণত হয়েছে; ঢাকার বাংলা বাজারস্থ মদুনাখীল গ্রামজাত সন্তানদের বর্তমান ব্যবসায়িক সাফল্য পুরো বড়ুয়া সম্প্রদায়টিকে অনুরূপ মেধায় ও বিত্তে সমৃদ্ধশালী করার এক সম্ভাবনাময়ী সুযোগ এনে দিয়েছে। আমার এই সত্য উপলব্ধিটিকে সাহসের সাথে সক্ষম পাঁচজন সন্তান ও যদি ঢাকার বাংলা বাজারস্থ বড়ুয়াদের মধ্যে জন্ম নিয়ে থাকেন; মনে হয় সেদিন বেশী দূরে নহে যে, এদেশে সুদীর্ঘ কালের অভিভাবকহীন বড়ুয়া সম্প্রদায় আত্মমর্যাদায় একটি সত্যিকার আশ্রয় লাভ করবে এবং দেশ-বিদেশের মাটিতে সগৌরবে মাথা উঁচিয়ে দাঁড়াবার শক্তি লাভে সক্ষম হবে।

ভবতু সর্ব মঙ্গলম্!

সকলে মাঝে শুভ চৈতনার উদয় হোক!

শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা

২৫৫২ বুদ্ধবর্ষের ২৩শে আষাঢ়,

১৪১৫ বাংলা,

৭ই জুলাই, ২০০৮ইং

মঙ্গলকামী ভাণ্ডে

প্রজ্ঞাবংশ মহাধ্বনো

পুণ্য তীর্থ রাংকুট বনাশ্রম

রামু, কল্পবাজার।

১। বুদ্ধের জীবন কথা (প্রথম ভাগ)

১। প্রশ্নঃ তুমি কোন ধর্মের অনুসারী?

উত্তর- আমি বুদ্ধ ধর্মের অনুসারী।

২। প্রশ্নঃ এই ধর্মকে কোন ধর্ম বলা হয়?

উঃ এই ধর্মকে বৌদ্ধ ধর্ম বলা হয়।

৩। প্রশ্নঃ বুদ্ধের বাল্য নাম কি?

উঃ বুদ্ধের বাল্য নাম সিদ্ধার্থ।

৪। প্রশ্নঃ কুমার সিদ্ধার্থের মাতা-পিতার নাম কি?

উঃ মাতার নাম মহারাণী মায়াদেবী এবং পিতার নাম রাজা শুদ্ধোধন।

৫। প্রশ্নঃ মহারাজ শুদ্ধোধন কোন রাজ্যের রাজা ছিলেন, এই রাজ্যের রাজধানীর নাম কি ছিল?

উঃ মহারাজ শুদ্ধোধন কপিলরাজ্যে রাজা ছিলেন। এই রাজ্যের রাজধানী ছিল কপিলাবাস্তু।

৬। প্রশ্নঃ কপিলাবাস্তু বাসীরা কি নামে পরিচিত ছিলেন?

উঃ কপিলাবাস্তু বাসিরা শাক্য নামে পরিচিত ছিল।

৭। কুমার সিদ্ধার্থ কখন কোথায় জন্ম গ্রহণ করেন?

উঃ খ্রীষ্ট পূর্ব ৬২৩ সালে লুম্বিনী উদ্যানে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমাতে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন।

৮। প্রশ্নঃ কুমারের জন্মের কতদিন পরে মা মারা যান এবং তখন হতে কে তাঁকে লালন পালন করেন?

উঃ জন্মের সাতদিন পরে মাতা মায়াদেবী মারা যান। এর পর হতে বিমাতা গৌতমী কুমারের দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

৯। প্রশ্নঃ কত বছর বয়সে তিনি বিবাহ করেন?

উঃ তিনি ষোল বছর বয়সে বিবাহ করেন।

১০। প্রশ্নঃ সিদ্ধার্থের স্ত্রী ও পুত্রের নাম কি?

উঃ স্ত্রীর নাম যশোধরা এবং পুত্রের নাম রাহুল।

১১। প্রশ্নঃ সিদ্ধার্থ কত বছর বয়সে এবং কোন সময়ে গৃহত্যাগ করেন?

উঃ তিনি ঊনত্রিশ বছর বয়সে পুত্র রাহুলের জন্ম দিনে শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমার মধ্যরাতে গৃহত্যাগ করেন।

১২। প্রশ্নঃ কি কি বিষয় দর্শনে তিনি গৃহত্যাগে কৃত সংকল্প হয়েছিলেন?

উঃ তিনি নগর ভ্রমণে গিয়ে রোগযন্ত্রণায় কাতর ব্যক্তি, বৃদ্ধ লোক, মৃতদেহ এবং সন্ন্যাসী দর্শন করে গৃহত্যাগে কৃত সংকল্প হয়েছিলেন।

১৩। প্রঃ সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগ কালে কে কে সহায়ক ছিল?

উঃ সারথী, ছন্দক এবং অশ্ব কন্তুক গৃহ ত্যাগকালে তাঁর সহায়ক ছিলেন।

১৪। প্রঃ কোথা থেকে তাদেরকে বিদায় দেয়া হয়েছিল?

উঃ আনোমা নদীর তীর হতে তাদের বিদায় দেয়া হয়েছিল।

১৫। প্রঃ সন্ন্যাস গ্রহণের কত বছর পরে কোথায় এবং কখন তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন?

উঃ সন্ন্যাস গ্রহণের ছয় বছর পরে গয়ার উরুবেলা বনে নৈরঞ্জনা নদীর তীরে এক অশ্বখ বৃক্ষমূলে বৈশাখী পূর্ণিমাতে তিনি বুদ্ধত্ব লাভ করেন।

১৬। প্রঃ কোথায় এবং কাদের নিকট তিনি সর্ব প্রথম বুদ্ধজ্ঞান প্রকাশ করেন?

উঃ বারাণসীর ঋষি পতন মৃগদাবে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমাতে তিনি সর্বপ্রথম ধর্মচক্র প্রবর্তন বা বুদ্ধজ্ঞান প্রকাশ করেন।

১৭। প্রঃ কত বছর বয়সে কোথায় তিনি মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন?

উঃ মহাকারুণিক বুদ্ধ আশি বছর বয়সে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমাতে কুশীনগরে মল্লরাজাদের শাল বনে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

বুদ্ধের জীবন কথা

২য় ভাগ

১। প্রঃ কাদেরকে বৌদ্ধ বলা হয়?

উঃ ভগবান বুদ্ধ নির্দেশিত নীতি আদর্শের যারা অনুসারী বা যাঁরা দুঃখ মুক্তির জন্য জ্ঞানের সাধনা করেন তাঁরাই বৌদ্ধ।

২। প্রঃ বুদ্ধের বাল্য নাম সিদ্ধার্থ রাখা হল কেন?

উঃ কুমারের জন্মে মাতা-পিতার দীর্ঘ মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হয়েছে বলেই বুদ্ধের বাল্য নাম সিদ্ধার্থ রাখা হয়েছিল।

৩। প্রঃ সৎ পুত্র কামনায় রাজা রাণী কিরূপ পুণ্য ব্রত সম্পাদন করতেন?

উঃ সৎপুত্র কামনায় তাঁরা উভয়ে প্রত্যহ স্বহস্তে গরীব দুঃখী ও ভিখারীদের দান দিতেন। শীলবান মুনি-ঋষি ও সাধু সজ্জনকে সেবা-যত্ন করতেন। মহারাণী মায়াদেবী অখন্ড উপোসথ ব্রত পালন করতেন।

৪। প্রঃ কুমার সিদ্ধার্থ পরবর্তী কালে গৌতম নামে কেন প্রসিদ্ধি লাভ করলেন?

উঃ কুমারের জন্মের সাত দিন পর মা মারা গেলে বিমাতা গৌতমী পুত্রাধিক স্নেহে তাঁকে লালন পালন করেন। গৌতমীর এই অকৃত্রিম স্নেহ ও ত্যাগের প্রতি গৌরব প্রদর্শনার্থে সিদ্ধার্থকে গৌতম নামে ডাকা হত।

৫। প্রঃ কুমারের জন্মের পর কে সর্ব প্রথম দর্শন করতে আসেন? তাঁর তাৎপর্য বর্ণনা কর।

উঃ কুমারের জন্মের পর কালদেবলমুনি নামে এক দিব্যজ্ঞান সম্পন্ন ঋষিই সর্ব প্রথম তাঁকে দর্শন করতে আসেন। ঋষি জানতে পেরেছিলেন- এই রাজকুমার জীবের মহামুক্তির পথ প্রদর্শক বহুকল্প দুর্লভ সম্যক সম্বুদ্ধত্ব লাভ করবেন। ঋষি সাধনা প্রভাবে দিব্যশক্তি লাভ করেছেন বটে কিন্তু মহামুক্তি চির শাস্তিময় নির্বাণ লাভ সম্ভব হয়নি। সেই পথ তাঁর জানা নাই। যেদিন এই মহাসত্ত্ব সেই অজানা পথের সন্ধান লাভ করে বুদ্ধ হবেন সেদিন তিনি ইহজগতে থাকবেন না। জীবন বিমুক্তির মহা সূর্যের আলো সৌভাগ্য হতে তিনি বঞ্চিত একথা স্মরণ করে সেদিন কুমার দর্শনে এসে কুমারকে মস্তকে রেখে বন্দনা করে মুণি কেঁদে উঠেছিলেন। নিজ আশ্রমে ফিরে এসে প্রিয় শিষ্য ভাগিনেয় কৌণ্ডিন্যকে বলেছিলেন- “আমি তো ততদিন বাঁচব না, কিন্তু তুমি মহারাজ শুদ্ধোধনের নব-জাত পুত্রের প্রতি লক্ষ্য রেখো। যেদিন তিনি গৃহত্যাগ করেছেন বলে সংবাদ পাবে সেদিন তুমিও তাকে অনুসরণ করবে। এই শিশু একদিন বুদ্ধ হবেন মহাপথের সন্ধান লাভ করবেন। তুমি, তাঁর সাহচর্যে থেকে সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হও। কথিত আছে, এই কৌণ্ডিন্যই ছিলেন কুমারের ভাগ্য-গণনাকারী জ্যোতিষীদের অন্যতম এবং পরবর্তীতে বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্যের প্রধান ও প্রথম মার্গ-ফল লাভী।

৬। প্রঃ কুমারের নামকরণ দিবসে জ্যোতিষীদের অভিমত কি ছিল?

উঃ জ্যোতিষীগণ কুমারের দেহে বত্রিশ মহাপুরুষ লক্ষণ এবং উত্তম নক্ষত্র যোগে জন্ম দেখে মত প্রকাশ করেছিলেন- এই কুমার গৃহে থাকলে চক্রবর্তী রাজা হবেন আর গৃহত্যাগ করলে ভগবান সম্যক সম্বুদ্ধ হবেন। এই দুই সম্ভাবনাই এই মহা পুরুষের মধ্যে বিদ্যমান। জ্যোতিষীদের সকলের ছোট জনের নাম ছিল ত্রিকালদর্শী ঋষি কালদেবলেন ভাগিনেয় কৌণ্ডিন্য মামার মুখে তিনি শুনেছিলেন মহারাজ শুদ্ধোধনের নবজাত সন্তান ভবিষ্যতে বুদ্ধ হবেন। মামার বাক্য ধ্রুবসত্য জেনেই সেই কনিষ্ঠ জ্যোতিষী দৃঢ় কণ্ঠে বলেছিলেন- এই কুমার নিশ্চয়ই সম্যক সম্বুদ্ধ হবেন।

৭। প্রঃ সিদ্ধার্থের ছোট বেলায় স্বভাব কেমন ছিল?

উঃ তিনি শৈশবে চিন্তাশীল, নির্জনপ্রিয় ও গম্ভীর প্রকৃতির ছিলেন।

৮। প্রঃ সন্তানের বৈরাগ্য ভাব দূর করে সংসারের প্রতি আকৃষ্ট করার জন্যে রাজা শুদ্ধোধন কি ব্যবস্থা করেন?

উঃ পুত্রের মন হতে বৈরাগ্যভাব দূর করার জন্যে মহারাজ শুদ্ধোধন নির্দেশ দিয়েছিলেন- কোন বিকৃত জ্বর-বার্ধক্য বা ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি যাতে কশ্মিনকালেও কুমারের চোখে না পড়ে এবং কোন শোক, কান্না, বা দুঃখের স্পর্শ যাতে কুমারকে বিচলিত না করে তার কঠোর ব্যবস্থা করতে। তিনি শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই তিন ঋতুর প্রকোপ কুমারকে যাতে ভোগ করতে না হয় সেরূপ তিনটি পৃথক পৃথক বিলাসবহুল বাসভবন নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। কুমার যাতে সেই তিন প্রাসাদে দিবারাত্র সুন্দরী নারীদের দ্বারা নাচ-গান-বাদ্যে ডুবে থাকতে পারে তার ব্যবস্থাও করে দিয়েছিলেন। এভাবেই রাজা শুদ্ধোধন সেদিন পুত্রকে সংসারে ধরে রাখার আশ্রয় চেষ্টা করেছিলেন।

৯। প্রঃ রাজপুত্র সিদ্ধার্থের গৃহত্যাগের কারণ কি?

উঃ রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ঊনত্রিশ বছর বয়সে স্বপ্নময় রাজ অন্তঃপুর হতে প্রথমবার যখন নগর ভ্রমণে বের হলেন তখন ক্রমান্বয়ে জীবনের অনিবার্য পরিণতি জ্বর-বার্ধক্যের পীড়ন, রোগের উৎকট যন্ত্রণা, মৃত্যুর মতো মহা রাহু, এই তিনটির প্রত্যক্ষ স্বরূপ যেমন উপলব্ধি করলেন তেমনি জীবন দুঃখের এই কারাগার হতে মুক্তির উপায় সন্ধানী সংসার ত্যাগী সন্ন্যাসীর দেখা ও পেলেন। রাজপুরীর কৃত্রিম পরিবেশে জন্মাবধি পালিত হয়ে তিনি মনে করেছিলেন এই জীবন চির যৌবনের আনন্দে সদা মুখরিত। জীবন মানেই আনন্দ-উল্লাস আর ভোগ-বিলাস। কিন্তু নগর ভ্রমণ বাস্তব জীবনের যে দৃশ্য তাঁর সামনে তুলে ধরল তা প্রবল বেগে এতদিনের সুচির পোষিত বিশ্বাসকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিল। জীবন যেন এক ভয়াবহ দুঃস্বপ্ন, যেন এক জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড রূপেই প্রতীয়মান হতে লাগল রাজপুত্র সিদ্ধার্থের নিকট। এর থেকে পরিত্রাণ লাভের এক আকুল কামনাই তাঁর গৃহত্যাগের কারণ।

১০। প্রঃ সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের পর তিনি কি করেছিলেন এবং কি অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন?

উঃ রাজপুত্র সিদ্ধার্থ সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণের পর বৈশালীতে অবস্থানরত তৎকালীন প্রখ্যাত দুই ঋষি আড়ার কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের আশ্রমে গিয়ে তাঁদের নির্দেশিত পদ্ধতিতে ধ্যান করে জানতে পারলেন- এই সাধন পদ্ধতিতে ব্রহ্মলোকের সুদীর্ঘ ধ্যান সুখ ভোগ করা যায়, কিন্তু পুনঃ পুনঃ জন্ম মৃত্যু জনিত দুঃখ হতে অব্যাহতি লাভ করা যায় না।

১১। প্রঃ আড়ার কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের আশ্রয় ত্যাগ করে পরে তিনি কোথায় আসলেন?

উঃ এই দুই ঋষির নির্দেশিত পথে বহু ধ্যান সমাধি লাভ করেও তৃপ্ত হতে না পেরে তিনি ক্রমান্বয়ে অনুসন্ধান করতে করতে উরুবেলা উপবনে কৃচ্ছ সাধনারত কৌণ্ডাঞা, বপ্প, ভদ্রিয়, অশ্বজিত, মহানাংম এই পঞ্চবন্ধুর উপনিবেশে এসে তাঁদের সাথে কচ্ছ সাধনায় যোগদান করলেন।

১২। প্রঃ কচ্ছ সাধনা কি? কতদিন তিনি এই সাধনায় অতিবাহিত করলেন এবং তার পরিণাম ফল কি হল?

উঃ এই দেহই সমস্ত দুঃখের কারণ। অতএব, এই দেহকে পীড়নের মাধ্যমেই দেহ ধারণজনিত দুঃখ হতে মুক্ত হওয়া যায়- এই বিশ্বাসের বশবর্তী হয়ে নানাবিধ উপায়ে দেহকে পীড়নের নামই কচ্ছ সাধনা। সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ এই সাধনায় প্রায় ছয় বছর কাল অতিবাহিত করেছিলেন। কচ্ছ সাধনায় সিদ্ধার্থের বীর্যপরাক্রমতা এবং কঠোরতা এত অধিক ছিল যে অন্যান্যরা বিস্ময়াভিভূত হয়ে তাঁকেই গুরুপদে বরণ করে নিলেন। এই নবীন সন্ন্যাসী শীঘ্রই শ্রেষ্ঠ মোক্ষ লাভে সক্ষম হবেন- এই বিশ্বাসে অন্যান্যরা তাঁর সেবায় নিযুক্ত হলেন। কিন্তু, সিদ্ধার্থ সারাদিনে মাত্র একটি তড়ুল কণা মুখে দিতেন, মাত্র এক ফোটা জল গলধকরণ করতেন। এমন করতে করতে তিনি অস্থি-কঙ্কাকালসার হলেন। মাথার চুল, গায়ের লোম ঝরে ঝরে পড়তে শুরু করল। স্মৃতিশক্তি প্রায় বিলোপ হল। এভাবে একদিন তিনি মুর্ছিত হয়ে মাটিতে উপুড় হয়ে পড়ে গেলেন।

১৩। প্রঃ কচ্ছ সাধনায় সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থের কি অভিজ্ঞতা লাভ হল? এবং পরবর্তী পর্যায়ে তিনি কি করলেন?

উঃ কচ্ছ সাধনায় তিনি বুঝতে পারলেন দেহকে যাতনা দিয়ে মুক্তি লাভ অসম্ভব। দেহের সাথে মনের গভীর সম্বন্ধ। দেহ দুর্বল হলে মনও দুর্বল হয়। দুর্বল মন সর্বদা বিক্ষিপ্ত ও চঞ্চল থাকে। এরূপ অসমাহিত চিন্তে বিমুক্তি জ্ঞান লাভ অসম্ভব। এই অভিজ্ঞতা লাভের পর তিনি কচ্ছ সাধনা পরিত্যাগ করে নিয়মিত পানাহারের মাধ্যমে দেহ মনের ভারসাম্যতা, সজীবতা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করলেন।

১৪। প্রঃ সিদ্ধার্থের এই ব্রত ভঙ্গে শিষ্যদের মনে কিরূপ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হল?

উঃ সিদ্ধার্থের জীবন যাত্রার এই পরিবর্তনে শিষ্যগণ মনে করলেন গুরুদেবের সাধনার উৎসাহ ক্ষীণ হয়ে গেছে এবং তিনি পথ ভ্রষ্ট হয়েছেন। অতএব, তাঁর নিকট অবস্থান করে আর কোন লাভ নেই। তাই তাঁরা সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থকে ত্যাগ করে চলে গেলেন।

১৫। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের এই প্রত্যাখ্যান সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থের মনে কি প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করল?

উঃ যে দিন সিদ্ধার্থ উরুবেলার নিকটস্থ সেনানী গ্রামের শ্রেষ্ঠীর কন্যা সুজাতার পায়সান্ন গ্রহণ করে ছিলেন সে দিনই শিষ্যরা তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়ে ছিলেন। সম্ভবতঃ সেদিনের এই প্রত্যাখ্যান শাক্য সিংহ সিদ্ধার্থের পৌরুষে দারুণ আঘাত হানে। ফলে সে দিনের আহারাণ্ডে স্বীয় ভিক্ষা পাত্রটি নৈরঞ্জনার গর্ভে নিক্ষেপ করে সেখানেই এক অশ্বখ বৃক্ষ মূলে বিমুক্তি লাভার্থে তিনি এক বজ্র কঠোর সংকল্প গ্রহণ পূর্বক আসন গ্রহণ করে ছিলেন।

১৬। প্রঃ শাক্য সিংহ সিদ্ধার্থের বজ্রকঠোর সংকল্পটি কি? বজ্রাসন কাকে বলে?

উঃ শিষ্যদের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়ে সেদিন সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ এরূপ কঠোর সংকল্পই গ্রহণ করে ছিলেন—

এ আসনে শরীর মোর যাক্রে শুকায়ে,

চর্ম, মাংস, অস্থি যাক্ বিলীনরে হয়ে;

বহুকল্প দূর্লভ এই অপ্রাপ্য বোধি,

টলিবেনা দেহ কভু সে বোধি না লভি।

এরূপ কঠোর সংকল্পের কারণেই সে আসন পরবর্তীকালে বজ্রাসন নামে বিখ্যাত হয়েছে।

১৭। প্রঃ সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ কখন বুদ্ধত্ব জ্ঞান লাভ করেন?

উঃ যে দিন অপরাহ্নে তিনি বজ্রকঠোর সংকল্প নিয়ে আসন গ্রহণ করেছিলেন সেই রাত্রির অন্তিম লগ্নে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমায় পরিপূর্ণ চন্দ্রিমার সাথে নৈরঞ্জনা নদী তীরের সেই শান্ত সমাহিত অশ্বখ বৃক্ষ মূলে সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ জীবন দুঃখের চির অবসান করে বুদ্ধত্ব বা জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করেছিলেন।

১৮। প্রঃ বুদ্ধ, বোধি ও বোধি বৃক্ষ বলতে কি বুঝায়?

উঃ বোধ-শব্দমূল হতেই ‘বোধি’ শব্দের উৎপত্তি। ‘বোধি’ শব্দের অর্থ বোধশক্তি বা উপলব্ধির ক্ষমতা বা জ্ঞান। অতএব ‘বোধি’ শব্দের অর্থ জ্ঞানের অধিগম বা জ্ঞানকে পরিপূর্ণ ভাবে আয়ত্ত্ব করণ। যিনি বিমুক্তিগামী এই বোধি বা জ্ঞানকে আয়ত্ত্ব করতে পেরেছেন তিনিই মহা জ্ঞানী বা বুদ্ধ।

সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ যে অশ্বখ বৃক্ষ মূলে জীবন দুঃখের অবসানে জ্ঞান লাভ করেছিলেন সেই বৃক্ষকেই লোকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে বোধিবৃক্ষ বলে। এই বৃক্ষ বৌদ্ধদের নিকট অতি শ্রদ্ধা ও গৌরবের বস্তু।

বুদ্ধের জীবন কথা

৩য় ভাগ

১। প্রঃ কপিলাবাস্তু ও লুম্বিনী কোথায় ছিল?

উঃ কপিলাবাস্তু বর্তমান ভারতের উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত, নেপাল সীমান্ত হতে ৩০ মাইল দক্ষিণে রোহিনী নদীর তীরে অবস্থিত এবং লুম্বিনী বর্তমানে নেপালের দক্ষিণ সীমান্ত এলাকার দেবদহ নামক স্থানে অবস্থিত।

২। প্রঃ কপিলাবাস্তু নগর কিরূপে নির্মিত হয়?

উঃ প্রাচীনকালে গৌতম বোধিসত্ত্ব কপিল নামে এক মহাতাপস ছিলেন। বহু শিষ্য পরিবেষ্টিত হয়ে সেই তাপস এই কপিলাবাস্তুর বনে তপঃ চর্যা পালন করতেন। সে সময়ে অযোধ্যার রাজার নাম ছিল ইক্ষাকু। তাঁর চারিপুত্র পিতৃসত্য পালনের জন্যে বহু পাত্র মিত্র সহ তাপস কপিলের এই তপোবনে উপনীত হন। কিছুকাল পর তাপস রাজকুমারগণকে এই তপোভূমিতে নগর নির্মাণের অনুমতি দিয়ে শিষ্যসহ হিমালয়ে প্রস্থান করেন। তাপসের আদেশ মতে রাজকুমারেরা এক মনোরম নগর নির্মাণ করে তার নাম রেখে ছিলেন কপিলাবাস্তু। এভাবেই কপিলাবাস্তু নগর নির্মিত হয়।

৩। প্রঃ মহারাজ শুক্লোধন কোন বংশীয় রাজা ছিলেন? এই বংশের পূর্ব নাম কি? এ সকল নামের উৎপত্তি বর্ণনা কর।

উঃ মহারাজ শুক্লোধন ছিলেন শাক্য বংশীয় রাজা। শাক্য বংশের পূর্ব নাম ছিল ইক্ষাকু বংশ। ইক্ষাকু বংশের উৎপত্তি হয় রঘু বংশ হতে। রামচন্দ্রের পিতা অযোধ্যার রাজা দশরথ ছিলেন এই বংশের প্রাচীনতম রাজা। রাজা রামচন্দ্রের ৬০ পুরুষ পরে এই বংশে রাজপুত্র সিদ্ধার্থের জন্ম হয়। এ হিসাবে আমাদের গৌতম বোধিসত্ত্বকে রাম চন্দ্রের ৬১ তম বংশধর বলা হয়।

৪। প্রঃ বোধিসত্ত্ব কাকে বলে? বোধিসত্ত্ব হিসেবে রাজপুত্রে সিদ্ধার্থের পরিচয় দাও।

উঃ যাঁরা বোধি বা বুদ্ধত্ব লাভের জন্যে বহু জন্ম ধরে দশবিধ পারমী সম্ভার পরিপূর্ণ করেন তাঁকেই বলা হয় বোধিসত্ত্ব বা ভাবী বুদ্ধ। বোধি বা জ্ঞানের সাধক যেই ব্যক্তি বা সত্ত্ব তিনিই বোধিসত্ত্ব নামে অভিহিত। রাজপুত্র সিদ্ধার্থ ছিলেন একজন বোধিসত্ত্ব। তিনি চারি অসংখ্য লক্ষ কল্প পূর্বে দীপঙ্কর বুদ্ধের সময় সুমেধ তাপস নামে পরিচিত ছিলেন। এই সুমেধ তাপস একদিন বুদ্ধের আগমন পথে একটি কাদায়ুক্ত স্থানে গুয়ে পড়ে তাঁর দেহের উপর পা রেখে সেই কর্দম পার হওয়ার জন্যে বুদ্ধকে প্রার্থনা জানালে, বুদ্ধ তাপসের প্রার্থনা পূর্ণ করলেন। তাপস এভাবে বুদ্ধকে পূজা করে প্রার্থনা করলেন যে- এই পুণ্যে যেন দীপঙ্কর বুদ্ধের মতই তিনি ভবিষ্যতে একজন বুদ্ধ হতে পারেন। তাপসের এরূপ প্রার্থনায় সেদিন মহাকারুনিক দীপঙ্কর বুদ্ধ ভবিষ্যদ্বানী করেছিলেন এই তাপস

ভবিষ্যতে ভদ্র কল্পে গৌতম বুদ্ধ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করবেন। বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বানী লাভের পর চারি অসংখ্য লক্ষ কাল ধরে বহু জন্ম গ্রহণের মাধ্যমে দশবিধ পারমীর পরিপূর্ণতা সাধন করেন। দীপঙ্কর বুদ্ধ হতে ২৭ বুদ্ধান্তর কল্পে রাজা বেস্ণান্তর জন্মে দান পারমীর শেষ অনুষ্ঠান স্বরূপ স্বীয় স্ত্রী পুত্রকে দান করে দানবীর বেস্ণান্তর নামে তিনি প্রসিদ্ধ হয়েছিলেন। এই জন্মের অবসানে তিনি তুষিত দেবলোকে উৎপন্ন হন। দেবলোক হতে চ্যুতির পর কপিলাবাস্তুর রাজা শুদ্ধোধনের প্রধান মহিষীর গর্ভে সর্বশেষে জন্ম গ্রহণ করে গৌতম বুদ্ধ নামে তিনি জগৎ পূজ্য হন।

৫। প্রঃ কল্প কি? মহাকল্প ও বুদ্ধান্তর কল্পের পরিচয় দাও।

উঃ কল্প বলতে এক ব্যাপক অনন্তকাল পরিধি বা সময় বুঝায়। এই সময় কালকে সংখ্যার সাহায্যে দেখানো সম্ভব হয় না বলে উদাহরণ দিয়েই প্রকাশ করা হয়। সে হিসাবে মহা কল্প বলতে- একটি এক যোজন বা ৮ মাইল দৈর্ঘ্য, ৮ মাইল প্রস্থ, ৮ মাইল গভীর এরূপ বর্গাকৃতির চৌবাচ্চা সরিষা বীজ দ্বারা পরিপূর্ণ করে একশত বছর পর পর একটি একটি মাত্র সরিষা বীজ যদি ঐ চৌবাচ্চা হতে অন্যত্র সরানো যায় এভাবে চৌবাচ্চাটি সম্পূর্ণ খালি হতে যত সময়ের প্রয়োজন তার নাম মহাকল্প। জগতে এক সময়ে একজন মাত্র সম্যক্ সম্বুদ্ধের আবির্ভাব হয়ে থাকে। ইহাই সম্যক্ সম্বুদ্ধগণের ধর্মতা। এরূপ একজন বুদ্ধের আবির্ভাব এবং তাঁর প্রচারিত ধর্ম যতদিন পর্যন্ত পৃথিবীর মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে সেই সময় কালকে এক বুদ্ধের শাসন বলা হয়। এরূপ এক সম্যক্ সম্বুদ্ধের শাসনের অবসানের পর অন্য একজন বুদ্ধের আবির্ভাব না হওয়া পর্যন্ত মধ্যবর্তী সময়কে বুদ্ধান্তর কল্প বলা হয়।

৬। প্রঃ পারমী কাকে বলে? এর পরিচয় দাও।

উঃ পারঙ্গমতা বা সক্ষমতা অর্থে পারমী। পারমী হল চিন্তের কতগুলো সংবৃতি বা চেতনা জাত শক্তি যা পুনঃ পুনঃ চিন্তক্ষেত্রে উৎপন্ন করে কায়-মন বাক্যে সম্পাদনের মাধ্যমে সেই শক্তির পূর্ণতা দান করলে বুদ্ধ চিন্ত বা বুদ্ধত্ব জ্ঞান অধিগত করা যায়।

এই পারমীর মোট সংখ্যা দশটি যথাঃ- ১। দান পারমী, ২। শীল পারমী, ৩। নৈক্রম্য (প্রব্রজ্যা গ্রহণ) পারমী, ৪। প্রজ্ঞা পারমী, ৫। বীর্য (পরাক্রমতা) পারমী, ৬। ক্ষান্তি পারমী, ৭। সত্য পারমী, ৮। অধিষ্ঠান পারমী, ৯। মৈত্রী পারমী, ১০। এবং উপেক্ষা পারমী। এই পারমী বা চিন্ত বৃত্তিগুলোকে পারমী, উপ-পারমী ও পরমার্থ পারমী এই ত্রিবিধ উপায়ে পরিপূর্ণতা দান করতে হয়। যেমন- পুত্র, ধন প্রভৃতি বাহ্যিক বস্তু দান করাকে দান পারমী, স্বীয় দেহের কোন অংশ দান করাকে দান উপ-পারমী এবং স্বীয় জীবন দান করাকে দান পরমার্থ পারমী বলে। বোধিসত্ত্ব উক্ত ত্রিবিধ পর্যায়ে উপরোক্ত দশটি পারমীকে পরিপূর্ণতা দান করে সম্যক্ সম্বুদ্ধত্ব লাভ করেছিলেন।

৭। প্রঃ বোধিসত্ত্ব কোন তিথিতে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন এবং এ সময়ে মায়াদেবী কিরূপ স্বপ্ন দর্শন করেন?

উঃ বোধিসত্ত্ব আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে মাতৃগর্ভে প্রবেশ করেন। বোধিসত্ত্বের মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণের সময় মা মায়াদেবী স্বপ্নে দেখলেন যে, চারিলোকপাল দেবতা তাঁর শয়ন পালঙ্কসহ তাঁকে বহন করে নিয়ে হিমালয়ের অনোমতগু হ্রদে স্নান করালেন। অতঃপর দিব্য সুগন্ধি যুক্ত বস্ত্রাবৃত করে এক রজত পর্বতের কণক বিমানে পূর্ব শিরে শয়ন করালেন। অল্পক্ষণ পর শ্বেত পদ্ম গুণ্ডে ধারণ করে এক শ্বেত হস্তী কৌঞ্চনাদ করতে করতে উত্তর দিকে হতে সেই বিমানে প্রবেশ পূর্বক শয্যাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে তাঁর দেহের দক্ষিণ পার্শ্ব ভেদ করে কুক্ষিতে প্রবেশ করলেন।

৮। প্রঃ রাজকুমার বোধিসত্ত্ব কোথায় ভূমিষ্ঠ হয়েছিলেন? এ সময়ে কি কি অলৌকিক দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল?

উঃ মহারাণী কপিলাবাস্তু হতে দেবদেহের পিতৃগৃহে যাওয়ার পথে লুম্বিনী উদ্যান নামক কুঞ্জ বনে শুভ বৈশাখী পূর্ণিমার পবিত্র তিথিতে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। বোধিসত্ত্বের সেই জন্ম লগ্নে পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল। কথিত আছে, মাতৃ জঠর হতে নিষ্ক্রান্ত হওয়ার পর মূহুর্তে তিনি একটি কিশোর সদৃশঃ ভূমিতে দণ্ডায়মান হওতঃ উত্তর দিকে সপ্তপদ বিক্ষেপে অগ্রসর হয়ে সিংহ নাদে বলেছিলেন— ‘আমিই জ্যেষ্ঠ আমিই শ্রেষ্ঠ। এই আমার শেষ জন্ম। আমার আর পুনঃ জন্ম নাই।’ তাঁর এই সিংহনাদ কালে পৃথিবী কম্পিত হয় এবং সাতটি পদ বিক্ষেপ স্থলে সাতটি পদ্ম বিকশিত হয়ে উঠে। ইহার মহাসত্ত্বের জন্ম জন্মান্তরের পারমী শক্তি জাত ঋদ্ধি; যা ক্ষণিক মাত্র স্ফূর্তিত হয়ে পরে বুদ্ধত্ব লাভের পূর্ব পর্যন্ত সুগুণ অবস্থা প্রাপ্ত হয়েছিল।

৯। প্রঃ রাজপুত্র সিদ্ধার্থ যে ভবিষ্যতে দয়া, মৈত্রী ও করুণার প্রতীক রূপী মহাপুরুষ হবেন শৈশবে তার কি কি প্রমাণ পাওয়া গিয়েছিল?

উঃ বাল্যকাল হতেই রাজপুত্র সিদ্ধার্থের পরদুঃখ কাতর হৃদয়ের পরিচয় মিলে। একবার পিতার সাথে হাল-কর্ষণ উৎসবে গিয়ে এক বট বৃক্ষের ছায়া তলে বসে সেই উৎসবের দৃশ্য অবলোকন করতে লাগলেন। তিনি দেখতে পেলেন তাঁর পিতা-ও অমাত্যগণ মহা আনন্দে ভূমিতে হাল কর্ষণ করছেন। অন্যদিকে লাঙ্গলের ফলায় উঠে আসছে বড় বড় টেলার সাথে অসংখ্য কেঁচো ও পোকা। এগুলোকে ধরে খাচ্ছে ব্যাংঙ ও পক্ষীরা। আবার ব্যাংঙকেও ধরে খাচ্ছে পক্ষীরা। তাতে ব্যাংঙের কি আত্ননাদ। করুণার আঁধার সিদ্ধার্থের চোখে দুর্বলের উপর সবলের এই ব্যবহার পৈশাচিক আনন্দ-উল্লাস বলেই তাঁর মনে হল। অত্যাচারিত প্রাণীর প্রতি দয়া ও করুণায় তাঁর হৃদয় বেদনায় টন্ টন্ করে উঠল।

আর একদিনের কথা বলি। কুমার সিদ্ধার্থ রাজপুরীর কোলাহলে অস্থির হয়ে সকলের অগোচরে অন্তপুরের এক নির্জন উদ্যান কোণে গিয়ে চুপ করে বসে আছেন। তখন সূর্য অস্তাচলগামী। মাথার উপর দিয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে হংসবলাকা উড়ে চলে যাচ্ছে দিবসের অবসানে আপন গন্তব্য স্থানে। কুমার সিদ্ধার্থ তাদের ঘরে ফেরার কল-কাকলীতে মুগ্ধ-তন্ময়। হঠাৎ করে তাঁর নিকট আছাড় খেয়ে পড়ল এক তীর বিদ্ধ হংস। তীরের বিষে যন্ত্রণায় ছটফট করছে হংসটি। কাল বিলম্ব না করে অতি সযত্নে সিদ্ধার্থ তুলে নিলেন সেই তীর। ক্ষতস্থানের রক্তধারা বন্ধ করে দিয়ে সুস্থ করে তুললেন সেই অভাগা হংসকে। পরক্ষণেই সেখানে উপস্থিত হল তীর-ধনুক হাতে দেবদত্ত। সে দাবী করল হংসটা তারই শিকার, অতএব, তাকে দিয়ে দিতে হবে। কিন্তু দয়ার সাগর সিদ্ধার্থ করুণাশ্রু কণ্ঠে বললেন, 'কেন ভাই, তুমি এই অসহায় হংসকে এমন নিষ্ঠুরভাবে বিদ্ধ করলে? তোমার গায়ে আঘাত লাগলে তুমি যেমন ব্যথা পাও, এই অভাগা পাখীটিরও তো সেই একই প্রাণ। কেন তুমি তাকে এমনভাবে তীর বিদ্ধ করলে? এই পাখীটি তুমি হত্যা করতে চেয়েছ, আমি তাকে প্রাণ দিয়েছি। বলো কার দাবী এর উপর বেশী? এই বলে তিনি হংসটিকে আকাশে উড়ায়ে দিলেন। শৈশবের এ সমস্ত ঘটনা হতেই কুমার সিদ্ধার্থ যে ভবিষ্যতে দয়া ও করুণা আধাররূপী মহাপুরুষ হবেন তার পরিচয় পাওয়া যায়।

১০। প্রঃ রাজকুমার সিদ্ধার্থের শৈশবের পর দুঃখ কাতরতা যৌবনে কোনরূপ পরিগ্রহ করল?

উঃ মানুষের জীবনে যৌবন এমন এক সময়কাল যখন এ বিশ্বের সবই উপভোগ্য সবই রমণীয়-আনন্দময় রূপে আবির্ভূত হয়। ঠিক এমন একটি সময়ে অপূর্ব সুন্দরী স্ত্রী, দিবা-রাত্র সংসারে ধরে রাখার জন্যে রাজা শুদ্ধোধন কর্তৃক বিচিত্র ভোগ বিলাসের ব্যবস্থার মধ্যেও বারে বারে সিদ্ধার্থ যেন হাফিয়ে উঠতে লাগলেন। রাজপুরী যেন তাঁর কাছে আলো বাতাসহীন এক সংকীর্ণ বন্ধ কারাগার। তাই পিতার অনুমতি নিয়ে ঠিক করলেন তিনি নগর ভ্রমণে বের হবেন। এই নগর ভ্রমণে বের হয়েই জীবনে সর্ব প্রথম বাস্তবের মুখোমুখি হলেন। পথের মধ্যে ক্রমান্বয়ে জুরাগ্রস্ত বৃদ্ধ, উৎকট রোগ যন্ত্রণায় কাতর রোগী এবং মৃত্যুর গ্রাসে পতিত শাশান যাত্রী মৃত দেহ-ও তার বিচ্ছেদের শোকে বিলাপ-রত আত্মীয় স্বজনদের দেখে সিদ্ধার্থ তিলে তিলে এই জীবনের অসারতা উপলব্ধি করলেন। বদ্ধ খাঁচার পাখীর মতো তাঁর মন যখন মুক্তির জন্যে ছটফট করতে লাগল, তখনই তিনি দেখতে পেলেন ঠিক তাঁরই মতো মুক্তি পিপাসু একজন মানুষ সংসারের বিষয়-বাসনা ত্যাগ করে মুক্তির সন্ধানে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেছেন। মুক্তির এমন একটি প্রশস্ত উপায় সেদিন সিদ্ধার্থকে এমন প্রবল বেগে আকর্ষণ করল যে পরমা সুন্দরী স্ত্রী যশোধারা, সদ্য প্রসূত বুক আলো করা

সন্তান রাহুল, বৃদ্ধা মাতা-পিতা কাতর অনুনয়, বিপুল ঐশ্বর্য ও সিংহাসন কিছুই তাঁকে ধরে রাখতে পারল না। সত্যের সন্ধানী সন্ন্যাসী তাঁকে আকর্ষণ করলো ঐব্রভাবে। জীবন দুঃখের অবসানের উপায় অন্বেষণে তিনি ছুটে গেলেন রামপুত্র ও আড়ার কালামের বিখ্যাত ঋষির আশ্রমে। জীবনান্ত কঠোর কৃচ্ছ সাধনা করলেন উরুবেলার মহারণ্যে। দীর্ঘ ছয়টি বছরের ঝটিকা অন্বেষার অভিজ্ঞতায় প্রবল বীর্য পরাক্রম বলে অবশেষে পয়ত্রিশ বছর বয়সে তিনি উদঘাটন করলেন সর্ব দুঃখের অবসানকারী অজর-অমর পরাশান্তি নির্বাণের সিংহদ্বার। পর দুঃখ কাতর শাক্য সিংহ করুণার আঁধার শাক্য মুণি হলেন। তখন হতে নশ্বর জীবনের অবসান মুহূর্তে পর্যন্ত জগতের দুঃখ পীড়িতদের উদ্দেশ্যে অজস্র ধারায় বিতরণ করলেন তার সেই অফুরন্ত অমর ঔষধি নির্বাণের অমৃত ভাণ্ড ধর্মবাণী।

১১। প্রঃ বজ্রাসনে বসে বোধিসত্ত্ব কোন কোন স্তর অতিক্রম করে পরম সত্য বা বুদ্ধত্ব জ্ঞানের অধিকারী হলেন?

উঃ যে দিন তিনি বজ্রাসনে বসলেন সেদিন সূর্যাস্তের পূর্বেই বোধিসত্ত্ব দেবপুত্র মার এবং লোভ, দ্বেষ, মোহাদি ক্লেশ মারকে পরাজিত করলেন। রাতের প্রথম যামে (সন্ধ্যা রাত্রে) পূর্ব জন্মানুস্মৃতি লাভ করলেন, মধ্যম যামে (রাত্রিনিশীতে) দিব্য চক্ষু, রাতে শেষ যামে ভবচক্র অর্থাৎ জন্ম মৃত্যু রহস্য বা প্রতীত্যসমুৎপাদ জ্ঞান এবং সূর্যোদয়ের সাথে সাথে সর্বজ্ঞতা বুদ্ধ-জ্ঞান লাভ করেছিলেন। এভাবেই ক্রমিক পর্যায়ে তিনি সর্বোচ্চ সত্যজ্ঞানের অধিকারী হন।

১২। প্রঃ বুদ্ধত্ব লাভের পর সাত সপ্তাহকাল তিনি কিভাবে কাটালেন?

উঃ বুদ্ধত্ব লাভের পর তিনি ঊনপঞ্চাশ দিন যাবত বোধি বৃক্ষের চতুপার্শ্বস্থ সাতটি স্থানে সপ্তাহ কাল ধরে অবস্থান করে বোধিবৃক্ষ ও বজ্রাসনের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন এবং বিমুক্তি সুখ উপভোগ করেন। এই সাতটি স্থান হল, বজ্রাসন বা বোধিপালঙ্ক, অনিমেষ নেত্রে পূজার স্থান, শ্রেষ্ঠ চংক্রমণ স্থান, রত্নঘর, অজপাল বৃক্ষমূল, মূচলিন্দ নাগ রক্ষিত স্থান এবং রাজায়তন বৃক্ষমূল।

১৩। তপস্সু ও ভল্লিক কে? বৌদ্ধ জগতে তাঁরা কি নামে পরিচিত?

উঃ তপস্সু ও ভল্লিক এঁরা দুই জন উৎকল বাসী বণিক। বুদ্ধের বুদ্ধত্ব লাভ এবং ঊনপঞ্চাশ দিন ধ্যান সুখ উপভোগের পর সর্ব প্রথম এই দুই বণিকই বুদ্ধকে মধু ও পিঠা দান করেন। এই দু'জনেই সর্বপ্রথম বুদ্ধের ধর্মবাণী শ্রবণ করেন। কিন্তু কোন মার্গফল লাভে সক্ষম হননি, শুধু বুদ্ধের প্রতি মুগ্ধ হয়ে বুদ্ধ-ও ধর্মের শরণ গ্রহণ করেন। তাই বৌদ্ধ জগতে তাঁরা দ্বিবাচিক (বুদ্ধ ও ধর্ম) উপাসক নামেই পরিচিত। কারণ, তখনো বুদ্ধ কোন ভিক্ষু সংঘ প্রতিষ্ঠা করেননি। তাই বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের শরণ নিয়ে ত্রিবাচিক উপাসকের পদবাচ্য হতে পারেননি।

১৪। প্রঃ বুদ্ধের ধর্মোপদেশে তপস্‌সু ও ভল্লিকের কোন আর্থ-মার্গ লাভ না হওয়াতে বুদ্ধের মনে কিরূপ বিতর্কের সৃষ্টি হয়?

উঃ বুদ্ধ তাঁর জন্মের সাধনায়-লব্ধ জীবন দুঃখের অবসান বাণী সর্ব প্রথম প্রকাশ করলেন তপস্‌সু ও ভল্লিককে। কিন্তু বাণিজ্য চিন্তায় চঞ্চল বণিকদ্বয় বুদ্ধের এই গভীর সত্য উপলব্ধির উপযুক্ত ছিলনা। তাই তাঁরা এতে উদ্বুদ্ধ হতে পারেন নি। বুদ্ধের প্রথম প্রচেষ্টার এই অসাফল্যতা তাঁর মনে এমন চিন্তা বিতর্ক সৃষ্টি করল যে, ‘আমার লব্ধ সত্য বড়ো গভীর, বড়ো দুর্বোধ্য। লোভ, দ্বেষ, মোহের গভীর আবরণে আবৃত সংসারের মানুষের পক্ষে এই জ্ঞান গভীর ধর্মের অর্থ উপলব্ধি সহজ সাধ্য নয়। অতএব, জনসমাজে ইহা প্রকাশ করতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র।’ এই চিন্তা করে তিনি প্রথমে নিরাশ হয়ে পড়েছিলেন। কিন্তু, কিছুক্ষণ পর তাঁর মনে আবার এই চিন্তার উদয় হল- “সংসারে সকলের জ্ঞান, বিচার বুদ্ধি-ও অনুধাবন শক্তিতো এক নয়। আড়ার কালাম ও রামপুত্রের মতো ধীমান এবং পঞ্চবর্গীয়দের মতো মুক্তি পিপাসু বহু লোকের অস্তিত্বও তো এ সংসারে বিদ্যমান। আমার বহু জন্মান্তরের পারমী সাধনার ফল এই সত্য জ্ঞান শুধু তো নিজের বিমুক্তির জন্যে নয়। তা যদি হতো আমার সেই সুমেধ তাপস জীবনে দীপঙ্কর বুদ্ধের পাদমূলেই তো সর্বাসব ক্ষয় করে জীবন দুঃখের অবসান করতে পারতাম। অতএব, যাদের জন্যে এত কষ্ট স্বীকার, তাদের জন্যেই আমার এই জ্ঞান বিতরিত হউক।”

১৫। প্রঃ ধর্ম প্রচারের কথা চিন্তা করে বুদ্ধ কি করলেন?

উঃ ধর্ম প্রচারের দৃঢ় সংকল্প গ্রহণ করে বুদ্ধ সর্ব প্রথম আড়ার কালাম ও রামপুত্র রুদ্রকের নিকট যেতে চাইলেন। কিন্তু দিব্যানেত্রে তাঁদের বর্তমান অবস্থা অবলোকন করে জানতে পারলেন এই দু’জনের কেহই এখন বেঁচে নেই। এর পর তিনি কৃচ্ছ সাধনার দিনের পরম বন্ধু সেই পঞ্চবর্গীয়দের কথা ভাবলেন। দিব্যানেত্রে অন্বেষণ করে দেখলেন তাঁরা এখন বারাণসীর ঋষি পতনে অবস্থান করেছেন। তাই তিনি তাঁদের উদ্দেশ্যেই যাত্রা করলেন।

১৬। প্রঃ বুদ্ধ কখন বারাণসী ঋষিপতনে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন? প্রথম দর্শনে পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ তাঁর প্রতি কিরূপ আচরণ করলেন?

উঃ বুদ্ধ আষাঢ়ী পূর্ণিমার সন্ধ্যা লগ্নে ঋষিপতনে পঞ্চবর্গীয়দের নিকট উপস্থিত হন। পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণ বুদ্ধকে তাদের দিকে আসতে দেখে তাঁরা স্থির করলেন, ‘ব্রতচ্যুত শ্রমণ গৌতমকে আমরা কেহই পূর্বের ন্যায় শ্রদ্ধা প্রদর্শন করবো না। একজন সাধারণ পরিচিত জনের ন্যায় তিনি ইচ্ছা করলে প্রস্তুত আসনে বসতে পারেন। এ রূপ সাব্যস্ত করে বুদ্ধ তাঁদের নিকটে আসলে তাঁরা বুদ্ধকে নাম ধরে সম্বোধন করে বললেন, ‘গৌতম, আসন প্রস্তুত আছে, ইচ্ছা করলে বসতে পারেন।’

১৭। পঞ্চবর্গীয়দের এরূপ ব্যবহার দেখে বুদ্ধ কি বললেন?

উঃ পঞ্চবর্গীয়দের অনুৎসুক আপ্যায়নে বুদ্ধ তাঁদের ভ্রান্তি অপনোদনের জন্যে বললেন, “ভিক্ষুগণ; তথাগত সম্যক সম্বুদ্ধকে এমন করে অগৌরব করতে নাই। আমার প্রতি তোমাদের পূর্ব ভ্রান্ত ধারণা ত্যাগ কর। আমি পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছি সেই সত্য তোমরাও অবগত হয়ে জীবন দুঃখের অবসান কর- এই ইচ্ছায় আমার এখানে আগমন।”

১৮। প্রঃ বুদ্ধের এই উদার আহ্বানে পঞ্চবর্গীয়দের প্রতিক্রিয়া কি হল এবং অতঃপর বুদ্ধ কি করলেন?

উঃ বুদ্ধের করুণা বিগলিত হৃদয়ের এমন উদার আহ্বান শুনে জ্যেষ্ঠ কৌণ্ডিয়া সকলকে সম্বোধন করে বললেন, ‘বন্ধুগণ; শাক্যপুত্র গৌতম মিথ্যা বলার মতো লোক নন। তিনি যখন নিজ হতেই বলছেন যে, সত্য অবগত হয়েছেন, সম্যক সম্বুদ্ধ হয়েছেন, তখন আমাদের শোনা উচিত তাঁর প্রাপ্ত সত্যটুকি। বুদ্ধ কৌণ্ডিয়ার এই বাক্যে তখন সকলে শোনার আগ্রহ নিয়ে উপবেশন করলেন। পঞ্চবর্গীয়দের মনোভাব জ্ঞাত হয়ে মহাকারুণিক বুদ্ধ মহাসংবেগ জড়িত কণ্ঠে তাঁর সাধনালব্ধ সত্য জ্ঞান আনুক্রমিকভাবে ব্যক্ত করলেন। সম্বুদ্ধ মুখনিঃসৃত সেদিনের এই মনোমুগ্ধকর বাণীই বৌদ্ধ জগতে সুপ্রসিদ্ধ ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন’ সূত্র নামে পরিচিত।

১৯। ক) প্রঃ পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুদের মধ্যে কার, কখন, কিভাবে ধর্ম চক্ষু উৎপন্ন হয়?

উঃ ‘ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র’ শ্রবণে সর্বপ্রথম কৌণ্ডিয়ার ধর্মচক্ষু উৎপন্ন হয়। তিনি স্রোতাপত্তি মার্গ ফল লাভ করেন। পরবর্তী সময়ে অনাত্ম লক্ষণ সূত্র শ্রবণান্তে তাঁরা পাঁচজন পর পর অরহত্ব ফল লাভে সক্ষম হন। এই দিন ছিল শুভ আষাঢ়ী পূর্ণিমা।

১৯। খ) প্রঃ বর্ষাব্রত কি? ইহা কখন শুরু হয়?

উঃ বর্ষাকালে ঝড় বৃষ্টির হেতু দীর্ঘ পথ পরিক্রমা অসুবিধা বিধায় বুদ্ধ ভিক্ষুদের কোন একটা নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান ও পিণ্ডচারণ করে ধ্যান সাধনায় বর্ষার তিন মাস অতিবাহিত করার আইন করেছিলেন। ইহাই বর্ষাবাস নামে খ্যাত। আষাঢ়ী পূর্ণিমায় ইহার শুরু এবং কার্তিকী পূর্ণিমায় সমাপ্তি হয়।

২০। প্রঃ পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের অরহত্ব ফল লাভের পর ত্রৈমাসিক বর্ষাব্রতের মধ্যে আর কারা বুদ্ধের সত্য জ্ঞান লাভে সক্ষম হন?

উঃ বুদ্ধ যখন বর্ষার আরম্ভ হেতু পঞ্চবর্গীয় শিষ্যগণকে নিয়ে ঋষিপতনে তিন মাস অবস্থান করেছিলেন, সেই সময়ে যশ নামক স্থানীয় এক শ্রেষ্ঠী পুত্র ও তাঁর চুয়ান্ন জন বন্ধু পর পর বুদ্ধের সান্নিধ্যে এসে বুদ্ধের জীবন দুঃখের অবসানকারী সত্য জ্ঞান লাভে সক্ষম হন।

২১। ক) প্রঃ বুদ্ধ কখন সংঘ গঠন করেন এবং সংঘ গঠনের পরে তিনি কি নির্দেশ দিয়েছিলেন? বুদ্ধের এই নির্দেশের ফল কি হল?

উঃ কুমার যশ ও তাঁর বন্ধুগণ এবং পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুরা সহ জগতে যখন সর্বমোট ষাটজন অরহত্ব হলেন তখনই বুদ্ধ সংঘ গঠন করেন। এই ষাট জনকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে বর্ষার তিন মাস অতিবাহিত হওয়ার পর তিনি ভিক্ষু সংঘকে নির্দেশ দিয়েছিলেন- ‘হে ভিক্ষুগণ; বহুজনের হিতে বহুজনের সুখের জন্য তোমরা আজ হতে দিকে দিকে ছড়িয়ে পড়..... যে ধর্মের আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এমন কি পরিসমাপ্তিতেও কল্যাণ; দেব মানবের হিতে তোমরা সেই ধর্মবাণী প্রচার কর।’ বুদ্ধের ধর্মবাণী প্রচারের মহান উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত সংঘ এবং সেই সংঘের প্রতি এই মহান নির্দেশের পরিণামেই আজ বুদ্ধের কালজয়ী বাণী ভারতের গণ্ডী অতিক্রম করে সমগ্র বিশ্বময় ছড়িয়ে পড়েছে।

২১। খ) প্রঃ ভিক্ষু শব্দের অর্থ কি? সংঘ বলতে কি বুঝায়?

উঃ জন্ম, জ্বর, ব্যাধি, মৃত্যু ও যাবতীয় সংসার দুঃখের কারণ যে তৃষ্ণা বা আসক্তি সেই তৃষ্ণাকে ভীতির চোখে দর্শন করে তার কবল হতে সহজে মুক্তি পাওয়ার জন্য সাংসারিক সর্বস্ব ত্যাগ পূর্বক যারা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন তাঁরাই ভিক্ষু। সংঘ বলতে একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যে ভিত্তিক কিছু লোকের সমাবেশকে বুঝায়। বৌদ্ধ আদর্শ মতে চার হতে ততোধিক এমন ব্যক্তির সমন্বয়ে সংঘ হয়।

২২। প্রঃ ঋষিপতনে ভিক্ষু সংঘকে ধর্ম প্রচারে নির্দেশ দানের পর বুদ্ধ নিজে কি করলেন?

উঃ ধর্ম প্রচারে নির্দেশ দান করে বুদ্ধ ভিক্ষু সংঘকে নানা দিকে প্রেরণ করে নিজেও সেই ব্রত গ্রহণ পূর্বক গয়াতীরের দিকে যাত্রা করলেন। তথায় পৌঁছে সেই অঞ্চলের প্রখ্যাত অগ্নি উপাসক জটিল ভ্রাতৃত্বয় উরুবিল্ব কাশ্যপ, গয়াকাশ্যপ ও নদী কাশ্যপ সহ তাঁদের এক হাজার শিষ্যকে এ আর্য সত্য ধর্ম উপলব্ধি করায় সংঘ ভুক্ত করলেন। অতঃপর তিনি মগধরাজ বিম্বিসারকে প্রদত্ত পূর্ব প্রতিশ্রুতি রক্ষার জন্যে সেই বিরাট শিষ্য সংঘ নিয়ে রাজগৃহ অভিমুখে যাত্রা করলেন। তাঁর এই জয় যাত্রা চলল পরবর্তী সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে।

বিবিধ পর্যায়ে (ইতিহাস) - ১

১। সুমেধ তাপস কে ছিলেন?

উঃ তিনি বহু কল্পকাল পূর্বে ব্রাহ্মণ কুল হতে প্রব্রজ্যিত একজন ঋদ্ধি সম্পন্ন ঋষি ছিলেন।

২। তিনি কোথায় জন্ম গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ অমরাবতীর এক ব্রাহ্মণ পরিবারে।

৩। সুমেধ তাপস দীপঙ্কর বুদ্ধের নিকট কি প্রার্থনা করেছিলেন?

উঃ বুদ্ধত্ব লাভের প্রার্থনা করেছিলেন।

৪। দীপঙ্কর বুদ্ধ কি বলে ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন?

উঃ দীপঙ্কর বুদ্ধ ভবিষ্যৎবাণী করেছিলেন এখন হতে চারি মহাকল্প পরে ভদ্রকল্পে কপিলাবাস্তু নামক রাজ্যের শুদ্ধোধন নামক রাজার ঘরে সিদ্ধার্থ নামে জন্ম গ্রহণ করে এই সুমেধ তাপস পরবর্তীতে গৌতম বুদ্ধ নামে জগতে খ্যাতি লাভ করবেন।

৫। ভিক্ষুণী সংঘের প্রতিষ্ঠার জন্যে কে বুদ্ধকে অনুরোধ করেছিলেন?

উঃ বুদ্ধের প্রতিপালনকারী বিমাতা মহা প্রজাপতি গৌতমী ও বুদ্ধের প্রধান সেবক ধর্ম ভাণ্ডারিক আনন্দ স্থবির।

৬। সারিপুত্র ও মোগ্গলায়ন কে?

উঃ তারা দুইজন বন্ধু এবং পরে বুদ্ধের দুই প্রধান অগ্রশ্রাবক ও ধর্ম সেনাপতি হিসেবে মহাখ্যাতি অর্জনকারী বুদ্ধ শিষ্য।

৮। তারা কিভাবে বুদ্ধের সান্নিধ্যে আসেন?

উঃ সঞ্জয় নামে তখনকার এক প্রসিদ্ধ তীর্থিকের আশ্রয়ে থেকে উপতিষ্য ও কোলিত নামে দুই ব্রাহ্মণ শ্রেষ্ঠপুত্র তাদের জ্ঞান স্পৃহার তৃপ্তি লাভ না হওয়াতে উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে বের হন। সারিপুত্র তথা উপতিষ্য পথে বুদ্ধের পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের অন্যতম অশ্বজিত স্থবিরের সাক্ষাত লাভ করে তিনি কোন মতবাদী জিজ্ঞাসা করেন। অশ্বজিত স্থবির বুদ্ধের উদ্দেশ্যে প্রণাম জানিয়ে সংক্ষেপে বলেন- “যে ধম্ম হেতুপ্পভব তেসং হেতু তথাগত আহ” স্থবিরের মুখে এই মাত্র বুদ্ধ বাক্য শুনেই উপতিষ্য স্রোতাপত্তি মার্গে প্রতিষ্ঠিত হলেন। অতঃপর তিনি আপন বন্ধু কোলিত তথা মোগ্গলানকে তা জ্ঞাত করায় উভয়েই এক সাথে বুদ্ধ সমীপে দীক্ষা গ্রহণ করেন।

৯। যমক প্রতিহার্য ঋদ্ধি কি? কেন বুদ্ধ ইহার প্রদর্শন করেন?

উঃ ইহা এক বিশাল মানসিক শক্তির বহিঃ প্রকাশ। একমাত্র সম্যক্ সমুদ্রগণের পক্ষেই এই অলৌকিক শক্তি প্রদর্শন সম্ভব। আপন শরীর হতে একই সময়ে দু'বিপরীতধর্মী শক্তির প্রকাশ এতে হয়ে থাকে। যেমন একদিকে আগুন, অন্যদিকে জল, একদিকে দিন অপরদিকে রাত্রি। জাত্যাভিমাত্রী শাক্যরা বুদ্ধকে তাদের পূর্ব আত্মীয় সিদ্ধার্থ কুমার হিসেবেই গ্রহণ করতে রাজী; তাই তথাগত এরূপ ঋদ্ধি শক্তিবলে তাদের নমিত করেছিলেন।

১০। প্রঃ বুদ্ধ কোন্ কোন্ রাজাকে বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত করেন?

উঃ বুদ্ধ মগধরাজ বিম্বিসার ও অজাতশত্রু, কোশলরাজ প্রসেনজিত, কপিলাবাস্তুর রাজ পিতা শুদ্ধোধন, বৈশালীর লিচ্ছবি রাজন্যবর্গ, উজ্জয়নীর রাজা উদয়ন প্রভৃতি রাজা, মহারাজা, তাদের পরিবার, পাত্রমিত্র সহ আরো বহু রাজা ও ক্ষত্রিয়গণকে সদ্ধর্মে দীক্ষিত করেন।

১১। প্রঃ বুদ্ধের ভিক্ষু সংঘে, ভিক্ষুণী সংঘে, উপাসক সংঘে এবং উপাসিকা সংঘে কে কে প্রধান স্থান লাভ করেছিলেন?

উঃ বুদ্ধের ভিক্ষু সংঘে প্রধান ছিলেন সারিপুত্র ও মহামোগ্গলায়ন, ভিক্ষুণী সংঘে প্রধান ছিলেন থেরী ক্ষেমা ও উৎপলাবর্ণা, উপাসক সংঘে প্রধান ছিলেন শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক সুদত্ত এবং উপাসিকা সংঘে প্রধান ছিলেন মহাউপাসিকা বিশাখা।

১২। বুদ্ধের প্রধান সেবক কে? তাঁকে কি নামে অভিহিত করা হত এবং কেন?

উঃ আনন্দ স্থবির ছিলেন বুদ্ধের প্রধান সেবক। আবার বুদ্ধের ভিক্ষু সংঘের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শ্রুতিধর হিসেবেও তাঁর খ্যাতি ছিল। কোন বিষয় একবার মাত্র শুনেই বহুদিন পরেও তিনি তা হুবহু বলতে পারতেন। তিনি যখন বুদ্ধের প্রধান সেবকের দায়িত্ব গ্রহণ করলেন তখন বুদ্ধের নিকট হতে কয়েকটি প্রতিশ্রুতি আদায় করে নিয়েছিলেন। তন্মধ্যে একটি হ'ল বুদ্ধ আনন্দের অনুপস্থিতিতে যেখানে ধর্ম ভাষণ করবেন তা যেন পুনঃ আনন্দের নিকট প্রকাশ করা হয়। ফলে বুদ্ধের পঁয়তাল্লিশ বছরের ধর্ম ভাষণের সমস্ত বিষয় আনন্দ স্থবিরের ছিল হুবহু কণ্ঠস্থ। এজন্যে সকলে আনন্দ স্থবিরকে ধর্ম ভাণ্ডারিক বলে ও অভিহিত করতেন।

১৩। প্রঃ বুদ্ধের আয়ু সংস্কার বিসর্জন বলতে কি বুঝ? তিনি কখন, কোথায় এই আয়ু সংস্কার বিসর্জন করেন?

উঃ সকল সম্যক সমুদ্রগণ যে অনন্ত ঋদ্ধি শক্তির অধিকারী সেই ঋদ্ধি বলে তাঁরা ইচ্ছা করলে এক কল্পকাল জীব জগতে অবস্থান করতে পারেন। কিন্তু অতিমানবীয় কোন কিছু করা বুদ্ধগণের ধর্মতা নহে। তাঁরা সমকালীন অবস্থা বিচারেই সব কিছু করে থাকেন। তাই তাঁরা ঋদ্ধি বলে নিজের অতীত পারমীলন্ধ পরমায়ুকে কখনো বাড়ান না। গৌতম বুদ্ধ ও ঠিক একই কারণে বৈশালীর চাপাল চৈত্রে মাঘী পূর্ণিমা তিথিতে অনুরূপভাবে ঋদ্ধিবলে দীর্ঘায়ু লাভের মনোভাব ত্যাগ করে তিন মাস পরে পরবর্তী বৈশাখী পূর্ণিমাতে মহাপরিনির্বাণ লাভের কথা ঘোষণা করেছিলেন। তাঁর এই ঘোষণাকেই আয়ু সংস্কার বিসর্জন বলা হয়।

বিবিধ পর্যায়ে (ইতিহাস) -২

১৪। প্রঃ উপালী কোন বংশে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ শাক্য বংশের নাপিত পরিবারে।

১৫। প্রঃ উপালীর সঙ্গী কে কে ছিলেন?

উঃ অনুরুদ্ধ, ভৃগু, কিম্বিল, আনন্দ, দেবদত্ত প্রভৃতি শাক্যরাজ কুমারগণ।

১৬। প্রঃ উপালী কিভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন?

উঃ তাঁহার বন্ধু অনুরুদ্ধ, আনন্দ, দেবদত্ত প্রভৃতি রাজা কুমারদের প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে দেখে, তিনিও তাদের সাথে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন।

১৭। প্রঃ বুদ্ধ উপালীকে কি আখ্যা দিয়েছিলেন?

উঃ বুদ্ধ উপালীকে বিনয়ধরদের মধ্যে সর্ব শ্রেষ্ঠ আখ্যা দিয়েছিলেন।

১৮। প্রঃ অজাতশত্রু কে ছিলেন?

উঃ অজাতশত্রু ছিলেন মগধরাজ বিম্বিসারের পুত্র।

১৯। প্রঃ অজাতশত্রু গর্ভবস্থায় তাঁর মায়ের কি সাধ হয়েছিল?

উঃ রাজা বিম্বিসারের রক্তপান করার সাধ হয়েছিল।

২০। প্রঃ অজাতশত্রু পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন কেন?

উঃ অজাতশত্রু দেবদত্তের কুহকে পড়ে রাজ্য লাভের জন্য পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন।

২১। প্রঃ কাহার অনু পরিভোগের পর বুদ্ধ কোথায় মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন?

উঃ পাবা নগরে স্বর্ণকার চুম্দের প্রদত্ত অনু পরিভোগ করার পর বুদ্ধ রোগাক্রান্ত হন এবং কুশীনগর মল্ল রাজাদের শালবনে এসে জমক শাল বৃক্ষ মূলে মহাসূর্য মহাকারুণিক বুদ্ধ আশি বছর বয়সে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন।

১৮। প্রঃ বুদ্ধের জীবনে কখন, কি কারণে ভূ-কম্পন ও পুষ্পবৃষ্টি হয়েছিল।

উঃ বুদ্ধ মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণের সময় লুম্বিনী উদ্যানে ভূমিষ্ঠ হয়ে সিংহনাদ করাকালে, বুদ্ধত্ব লাভের পর ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনার পর, আয়ু সংস্কার বিসর্জনের সময় এবং মহাপরিনির্বাণ লাভের পর ভূ-কম্পন ও পুষ্পবৃষ্টি বর্ষিত হয়েছিল।

২২। প্রঃ বুদ্ধের সর্বশেষ মার্গফল লাভী শিষ্য কে?

উঃ বুদ্ধের সর্বশেষ আর্যশ্রাবক ছিলেন সুভদ্র নামক জনৈক পরিব্রাজক। তিনি কুশী নগরে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভের অল্পক্ষণ পূর্বে বুদ্ধ মুখে উপদেশ শুনে মার্গফল লাভে সক্ষম হয়েছিলেন।

২৩। প্রঃ কাহার পাদস্পর্শে বুদ্ধের চিতায় অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়?

উঃ বুদ্ধ শাসনে ধুতাস শ্রেষ্ঠ, পুরুষ সিংহ মহাকাশ্যপের দ্বারা মহাশ্মশানে বুদ্ধের শ্রীপাদ স্পর্শ মাত্রই অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠেছিল।

২৪। প্রঃ বুদ্ধের দেহ কিভাবে সৎকার করা হয়?

উঃ রাজচক্রবর্তীর দেহকে যেভাবে সৎকার করা হয় সেভাবেই বুদ্ধের দেহকেও সৎকার করা হয়।

২৫। প্রঃ মহাকারুণিক বুদ্ধের পরিনির্বাণিত দেহের পবিত্র অস্থি-খন্ডগুলো কাহার দ্বারা কিভাবে বন্টন করা হয়?

উঃ বুদ্ধের শারীরিক ধাতু বা পবিত্র অস্থি-খন্ডগুলো দ্রোণ নামে এক ব্রাহ্মণের দ্বারা বন্টন করা হয়। তিনি সমগ্র পুঁতাস্থি সমূহকে আট ভাগে বিভক্ত করে কুশীনগরের মল্ল রাজা, মগধরাজ অজাত শত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ কপিলাবাস্তুর শাক্যগণ, অঙ্গকর্ণের রাজা, রাম গ্রামের কোলীয়গণ, বৈষ্ঠীপের ব্রাহ্মণ এবং পাড়ায় মল্লদেরকে পূজার জন্যে বিতরণ করেন।

২৬। প্রঃ বুদ্ধের শারীরিক ধাতুগুলো কয় প্রকার ও কি কি? এদের পরিচয় দাও।

উঃ বুদ্ধের শারীরিক ধাতু দুই প্রকার-অভিন্ন ধাতু এবং ভিন্ন বা ক্ষুদ্র ধাতু। অভিন্ন ধাতুগুলোর মধ্যে মাথার তালুর অস্থি, কণ্ঠ ও দন্তাস্থি সমূহ এবং ভিন্ন ধাতু গুলোর মধ্যে বাদ-বাকী সমস্ত ক্ষুদ্র খন্ডগুলো। এগুলো মুগ-চাউল ও সরিষা প্রমাণ ছিল।

২৮। প্রঃ বুদ্ধ কত প্রকার ও কি কি? পরিচয় দাও।

উঃ বুদ্ধ তিন প্রকার যথাঃ-সম্যক্ সম্বুদ্ধ, পচেক বুদ্ধ ও শ্রাবক বুদ্ধ। বহুজনের কল্যাণের জন্যে দশবিধ পারমী উপপারমী ও পরমার্থ পারমী পূর্ণ করে যাঁরা কারো সহায়তা ছাড়া নিজ প্রচেষ্টায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন তাঁরাই সম্যক্ সম্বুদ্ধ। সম্যক্ সম্বুদ্ধের মুখ নিঃসৃত বাণী শুনে যাঁরা বুদ্ধত্ব লাভ করেন তাঁদের শ্রাবক বুদ্ধ বলা হয়। আর বুদ্ধ গুণ্য কল্পে এক সাথে অনেক মুনি-ঋষি স্বীয় প্রচেষ্টায় নির্বাণ সত্য উপলব্ধিতে সক্ষম হন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে সেই সত্যকে অপরের নিকট প্রকাশ বা

প্রচার করার ক্ষমতা থাকে না। তাই তাঁদেরকে পচেক বুদ্ধ বা নিজ বিমুক্তিতে বুদ্ধ বলা হয়।

বিবিধ পর্যায় (ইতিহাস)-৩

১। প্রঃ অজাতশত্রু কিভাবে বুদ্ধের উপাসক হয়েছিলেন?

উঃ দেবদত্তকে পৃথিবী গ্রাস করেছে শুনে অজাতশত্রুর মনে পিতৃবধ জনিত অনুতাপের সৃষ্টি হলে জীবকের পরামর্শে, শান্তি লাভার্থে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। তখন বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করে তিনি বুদ্ধের শরণাগত উপাসক হয়েছিলেন।

২। প্রঃ জীবক কে ছিলেন?

উঃ জীবক ছিলেন অভয় রাজকুমারের পুত্র এবং বুদ্ধের একনিষ্ঠ ভক্ত ও প্রধান চিকিৎসক।

৩। প্রঃ জীবকের পিতা-মাতার নাম কি ছিল?

উঃ পিতার নাম অভয়রাজ কুমার ও মাতার নাম শালবতী গণিকা।

৪। প্রঃ অঙ্গুলিমালের প্রকৃত নাম কি ছিল?

উঃ অঙ্গুলিমাল ছিলেন কোশলরাজ পুরোহিত ব্রাহ্মণ ভার্গবের পুত্র।

৫। প্রঃ অঙ্গুলিমালের কি নামাকরণ করা হয়েছিল?

উঃ অহিংসক।

৬। প্রঃ অঙ্গুলিমাল কেন নরহত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন?

উঃ বিদ্যা শিক্ষার সমাপ্তিতে গুরু পূজার জন্যে প্রদত্ত দান হিসেবে তার গুরু দাবী করেছিলেন এক হাজার মধ্যমা আঙ্গুল। তিনি সেই আঙ্গুল সংগ্রহেই নর হত্যায় প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

৭। প্রঃ অবশেষে অঙ্গুলিমালে কি অবস্থা হয়েছিল?

উঃ অবশেষে অঙ্গুলিমাল বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করে অরহৎ হয়ে ভিক্ষু সংঘে প্রবেশ করেছিলেন।

৮। প্রঃ সিবলীর পিতা-মাতার নাম কি ছিল?

উঃ সিবলীর পিতার নাম ছিল মহারাজ মহালী কুমার ও মাতার নাম ছিল রাণী সুপ্রবাসা।

৯। প্রঃ বুদ্ধ কখন কাহাদেরকে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মদেশনা করেন?

উঃ বুদ্ধ বৈশালীর চপাল চৈত্রে অবস্থান কালে বজ্জীদেরকে সপ্ত অপরিহানীয় ধর্মদেশনা করেন।

বৌদ্ধ ধর্ম

১। প্রঃ বুদ্ধ কে? বুদ্ধত্ব লাভের মূল উদ্দেশ্য কি?

উঃ ক্রিয়া মূল হতে বোধি, এবং সেই বোধ ধাতু নিষ্পন্ন বোধি শব্দ হতে বুদ্ধ শব্দের উৎপত্তি। জীবন ও জগতের অনন্ত রহস্যের সন্ধান যিনি স্থায়ী উদ্যম, প্রচেষ্টা ও সাধনা বলে অর্জন লাভ করে মহা-জ্ঞানের অধিকারী হয়েছেন তিনিই বুদ্ধ।

প্রাণী মাত্রেই সুখের প্রত্যাশী। অথচ জীবনে দুঃখের সীমা নাই। রোগ, শোক, জ্বর, বার্ধক্য মরণ, ক্ষতি, নিন্দা, দুঃশ্চিন্তা, মনো-বেদনা এগুলোর একটি না একটি দ্বারা মানুষ নিত্য দুঃখ গ্রস্ত। এই সমস্ত দুঃখের আসল কারণ কি, তা অবগত হয়ে পুনঃ পুনঃ সেই দুঃখ যন্ত্রণা ভোগ হতে যাতে মুক্তি লাভ করা যায়, সেই মুক্তির উপায় নিজে লাভ করে মুক্ত হওয়া এবং অপরকে সেই উপায় প্রদর্শন করা বুদ্ধত্ব লাভের মূল উদ্দেশ্য।

২। প্রঃ ভগবান শব্দের অর্থ কি?

উঃ ভগ+বান=ভগবান। এখানে ‘ভগ’ শব্দের অর্থ ভঙ্গ বা ছিন্ন এবং ‘বান’ শব্দের অর্থ বন্ধন। অর্থাৎ যিনি পুনঃ পুনঃ জন্ম গ্রহণ রূপ সংসার বন্ধনকে ছিন্ন করেছেন বা ধ্বংস করেছেন তিনিই ভগবান বা মহা ভাগ্যবান বলে খ্যাত।

৩। প্রঃ জন্মকে বন্ধ করার কারণ কি?

উঃ এ জীবনে প্রাণীগণকে যত দুঃখ উপদ্রব ভোগ করতে হয় তা একমাত্র জন্ম গ্রহণ হেতু দেহ ধারণের কারণে। তাই দুঃখের উৎপত্তি রোধের জন্য জন্ম গ্রহণকেই বন্ধ করতে হয়।

৪। প্রঃ জন্মের কারণ কি? কি উপায়ে ইহা বন্ধ করা যায়?

উঃ প্রবল তৃষ্ণা বা ভোগ করার প্রবল ইচ্ছাজাত আসক্তিই জন্ম গ্রহণের কারণ। চারি আর্য়সত্যে যথাযথ জ্ঞান লাভের মাধ্যমেই ইহা নিরুদ্ধ হয়।

৫। প্রঃ চারি আর্য়সত্য জ্ঞান কি?

উঃ ১) দুঃখ আর্য়সত্যে জ্ঞান, ২) দুঃখের কারণ আর্য়সত্যে জ্ঞান, ৩। দুঃখের নিরোধ বা উপশম আর্য়সত্যে জ্ঞান, ৪) দুঃখ নিরোধের উপায় বা আর্য় অষ্টাঙ্গিক মার্গ সম্পর্কে জ্ঞান লাভকে চারি আর্য়সত্য জ্ঞান বলে।

বিবিধ পর্যায় (ইতিহাস)-৪

প্রঃ সীবলীর মাতা রাণী-সুপ্রবাসা কত বৎসর গর্ভযন্ত্রণা এবং কত দিন প্রসব বেদনা ভোগ করে ছিলেন?

উঃ সুপ্রবাসা সাত বৎসর পর্যন্ত গর্ভযন্ত্রণা এবং সাত দিন পর্যন্ত প্রসব বেদনা ভোগ করেছিলেন।

প্রঃ অরহত সীবলী লাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করেছিলেন কেন?

উঃ তিনি অতীতে বহু দান কর্ম সম্পাদন করে ভবিষ্যতে মহালাভী হওয়ার প্রার্থনা করেছিলেন এই প্রার্থনার ফলেই তিনি ভগবান বুদ্ধের শিষ্য মন্ডলীর মধ্যে লাভীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ পদ লাভ করেছিলেন।

প্রঃ সম্রাট অশোক কে ছিলেন?

উঃ সম্রাট অশোক ছিলেন মগধের রাজা বিন্দুসারের পুত্র এবং বৌদ্ধ ধর্মের মহা হিতৈষী গণের মধ্যে বুদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠায় বিরল ব্যক্তিত্ব।

প্রঃ সম্রাট অশোকের পুত্র ও কন্যা যারা ভিক্ষু-ভিক্ষুণী হয়েছিলেন তাদের নাম কি ছিল?

উঃ পুত্রের নাম ছিল ভিক্ষু মহেন্দ্র ও কন্যার নাম ছিল ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা।

প্রঃ সম্রাট অশোক সমস্ত জম্বুদ্বীপে কত হাজার চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন?

উঃ চুরাশি হাজার চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন।

প্রঃ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য সম্রাট অশোক কি করেছিলেন?

উঃ বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারের জন্য তিনি পর্বত গায়ে, শিলাফলকে বুদ্ধের উপদেশাবলী খোদাই করেছিলেন, প্রমোদ ভ্রমণ বন্ধ করে ধর্ম যাত্রার উপদেশ দিয়েছিলেন, এবং ধর্ম প্রচারার্থে চারিদিকে ধর্ম প্রচারক ভিক্ষু ও গৃহীদের পাঠিয়ে ছিলেন।

৬। প্রঃ দুঃখ আর্যসত্য কি?

উঃ জন্ম দুঃখ, জরা বা বার্ধক্য দুঃখ, ব্যাধি দুঃখ মরণ দুঃখ, প্রিয় জন বা প্রিয় বস্তুর বিচ্ছেদ বা নষ্টে দুঃখ, অপ্রিয় ব্যক্তি বা বিষয়ের সংযোগ দুঃখ, ইচ্ছিত বস্তু লাভ না করার দুঃখ, সংক্ষেপে পঞ্চক্লেশ বা এই দেহ ধারণ জনিত দুঃখকে দুঃখ আর্যসত্য বলা হয়।

৭। প্রঃ দুঃখ উৎপত্তির কারণ কি? কারণ সমূহের পরিচয় দাও।

উঃ লোভ, দ্বেষ ও মোহ এই তিনটি দুঃখ উৎপত্তির মূল কারণ। লোভ হ'ল কামনা, বাসনা বা পাওয়ার ইচ্ছা ও ভোগ করার ইচ্ছা। দ্বেষ হ'ল-ক্রোধ, হিংসা হত্যা এবং ঈর্ষা। মোহ হ'ল- অজ্ঞানতা, মুগ্ধতা, বিহ্বলতা, মূঢ়তা অর্থাৎ বিচার শক্তি হীনতা, কুপ্রজ্ঞা।

৮। প্রঃ দুঃখ নিরোধের উপায় আর্যসত্য জ্ঞান বা আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ বলতে কি বুঝায়?

উঃ লোভ, দ্বেষ ও মোহজাত তীব্র ভোগাকাজ্ঞা এবং অবিদ্যা বা অজ্ঞানতাকে ধ্বংসের জন্যে, ১) কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাসী হওয়া। অর্থাৎ আমার জীবনের প্রতিটি সুখ ও দুঃখ অতীত কর্মেরই ফল। আর সেই কর্মের কারক আমি নিজেই। তাই আমার দুঃখের জন্যে অন্য কেহ দায়ী নন। আমার সুখ শান্তি বিধানে আমার প্রচেষ্টা ছাড়া অন্য উপায় নাই এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা ২) চিন্তে সর্বদা সৎ কর্ম সম্পাদনের সংকল্প উৎপন্ন করা ৩) সর্বদা সত্য কথা বলা ৪) সৎ কাজ সম্পাদন করা ৫) সৎভাবে জীবিকা নির্বাহ করা ৬) সৎকর্ম সম্পাদনে পুনঃ পুনঃ উদ্যম ও উৎসাহ উৎপন্ন করা ৭) সৎস্মৃতি সর্বদা মনে জাগ্রত রাখা বা মনকে সৎবিষয়ে ধরে রাখা ৮) সৎবিষয়ে মনের একাগ্রতা বা সমাধি ভাব উৎপাদন করা। এই আটটি উপায় অবলম্বনে জীবন দুঃখের চির অবসান হয়।

৯। প্রঃ বুদ্ধের মতে জন্ম ও মৃত্যুর স্বরূপ কি?

উঃ মহাকারুণিক ভগবান সম্যক্ সম্বুদ্ধ বলেছেন—মাতৃগর্ভ হতে ভূমিষ্ঠ হওয়াই শুধু জন্ম নয়, আর বয়োবার্ধক্য বা অন্য হেতুতে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়াটাই শুধু মরণ নয়। মানুষের প্রতিটি তৃষ্ণা বা আসক্তি যুক্ত চেতনাই এক একটি জন্ম। অনুরূপ এক একটি চেতনার অবসানে এক একটি মৃত্যু। এভাবে অসংখ্য চেতনার উৎপত্তি ও বিলয়ের মাধ্যমেই চলে আসছে আমাদের আদি-অন্ত হীন জন্ম মৃত্যুর প্রবাহ।

বিবিধ পর্যায় (ইতিহাস)-৫

প্রঃ সম্রাট অশোক কাকে কাকে ধর্ম প্রচারার্থে বিভিন্ন স্থানে পাঠিয়েছিলেন?

উঃ থের মজ্জন্তিক, মহাদেব থের, রক্ষিত থের, ধর্ম রক্ষিত থের, মহারক্ষিত থের, মজ্জিম ইসি, উত্তর ও সোম থের এবং মহেন্দ্র ও সংঘমিত্রা প্রভৃতিকে ভারতে বাইরে যথাক্রমে মায়ানমার, শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড এসকল দেশে পাঠিয়েছিলেন।

১০। প্রঃ বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি কি? ‘মজ্জিম পটিপদা’ কাহাকে বলে?

উঃ দুঃখ কি, সেই দুঃখের কারণ কি, তার স্বরূপ কি, এই দুঃখ হতে মুক্তির উপায় কি-এসব বিষয় অবগত হওয়ার জন্যে আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ পথে সর্বদা জীবন গঠনে সর্বদা উদ্যমশীল থাকাই বৌদ্ধ ধর্মের মূল ভিত্তি।

যে জীবন ব্যবস্থা অতি কঠোর ও নয়, আবার অতি ভোগ-বিলাস বহুল ও নয়, এমন জ্ঞানবস্তুর অল্পে-তুষ্টি সরল জীবন যাপন কে ‘মজ্জিম পটিপদা’ বা মধ্যম পন্থা তথা আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে।

১১। প্রঃ বৌদ্ধ ধর্মের মূল নীতি কি? সংক্ষেপে পরিচয় দাও।

উঃ ১. শ্রদ্ধা, ২. প্রজ্ঞা, ৩. বীর্য, ৪. মৈত্রী, ৫. করুণা, ৬. মুদিতা, ও ৭. উপেক্ষা- এই সাতটি বিষয়কে বৌদ্ধ ধর্মের মূলনীতি বলে গণ্য করা যায়।

১) শ্রদ্ধাঃ আমাদের চলমান জীবনে যে সকল সমস্যা উৎপন্ন হয়, তৎ সমুদয়ের সমাধান আমার দ্বারা অবশ্যই সম্ভব; এমন পরম আত্ম বিশ্বাসকে বলা হয় শ্রদ্ধা।

২) প্রজ্ঞাঃ উৎপন্ন সমস্যাটির সমাধানে সমস্যাটির উৎপত্তির কারণ যথাযত ভাবে নির্ণয়ে নিরপেক্ষ গভীর অনুসন্ধানের নাম প্রজ্ঞা।

৩) বীর্যঃ উৎপন্ন সমস্যার সঠিক কারণ নির্ণয়ের পর প্রবল উদ্যমে পরাক্রমে সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হওয়ার নাম বীর্য।

৪) মৈত্রীঃ বিশ্বের সমগ্র প্রাণী জগতের প্রতি অপ্রমেয় দয়াজাত বিদ্বেষ শূন্য আত্মবৎ চেতনা মৈত্রীর লক্ষণ।

৫) করুণাঃ প্রাণীগণকে নিত্য দুঃখের দহনে পীড়িত দেখে চিন্তে সমবেদনা জাগ্রত হওয়া করুণার লক্ষণ।

৬) মুদিতাঃ অপরের সুখ শ্রীবৃদ্ধি দর্শনে মনে হিংসা বা ঈর্ষা জাগ্রত হতে না দিয়ে আপন মনে আনন্দ ও সন্তোষ ভাব উৎপাদন মুদিতার লক্ষণ।

৭) উপেক্ষাঃ অন্যায়কারী বা অনিষ্টকারীর প্রতি ক্রোধ, হিংসা বা প্রতিশোধ স্পৃহা জাগ্রত না করে নিরপেক্ষভাবে তার ভুল সংশোধনের জন্যে যত্নবান হওয়া উপেক্ষার লক্ষণ।

১২। প্রঃ প্রজ্ঞার অপর নাম কি? ইহার লক্ষণ কয়টি? সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উঃ প্রজ্ঞার অপর নাম বিদর্শন বা বিশেষ ভাবে দর্শন। বিদর্শনের তিনটি লক্ষণ-অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম। ১) জগতে উৎপন্নশীল কোন বস্তুই নিত্য নহে। উৎপন্ন ও ধ্বংস, জন্ম ও মৃত্যু পরস্পর অঙ্গাঙ্গিকভাবে জড়িত ইহাই অনিত্য লক্ষণ। ২) যাহা অনিত্য ধর্মী সেই বিষয় বা বস্তুর প্রতি অজ্ঞানতা বশে আমি-ও আমার বলে যে আসক্তির বন্ধন সৃষ্টি করা হয়, সেই বন্ধন স্বভাবতঃই ছিন্ন হয়। এতে মোহ মুগ্ধ ব্যক্তিরাই দুঃখ যাতনা ভোগ করে। এটাই বস্তু বা বিষয়ের দুঃখ লক্ষণ ৩) সাধনা লব্ধ প্রজ্ঞা চক্ষুতে সেই অনিত্য ও দুঃখের লক্ষণ সম্যক উপলব্ধি করে সর্ব দুঃখের মূল আমি-ও আমার এই প্রবল দাবী জাত আত্মভাব নিচিহ্ন হওয়া অনাত্মা লক্ষণ।

১৩। প্রঃ আমিত্ব বা আত্ম ভাবের কখন বিলোপ সাধিত হয়?

উঃ মহাকারণিক বুদ্ধ প্রবর্তিত বিদর্শন নীতির প্রকৃষ্ট অনুশীলনে যখন অরহত্ব ফল লাভ করা যায় তখনই আমিত্ব ধারণার সম্পূর্ণ বিলোপ সাধিত হয়।

১৪। প্রঃ অরহত্ব ফল কি? ইহার অনুক্রমিকতার পরিচয় দাও।

উঃ যে ব্যক্তি জ্ঞানের উৎকর্ষ সাধনের মাধ্যমে আপন জীবনে দুঃখের মূল কারণ যে লোভ, দ্বেষ ও মোহ তা বিশদভাবে অবগত হয়ে সেই লোভ, দ্বেষ ও মোহকে সমূলে উৎপাঠিত করে স্বীয় চিত্তে অলোভ, অদ্বেষ ও অমোহ তথা প্রজ্ঞার ভিত্তিকে সুদৃঢ় প্রতিষ্ঠা দান করতে যিনি সক্ষম তিনিই অরহত্ব ফল লাভী নামে দূর্লভ গৌরবের অধিকারী। অরহত্ব ফল লাভ করতে হলে ষড়েন্দ্রিয় পথে অনুভূত সর্ব বিষয়কে নাম ও রূপ এই দ্বিবিধ সংজ্ঞা আরোপ করে তাদের স্বভাবকে বিশেষ ভাবে দর্শন বা অবগত হওয়ার জন্যে বিদর্শন সাধনা প্রণালীর অভ্যাস করতে হয়। এই অভ্যাস আয়ত্বকরণের পথে অভিজ্ঞতা বা প্রজ্ঞার উন্নতি সাধনে প্রাথমিক স্তরের নাম স্রোতাপত্তি মার্গ ও ফল।

দ্বিতীয় স্তরের নাম সকৃদাগামী মার্গ ও ফল, তৃতীয় স্তরের নাম অনাগামী মার্গ ও ফল। এই তিনটি স্তর অতিক্রমের পর চতুর্থ বা শেষ পর্যায়ে অরহত্ব মার্গ ও ফল লাভ করা যায়।

১৫। প্রঃ ষড় ইন্দ্রিয় কি?

উঃ চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, কায় ও মন-এই ছয়টি অনুভূতি স্থলের নাম ষড়েন্দ্রিয়।

১৬। প্রঃ নাম ও রূপ বলতে কি বুঝায়?

উঃ ষড়েন্দ্রিয় জাত রূপ, বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই পাঁচটি বস্তুগত ও মনস্তাত্ত্বিক বিষয়কে পঞ্চস্কন্ধ বলা হয়। এই পাঁচটি স্কন্ধ বা বিভাগের মধ্যে চিত্ত বা মানস ক্ষেত্রের আওতাধীন বেদনা, সংজ্ঞা, সংস্কার ও বিজ্ঞান এই চারটিকে ‘নাম’ নামে আখ্যায়িত করে অপরটিকে রূপ সমষ্টি বা স্কন্ধ ধরা হয়। রূপ হল জল, বায়ু, মাটি ও তাপ এই চারটি বস্তু, যাহা শৈত্য ও উষ্ণতায় সংকোচন ও প্রসারণের ফলে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়; তা-ই রূপ।

১৭। প্রঃ ধর্ম কি? ইহা কত প্রকার ও কি কি?

উঃ সাধারণ অর্থে ধর্ম হল চিত্তের বিভিন্ন অবস্থা বা স্বভাব। এই অবস্থা বা ধর্ম তিন প্রকার যথা- কুশল, অকুশল ও অব্যাকৃত ধর্ম। কুশল হল পূণ্যময় চেতনা বা কাজ বা সংকাজ।

অকুশল হল পাপ চিন্তা জাত কাজ বা কুকাজ, এবং অব্যাকৃত হল যে কাজে বা চিন্তায় মানুষের কোন কল্যাণ হয় না বা দুঃখ অবসান হয় না; অথচ দূর্লভ সময় নষ্ট হয়। এ জাতীয় বিষয় সমূহ যা বুদ্ধ কর্তৃক বর্ণিত বা ব্যক্ত হয়নি তাদের অব্যাকৃত বা অব্যক্ত ধর্ম বলা হয়। যে বিষয়। যেমন-সৃষ্টি বা সৃষ্টি কর্তা প্রসঙ্গ।

১৮। প্রঃ বৌদ্ধ ধর্ম কি গৃহস্থ গণের প্রতিপাল্য ধর্মনীতি?

উঃ বুদ্ধ উপদিষ্ট দান, শীল ও ভাবনা এই তিনটি গৃহীদের প্রতিপাল্য ধর্ম নীতি। দান বলতে নিঃস্বার্থ ত্যাগ, শীল বলতে সদাচার নীতি বা সংযম, এবং ভাবনা বলতে সৎবিষয়ে মনের একাগ্রতা সাধন।

ধর্ম (ব্যবহারিক)

১। প্রঃ ষড় ছিদ্র কি?

উঃ আলস্য, প্রমাদ, হীন বীর্য, অসংযম, নিদ্রা ও তন্দ্রা। এই ছয়টির যে কোন একটির প্রবলতায় মানব জীবনে মহাপতন ডেকে আনে।

২। প্রঃ নিষিদ্ধ বাণিজ্য কি?

উঃ বৌদ্ধদের জন্যে নিষিদ্ধ বাণিজ্য পাঁচটি। যথা—

১) অস্ত্র বাণিজ্য ২) প্রাণী বাণিজ্য ৩) মাংস বাণিজ্য ৪) নেশা বাণিজ্য ৫) বিষ বাণিজ্য। এই পঞ্চ বাণিজ্য মানুষের মানবত্বকে ধ্বংস করে দেয়।

৩। প্রঃ চারি পরিহানি কি?

উঃ চারটি কারণে মানুষের আর্থিক পরিহানি হয়। যথা—

১) হারানো বা নষ্ট দ্রব্যের কারণ অনুসন্ধান করে সেই ভুলের পুনরাবৃত্তি বন্ধে সতর্ক না হলে।

২) জীর্ণ দ্রব্যের সংস্কার বা মেরামত না করলে।

৩) আয়ের অতিরিক্ত পান ভোজনে ব্যয় করলে।

৪) অসৎ স্ত্রী-পুরুষকে সম্পত্তির উত্তরাধিকারী করলে।

৪। প্রঃ সপ্ত পরিহানি কি কি?

উঃ ১) যে ভিক্ষু বা গৃহী সৎপুরুষগণের দর্শন করে না ২) যে সদ্ধর্ম শ্রবণ করে না ৩) যে শীল বা সংযমতা পালন করে না। ৪) যে সৎপুরুষ বা শীলবানদের প্রতি বা ভিক্ষুর প্রতি অপ্রসন্ন ৫) যে দোষ গ্রহণার্থে ধর্ম শ্রবণ করে ৬) যে নিত্য পরের ছিদ্র অন্বেষণ করে। ৭) যে বুদ্ধ নীতিতে প্রতিষ্ঠিত সংঘ ক্ষেত্রের বাহিরে গ্রহীতা অন্বেষণ ও গৌরব প্রদর্শন করে। এই সাতটি অযোগ্য কাজ পরিহানির কারণ হয়।

৫। প্রঃ সংসারী মানব ধর্ম সমূহ :

১) পাপ সঞ্চয়ের মূল কি? উঃ লোভ ২) পুণ্য সঞ্চয়ের মূল কি? উঃ সংযম ৩) নিত্য ব্যবহার্য ধর্ম কি? সন্তুষ্টি, ৪) পুণ্য বৃদ্ধির উপায় কি? কল্যাণ মিত্র

৫) সংসারীর প্রধান হানি কি? ধর্ম হানি ৬) শ্রীবুদ্ধির সম্পদ কি? উঃ প্রজ্ঞা ৭) মহা অনিষ্টকারী কি? প্রমাদ ৮) প্রঃ প্রকৃত অমৃত কি? অপ্রমাদ ৯) সর্ববিষয়ের পরি পহি কী? আলস্য ১০) সর্বার্থ সাধন কি? বীর্য ১১) প্রকৃত অজ্ঞানী কে? যে

অনাগত চিন্তা করে, উপস্থিত বিষয়ে উদাসীন হয় ১২) তৃষ্ণা তথা দুঃখকে বাড়ায় কে? যে অধর্মকে ধর্ম, ধর্মকে অধর্ম মনে করে সে ব্যক্তিই তৃষ্ণা বা দুঃখকে বাড়ায়, ১৩) প্রকৃত অভাব গ্রস্ত কে? যে সঞ্চিত দ্রব্যের অপব্যবহার করে এবং আয়ের পথ রুদ্ধ করে। ১৪) নিত্য পীড়িত কে? যে মাত্রাতিরিক্ত ভোগাকাজ্জ্বা বা তৃষ্ণার সেবক ১৫) বিপদকে বাড়ায় কে? যে ক্রোধকে মান অহঙ্কারে প্ররোচিত করে। ১৬) প্রকৃত দাতা কে? যে ধর্ম বা সদুপদেশ দান করে ১৭) প্রকৃত জন সেবক কে? যে বস্তুদ্বারা ও বাক্য দ্বারা অপরকে সাহায্য করে ১৮) প্রকৃত সঞ্চয়ী কে? যে প্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং প্রয়োজনীয় উপদেশ সঞ্চয় করে ১৯) প্রকৃত মানুষ কে? যে মিতব্যয়ী ও ইন্দ্রিয় সংযম করে, ২০) প্রকৃত বলশালী কে? উঃ যে স্মৃতি বল ও সমাধি বলে বলীয়ান।

৬। প্রঃ মিত্রের পরিচয় কি?

উঃ চারি কারণে মিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা- ১) দান করলে ২) প্রিয় বচন বললে ৩) উপকার করলে ৪) সমদর্শীতা গুণ প্রদর্শন করলে।

৭। প্রঃ উত্তম কে? অধম কে?

উঃ যে কথা ও কাজে সমতা রাখে সেই উত্তম। যে, তা করে না; সে জনই অধম।

৮। প্রঃ সপ্ত ধন কি?

উঃ শ্রদ্ধা, শীল, লজ্জা, ভয়, শ্রুতজ্ঞান, ত্যাগ, ও প্রজ্ঞা এই সাতটি মানব জীবনে পরম ধন।

৯। প্রঃ কাম দমনের উপায় কি?

উঃ কাম চিত্ত উৎপন্ন হলে নিম্নোক্ত আটটি বিষয়ের যে কোন একটি বিষয় চিন্তা করবে। যথা- ১) অশুভ চিন্তা ২) মরণ চিন্তা ৩) আহাৰ্য বস্তুর প্রতি ঘৃণা উৎপাদন ৪) জগতের সর্ব বিষয়ে অনিত্যতা-দর্শনে প্রতি উদাসীন ভাব ৫) অনিত্য বস্তুতে দুঃখ চিন্তা ৬) দুঃখময় বস্তুতে অনিত্য চিন্তা ৭) ত্যাগ চিন্তা ৮) যাবতীয় বিষয়ে ত্যাগ চিন্তা।

১০। প্রঃ আসব বা তৃষ্ণার কারণে কোথায় কোথায় জন্ম হয়?

উঃ ১) এমন সব আসব আছে যা মানুষকে নিরয়ে জন্ম দেয়। ২) কতগুলো তির্য্যগকূলে জন্ম দেয়, ৩) কতগুলো প্রেতকূলে জন্ম দেয় ৪) কতগুলো মানব কূলে জন্ম দেয় ৫) কতগুলো দেব লোকে জন্ম দান করে।

১১। প্রঃ তৃষ্ণা মোট কত প্রকার?

উঃ প্রধানতঃ তৃষ্ণা তিন প্রকার। যথা- কাম তৃষ্ণা, ভব তৃষ্ণা ও বিভব তৃষ্ণা। কিন্তু এই তৃষ্ণাত্রয় আধ্যাত্মিক ও বাহ্যিক ভেদে (৩*২)=৬টি। সেই ছয়টি তৃষ্ণা চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, জিহ্বা, কায় ও মন এই ষড়ায়তনে মোট ৬×৬=৩৬টি রূপ প্রাপ্ত হয়। এই ৩৬টি তৃষ্ণার সংখ্যা বর্তমান, অতীত ও ভবিষ্যত ভেদে ৩৬×৩=১০৮টিতে উপনীত হয়। সুতরাং তৃষ্ণার সর্বমোট সংখ্যা ১০৮টি।

১২। প্রঃ উন্মত্ত বা পাগল কত প্রকার?

উঃ ভগবান বুদ্ধ মার্গফল অপ্রাপ্ত পৃথগ্জন বা সাধারণ মানুষ মাত্রেই উন্মত্ত বলেছেন। এই উন্মত্ত পৃথকজন দুই প্রকার। যথা—কল্যাণ পৃথগ্জন এবং অন্ধ পৃথগ্জন। কল্যাণ পৃথগ্জন তাঁরাই যারা নিত্য দান, শীল ও ভাবনায় নিরত থাকেন। আর অন্ধ পৃথগ্জন হলেন পুণ্য সম্বন্ধে যারা উদাসীন।

সাধারণ উন্মাদের লক্ষণ আটটি যথা— ১) কামোন্মত্ত ২) ক্রোধোন্মত্ত ৩) দৃষ্টি উন্মত্ত বা ভ্রান্ত ধারণার বশীভূত ৪) মোহোন্মত্ত বা অজ্ঞানতার বশীভূত ৫) যক্ষোন্মত্ত বা অপদেবতার বশীভূত ৬) পিত্তোন্মত্ত ৭) সুরা উন্মত্ত এবং ৮) ব্যসনোন্মত্ত বা শোকের বশীভূত।

১৩। প্রঃ দান করে দাতা কয়টি ফল লাভ করেন?

উঃ দান করে দাতা ৫টি ফল লাভ করেন। যথাঃ— ১) দাতা বহুজনের ভালবাসা লাভ করে, ২) সাধু ও কৃতজ্ঞ পুরুষেরা দাতার গুণ স্মরণ করে, ৩) দাতার যশ-কীর্তি উৎপন্ন হয়, ৪) দাতার গৃহী জীবন সার্থক হয়, এবং ৫) মরণান্তে মনুষ্য কিম্বা দেবতা হন।

১৪। প্রঃ সংসার জীবনকে কি উপায়ে পবিত্র করা যায়?

উঃ চারিটি বিষয় পালনে গৃহী জীবনকে পবিত্র করা যায়। যথাঃ— ১) সুকর্ম সাধনে, ২) সৎকর্ম আচরণে, ৩) সৎ শিল্প বা জীবিকার অনুষ্ঠানে, ৪) প্রত্যেক বিষয়ে সংযম অবলম্বনে।

১৫। প্রঃ জ্ঞান কত প্রকার? উঃ জ্ঞান তিন প্রকার যথাঃ— চিন্তাময় জ্ঞান, শ্রুতময় জ্ঞান এবং ভাবনাময় জ্ঞান। ১) অপরের নিকট না শোনে শুধু স্বীয় চিন্তা বলে যে জ্ঞান লাভ করা হয় তাকে চিন্তাময় জ্ঞান বলে। ২) অপরের নিকট শুনে যে জ্ঞান লাভ করা যায় তাকে শ্রুতময় জ্ঞান বলে এবং ৩) ধ্যান সাধনা বলে যে জ্ঞান লাভ হয় তাকে ভাবনাময় জ্ঞান বলে।

১৬। প্রঃ জল-সমুদ্রের সাথে বুদ্ধের শাসন সমুদ্রকে কিভাবে তুলনা করা হয়েছে?

উঃ সমুদ্রের যেমন আটটি গুণ বিদ্যমান, বুদ্ধের শাসন সমুদ্রেও তেমনি আটটি গুণ বিদ্যমান দেখা যায়। যথাঃ— ১) সমুদ্র কখনো হঠাৎ করে গভীর হয় না, উহা ক্রমশঃ নিম্ন হয়; তেমনি বুদ্ধের শাসন সমুদ্রে ও প্রথমে শিক্ষা, তারপরে আচরণ এবং সর্বশেষে সাধনায় দুঃখ মুক্তি লাভ করা যায়। ২) সমুদ্রের জল স্বভাবতঃ কখনো তীরভূমি অতিক্রম করে না; তেমনি বুদ্ধ কর্তৃক যে সকল দুঃখ মুক্তির সহায়ক বিনয়-বিধান নির্ধারণ করা হয়েছে তা শিষ্যগণ কর্তৃক জীবনান্তেও লঙ্ঘিত হয় না।

৩) সমুদ্রে কোন মরা, পঁচা, আবজনার স্থান নাই, সমুদ্র তরঙ্গাঘাতে তা শীঘ্রই কুলে তুলে দেয়। তেমনই সম্বুদ্ধ শাসন সমুদ্রে ও পাপী, দুঃশীলের কোন স্থান নাই। তেমন দুঃশীল পাপধর্ম পরায়ণ যদি গোপনে অবস্থান করেও থাকে সে পবিত্র সংঘ হতে বহুদূরেই অবস্থান করে। তেমন পাপী কখনো চিন্তা শান্তিতে অবস্থান করতে পারে না।

৪) সমুদ্রে গিয়ে যাবতীয় নদীর পূর্ব নাম, অস্তিত্ব বিলোপ হয়। তেমনি বুদ্ধের শাসন সমুদ্রেও ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ, ধনী-নির্ধনী সকলেই পূর্বের সমস্ত কিছু ত্যাগ করে সাম্য একাকার ভাবপ্রাপ্ত হয়।

৫) যত জলধারাই সমুদ্রে পতিত হউক না কেন, তা কখনো পূর্ণ হয় না। তেমনি বুদ্ধের নির্বাণ সমুদ্রে ও কখনো স্থানাভাব হয় না।

৬) সমুদ্রের জল সর্বত্রই এক রস তথা লোণা রস সম্পন্ন। তেমনি বুদ্ধ দেশিত ধর্মবাণী সর্বত্রই এক রস-বিমুক্তি রস সম্পন্ন।

৭) সমুদ্র নানাবিধ বহুরত্নের আধার। তেমনি বুদ্ধের এই শাসন সমুদ্র ও সাইত্রিশ প্রকার বোধিপক্ষীয় ধর্ম রত্নের আধার।

৮) সমুদ্রে যেমন বহুপ্রাণীর বাস, তেমনই বুদ্ধের শাসন সমুদ্র ও অসংখ্য মার্গফল লাভী আর্য পুদগলকে ধারণ করে।

১৭। প্রঃ বুদ্ধাদি কল্যাণ মিত্রগণকে কয় প্রকারে পূজা করা যায় এবং কোন্ পূজা সর্বশ্রেষ্ঠ?

উঃ বুদ্ধাদি মহাকল্যাণ মিত্রগণকে জীবিত কালে দুই প্রকারে পূজা করা যায়। যথাঃ- প্রথম প্রকারে ফুল, প্রদীপ, সুগন্ধি, ধ্বজা, চন্দ্রাতপ এবং নিজেদের পরিভোগ যোগ্য খাদ্য ভোজ্যাদি দিয়ে পূজা করা। এই পূজাকে বস্তু দ্বারা পূজা বা আমিষ পূজা বলা হয়। দ্বিতীয় প্রকারের পূজা হল তাঁদের উপদিষ্ট শীল পালনে, সমাধি ভাবনায় মার্গফল লাভে ও ধর্ম দানে। এই পূজাকে নিরামিষ (বস্তুহীন) প্রতিপত্তি পূজা বলা হয়। বুদ্ধ চিরদিন এমন কি মহাপরিনির্বাণ শয্যা শায়িত হয়ে ও এই প্রতিপত্তি পূজারই উচ্চ প্রশংসা করেছিলেন।

১৮। প্রঃ চক্ষু কত প্রকার ও কি কি?

উঃ চক্ষু পাঁচ প্রকার। যথাঃ- মাংস চক্ষু, দিব্য চক্ষু, চর্ম চক্ষু, বুদ্ধ চক্ষু ও সামন্ত চক্ষু।

১৯। প্রঃ রাজার ধর্ম কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ রাজ ধর্ম দশ প্রকার। যথাঃ-দান, শীল, ত্যাগ, ঋজুতা, গুণ, মৃদু স্বভাব, তপঃ মৈত্রী, করুণা, শান্তি বা অবিরোধ।

২০। প্রঃ ভদ্র বা আর্য সম্মত আলাপ কয় প্রকার ও কি কি?

উঃ ভদ্র বা আর্য সম্মত আলাপ দশটি। যথাঃ-১) অল্লেখ্যার কথা (তৃষ্ণা বহুল না হওয়ার জন্যে পরস্পর আলাপ), ২) সন্তুষ্টি কথা (ধর্মতলন্ধ বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকার আলাপ), ৩) প্রবিবেক কথা ক) নির্জন বাসে উৎসাহ দান কথা বা কায় বিবেক, খ) কাম চিন্তা ত্যাগে ধ্যান উৎপাদক চিন্তা বিবেক কথা এবং গ) অহং বা আমিভূ ভাব ত্যাগে উপাধি বিবেক এই তিন বিষয়ে আলাপ ৪) অসংগর্গ কথা (স্ত্রী পুরুষে পরস্পরের সংসর্গ ত্যাগে সুখ- এই প্রকার আলাপ), ৫) বীর্যানুষ্ঠান কথা (পুণ্যানুষ্ঠান বা সমাধি ভাবনার উদ্যম উৎসাহ উৎপাদক আলাপ), ৬) শীল কথা, ৭) সমাধি কথা, ৮) প্রজ্ঞা কথা তথা জ্ঞান উৎপাদন মূলক কথা ৯) বিমুক্তি কথা (অরহত্ব ও নির্বাণ বিষয়ক আলাপ), ১০) বিমুক্তি জ্ঞান দর্শন কথা (সংসার দুঃখ হতে মুক্তি লাভে আর্য জ্ঞানের পুনঃ পুনঃ পর্যবেক্ষণ আলাপ)।

ইতিহাস বিভাগ

(প্রাচীন যুগ)

১। প্রঃ প্রথম ধর্ম সঙ্গীতি তথা বুদ্ধ বাণী সংগ্রহ কেন, কখন, কার নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত হয়?

উঃ বুদ্ধের আশিজন মহাশ্রাবকের অন্যতম ধৃতাস ব্রতে সর্বশ্রেষ্ঠ মহাকাশ্যপ স্ববির পাঁচশ ভিক্ষু সংঘ নিয়ে তখন পাবা নগরে অবস্থান করছেন। কুশীনগর হতে সংবাদ গেল মহাকারণিক বুদ্ধ তথাগত তথায় কালগত হয়েছেন সপ্তাহ খানেক পূর্বে। এই সংবাদে সাধারণ ভিক্ষুগণ শোকাহত হয়ে অশ্রু বিসর্জন করতে লাগলেন। সেই সংঘের মধ্যে সুভদ্র নামে এক বুদ্ধ প্রব্রজ্যিত ভিক্ষু ছিল। সে বলল, “কেন বন্ধুরা অহেতুক বিলাপ করছেন। তিনি কালগত হয়েছেন ভালই হয়েছে। নচেৎ এই কর, সেই কর, এই করবে না, সেই করবে’ -এমন বলে বলে সর্বক্ষণ কি জ্বালাতনই না তিনি করতেন। এখন অন্ততঃ তা থেকে বাঁচলাম।” নব প্রব্রজ্যিত বুদ্ধের এমন অশোভন উক্তি শুনে স্ববির মহাকাশ্যপের এই ধারণা হল যে, “অহো! বুদ্ধের দেহ বিদ্যমান থাকতেও এমন কদর্য উক্তি! না জানি সম্মুদ্র শাসনে এমন সুভদ্র আরো কত আছে। এদের হাত হতে ছড়ানো ছিটানো বুদ্ধ বচনকে অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। ধৃতাস শ্রেষ্ঠ স্ববির মহাকাশ্যপের এই সিদ্ধান্তই প্রথম ধর্ম সঙ্গীতি অনুষ্ঠানের কারণ। প্রথম ধর্ম সঙ্গীতির আয়োজন হয় খৃষ্ট পূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের ৪ মাস পর রাজ গৃহের সপ্তপর্ণী গৃহদ্বারে, মহাকাশ্যপ স্ববিরের নেতৃত্বে মগধ রাজ অজাতশত্রুর রাজত্ব কালে তাঁরই পৃষ্ঠপোষকতায়।

২। প্রঃ কতজন ভিক্ষুর প্রতিনিধিত্বে এই ধর্ম সঙ্গায়ন হয়? কাকে কোন্ বিষয়ের ভার দেওয়া হয় এবং কতদিন ধরে এই সঙ্গায়ন চলে?

উঃ উপস্থিত সাত লক্ষ ভিক্ষু হতে মাত্র পাঁচ শত অরহৎ ভিক্ষুর প্রতিনিধিত্বে এই সঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়। সংগ্রহের মধ্যে মহাশ্রুতিধর ধর্ম ভাষাগারিক বুদ্ধের প্রধান সেবক আনন্দ স্থবিরকে ভার দেয়া হয় ধর্ম বিষয়ে বুদ্ধের দীর্ঘ ৪৫ বছরের দেশিত সমগ্র বুদ্ধ বচনকে সংগ্রহ করে আবৃত্তি করতে। এবং বিনয় বা ভিক্ষুদের আচার ব্যবহার সম্পর্কিত বুদ্ধের যাবতীয় বিধি বিধান সংগ্রহের ও আবৃত্তির ভার দেয়া হয় বিনয় শ্রেষ্ঠ উপালী স্থবিরকে। এই ধর্ম সঙ্গায়ন সমাপ্ত হতে সময় লাগে সাত মাস।

৩। প্রঃ প্রথম ধর্ম সঙ্গীতিতে সমগ্র বুদ্ধ বচনকে কয় ভাগে বিভক্ত করে সংগৃহীত হয়?

উঃ এই সঙ্গীতিতে ধর্ম ও বিনয় এই দুই ভাগে বিভক্ত করে সমগ্র বুদ্ধ বচনকে সংগ্রহ করা হয়।

৪। প্রঃ প্রথম ধর্ম সঙ্গীতির কত বৎসর পরে কি কারণে, কাহার নেতৃত্বে, কতজনের প্রতিনিধিত্বে, কার সহযোগিতায় দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় এবং সমাপ্ত হতে কতদিন লাগে?

উঃ প্রথম সঙ্গীতির একশত দশ বছর পরে খৃঃ পূর্ব চতুর্থ শতকে বৈশালীর বালুকারামে কাকন্ড পুত্র স্থবির যশঃ প্রমুখের উদ্যোগ, স্থবির রেবতের সভাপতিত্বে, রাজা কালাশোকের রাজত্বকালে এবং তাঁহার সহযোগিতায় দ্বিতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। ইহাতে সাত শত অরহন্ত ভিক্ষু প্রতিনিধিত্ব করেন। আট মাসে এই সঙ্গায়ন সমাপ্ত হয়। দ্বিতীয় ধর্ম সঙ্গীতি আহ্বানের কারণ হল বৈশালীর বৃজি বংশীয় কতিপয় ভিক্ষু টাকা পয়সা, সোনা-রূপা গ্রহণ, তারি, সুরা সেবনাদি সম্পর্কিত দশটি বিনয় বিধানে ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিধি নিষেধকে অগ্রাণহ্য করার প্রচারণা শুরু করলে তাদের এই অশুভ প্রয়াসকে রোধ করার উদ্দেশ্যে দ্বিতীয় ধর্ম সঙ্গায়ণ অনুষ্ঠিত হয়।

৫। প্রঃ বজ্জী পুত্র ভিক্ষুদের বিরুদ্ধে আনীত এই ‘দশ বস্ত্র’ বা দশটি অভিযোগ কি কি?

উঃ দশ বস্ত্র বা বিনয়ের ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র বিধি নিষেধ সমূহের বিরোধী যাহা বজ্জীপুত্র ভিক্ষুরা সংঘের মধ্যে চালু করার প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন তাহা নিম্নরূপঃ- ১) যেখানে খাদ্যে লবণের প্রয়োজন সেখানে ভোজনের নিমিত্ত শৃঙ্গে লবণ রাখা সংগত ২) ছায়া পূর্ব দিকে দুই আঙ্গুল পরিমাণ গমন পর্যন্ত বিকেলে খাদ্য ভোজ্য ভোজন করা সংগত। ৩) এখন গ্রামে প্রবেশ করবো, এ ধারণায় (পূর্বে) ভোজনের সময় প্রবারিত (আর খাব না) হলেও অতিরিক্ত বিনয় কর্ম না করে ভোজন করা চলবে। ৪) সমান ‘সীমা, সম্পন্ন অর্থাৎ একই নিকায় ভূক্ত অথচ

ভিন্ন আবাসের ভিক্ষুরা ভিন্ন ভিন্নভাবে উপোসথ করতে পারবে। ৫) ভিক্ষু আসলে অনুমতি নেব, এ ধারণায় বর্গ বা অপূর্ণ সংঘ কর্তৃক সংঘ কর্ম করা সংগত। ৬) আমার আচার্য উপাধ্যায় যাহা আচরণ করেছেন, ন্যায্য-অন্যায্য বিচার না করে আমাদের ও তা আচরণ করা সংগত। ৭) যে দুধ দুগ্ধ অবস্থা অতিক্রম করেছে অথচ এখনো দধিতে পরিণত হয়নি সেরূপ দুগ্ধ ভোজনে ভিক্ষু কর্তৃক প্রবারিত হলেও পরে অতিরিক্ত বিনয় কর্ম না করে তা পান করা যাবে। ৮) যে সুরায় এখনো মাদকতা জন্মে তা ভিক্ষুদের পান করা সংগত। ৯) পার বিহীন বস্ত্র খন্ড বিছানার চাদর হিসেবে ভিক্ষুদের ব্যবহার করা সংগত। ১০) টাকা পয়সা সোনা রূপা ভিক্ষুদের গ্রহণ করা সংগত।

৬। প্রথম সঙ্গীতি ও দ্বিতীয় সঙ্গীতির মধ্যে পার্থক্য কি?

উঃ ধর্ম ও বিনয় সংক্রান্ত ছড়ানো ছিটানো সমগ্র বুদ্ধ বচনকে সংগ্রহ করা ছিল প্রথম ধর্ম সংগায়নের উদ্দেশ্য। দ্বিতীয় সঙ্গায়নের লক্ষ্য ছিল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ গুলোকে পালন ও লঙ্ঘনের বিষয়ে কর্তব্য নির্ধারণ করা।

প্রথম সঙ্গীতিতে বিনয় বিষয়ক কতগুলো জটিল প্রশ্নের আলোচনা ও মীমাংসা হলেও উহাতে প্রথমে ধর্ম সঙ্গীতি ও পরে বিনয় সঙ্গীতির অনুষ্ঠান হয়। কিন্তু দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে বিনয় সঙ্গায়ণই অধিক গুরুত্ব লাভ করে।

৭। প্রঃ দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে অনুমোদিত বিষয়ে সংঘের মধ্যে কোন বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল কি?

উঃ হ্যাঁ, এই সঙ্গীতির অনুমোদিত বিষয়ে বৃজি বংশীয় ভিক্ষুরা অরহন্ত ভিক্ষুদের অনুমোদিত বিনয় বিধানকে মেনে নেয়নি। তারা এর প্রতিবাদ স্বরূপ প্রায় দশহাজার ভিক্ষুর সমাবেশ ঘটায় বৈশালীর মহাবন কুঠাগার শালায় মহাসঙ্গায়ণ নামে অপর একটি সঙ্গায়ণের অনুষ্ঠান করেন এবং সমাবেশে সংখ্যাধিক্য হেতু দলের নাম রাখেন মহাসঙ্গিক দল।

৮। প্রঃ বজ্জি পুত্র ভিক্ষুদের আহত এই প্রতিবাদী সঙ্গায়ণের ফল কি হল?

উঃ এই অশুভ সঙ্গায়ণের ফল শতাব্দীকালের ঐক্যবদ্ধ সংঘে বিভেদের বিষবৃক্ষ রোপিত হল। পরবর্তী শতাব্দীকাল পর্যন্ত মহাসঙ্গিক ছাড়া অন্যকোন বিভেদ প্রকট না হলেও উভয় দলের মধ্যে ভিতরে ভিতরে বহু প্রচ্ছন্ন মতভেদ দেখা দিতে শুরু করল।

৯। প্রঃ ‘মহাসঙ্গীতি’তে ধর্ম বিনয়ের অবস্থা কিরূপ হল?

উঃ এই সঙ্গীতিতে যুগের দোহাই দিয়ে মূল ধর্ম ও বিনয়কে অগ্রাহ্য করে ধর্ম ও বিনয়ের কতকাংশ বর্জন করে স্বেচ্ছামত নতুনাকারে ধর্ম ও বিনয় সংগ্রহ প্রস্তুত করা হল। একস্থানের সূত্র অন্যস্থানে সন্নিবেশিত করা হল। এক অর্থে কথিত বাক্য অন্য অর্থে ব্যাখ্যা করা হল। এভাবে সমগ্র বুদ্ধ শাসনে তারা আনলেন এক মহা বিপ্লব।

১০। প্রঃ দ্বিতীয় ধর্ম সঙ্গীতির পর কোন্ মতবাদ কি নামে পরিচিত হল?

উঃ বজ্জি পুত্রদের দ্বারা গঠিত মতবাদের নাম হল ‘আচারিয়াবাদ’ আর প্রাচীন পশ্চীগণের মতবাদের নাম হল ‘থেরবাদ’। ধর্ম এবং বিনয় সংগ্রহে ও দুই নাম হল-নতুনটা- ‘ভিন্ণবাদ’ এবং প্রাচীনটা ‘থেরবাদ’।

১১। প্রঃ বৈশালীর মহা সভার বিবরণী মতে (মহাসাঙ্ঘিকদের) কোন্ অঞ্চলে কাদের প্রাধান্য পরিলক্ষিত হয়?

উঃ বৈশালীর মহাসভার বিবরণী মতে কৌশাম্বী, অবন্তী, প্রতীচীন, এবং অন্যান্য দেশের প্রতিনিধিগণ ছিলেন প্রাচীন পন্থার অনুগামী। অপরদিকে বৈশালী, পাটলী পুত্র ও অন্যান্য পূর্ব দেশীয় ভিক্ষুগণ ছিলেন নবীন মতের পরিপোষক।

১২। প্রঃ নবীন পন্থীদের জয় যাত্রায় প্রাচীন পন্থীদের অবস্থা কি হল?

উঃ প্রাচীন পন্থী বহু ভিক্ষু কিছুদিন পাটলী পুত্র ও তার আশে পাশে পরিবর্তন বাদীদের সাথে একত্রে ছিলেন বটে, কিন্তু নৈষ্ঠিকতা বজায় রাখতে অসুবিধা বোধ করায় অধিকাংশই প্রস্থান করলেন কৌশাম্বী, অবন্তী, প্রভৃতি অপেক্ষাকৃত নিরাপদ

স্থানে। পরিবর্তন বাদীদের এমন অবাধ প্রশ্রয় দানের ফলে ক্রমে তারা এত দাস্তিক ও প্রবল হয়ে উঠলেন যে, প্রাচীন মতবাদীদের সেই নিরাপদ স্থান গুলোতে নানা কৌশলে বিভেদের বীজ ছড়িয়ে নিজেদের প্রভাব প্রতিপত্তি অবিরাম গতিতে বাড়িয়ে চললেন।

১৩। প্রঃ দ্বিতীয় ধর্ম সঙ্গীতির কত বছর পর কোথায়, কার নেতৃত্বে ও কার সহায়তায় ৩য় সঙ্গীতি আহূত হয়?

উঃ বৈশালীর মহাসভার প্রায় এক শতাব্দী পরে খ্রীঃ পূর্ব ২৫৩ অব্দে সম্রাট অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বা অষ্টাদশ বর্ষে যখন তিনি বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন তখন তাঁরই সহায়তায় স্থিত প্রাজ্ঞ, স্থবিরাগ্রগণ্য মোগ্গলি পুত্র তিস্য স্থবিরের নেতৃত্বে পাটলী পুত্রের অশোকারামে তৃতীয় ধর্ম সঙ্গীতি আহূত হয়।

১৪। প্রঃ তৃতীয় সঙ্গীতি আহবানের কারণ কি?

উঃ ভিক্ষুদের ক্রমবর্ধমান আত্মকোন্দলের সুযোগে বিভিন্ন সম্প্রদায় ও ভিন্ন আচারভুক্ত বহু তীর্থিকেরা লাভ সংকারের প্রলোভনে কষায় বস্ত্র নিয়ে সঙ্ঘে প্রবেশ পূর্বক পাটলী পুত্রাদি অঞ্চলে উচ্ছৃঙ্খলতা ও অনাচার এমন বাড়িয়ে তুলল যে সম্রাট ধর্মশোক নিজেই উদ্বিগ্ন হয়ে এই ধর্ম সঙ্গায়ণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

১৫। প্রঃ তৃতীয় ধর্ম সঙ্গায়ণে কি কি কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়।

উঃ তিস্য স্থবিরের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত এই মহতী সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ধর্ম বিনয়ে অজ্ঞ, উচ্ছৃংখল, অবাঞ্ছিতদেরকে শ্বেতবস্ত্র পরিধান করায় (সেতকানি বথানি দত্ত্ব) বৌদ্ধ সংঘ হতে বিতাড়ন করা হয়। এই সঙ্গায়ণে স্থবিরবাদ প্রকৃত

বুদ্ধ বচন হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। ধর্ম ও বিনয়কে অভিধর্ম, সূত্র ও বিনয় এই তিন ভাগে বিভক্ত করে সূত্র বিনয় ও অভিধর্ম এই ক্রমে সঙ্গায়ণ করতঃ সমগ্র বুদ্ধ বচনকে ত্রিপিটক নামে অভিহিত করা হয়। স্থবিরবাদ শোধনের জন্যে এই সভায় যে পাঁচশত মতবাদ খন্ডন করা হয়, সেই মত বিচারের যুক্তিগুলো ‘কথাবথু’ নামে অভিধর্ম পিটকের সাথে সংযোজন করা হল। এভাবে সংশোধনের মাধ্যমে সংঘকে একতাবদ্ধ করা বা ‘সমগ্র’ করার একটা চেষ্টা হল (সংঘে সমগ কটে), এবং সংঘ ভেদের যে কোন অপচেষ্টার বিরুদ্ধে ‘দণ্ড পারুষ্য’র অনুশাসন প্রচার করা হল। প্রত্যন্ত ও প্রতিবেশী দেশ সমূহে ধর্ম প্রচার ও সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠার পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল।

১৬। প্রঃ তৃতীয় সঙ্গীতিতে সমগ্র ত্রিপিটককে যেভাবে সজ্জিত করা হয়েছে তার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দাও।

উঃ সমগ্র বুদ্ধবাণী তিন ভাগে বিভক্ত; যথা- সুত্ত, বিনয় ও অভিধর্ম।

• সূত্র : দীর্ঘ নিকায়, মজ্জিম নিকায়, সংযুক্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায়, খুদ্দক নিকায়; এই পঞ্চনিকায়ে বিভক্ত। খুদ্দক নিকায় ভক্ত করা হয়েছে আরো ১৬টি গ্রন্থকে; যথা- খুদ্দক নিকায় : খুদ্দক পাঠ, ধম্মপদ, উদান, ইতিবুত্তক, সুত্ত নিপাত, বিমান বথু, পেত বথু, থের গাথা, থেরী গাথা, জাতক, নিদ্দেশ, পটিসম্বিদামগ্গ, অপদান, বুদ্ধবংশ, চরিয়াপিটক।

বিনয় : পারাজিকা, পাচিত্তিয়, মহাবগ্গ, চুল্লবগ্গ, পরিবার পাঠ।

অভিধর্ম : ধম্মসঙ্গী, বিভঙ্গ, পুণ্ডলপঞ্জত্তি, ধাতুকথা, কথাবথু, যমক, পট্টান। অতএব সমগ্র ত্রিপিটক সর্বমোট ২৬টি গ্রন্থের সমষ্টি।

১৭। প্রঃ তৃতীয় সঙ্গীতির পর ধর্মের প্রচার প্রসারে যে পদক্ষেপ নেয়া হয় তার বর্ণনা দাও।

উঃ নৃশংস কলিঙ্গ বিজয়ের পর সম্রাট অশোক বৌদ্ধধর্মের অগ্রমেয় মৈত্রীতে মুগ্ধ হল। এতে তিনি ধর্ম বিজয়কে প্রকৃত বিজয় বলে ধরে নিলেন। তাই স্বয়ং সম্রাটের উৎসাহে মৌদগলী পুত্র তিষ্যস্থবিরকে কাশ্মীর ও গান্ধারে, স্থবির মধ্যান্তি ককে অপরান্ত রাজ্যে; যবন ধর্মরক্ষিত কে যবন দেশে (মধ্য প্রাচ্য ও গ্রীক); স্থবির মহা রক্ষিতকে হিমালয় প্রদেশে; স্থবির মধ্যমকে, সুবর্ণ দ্বীপে (বর্তমান বার্মা), শোন ও উত্তর নামক স্থবিরদ্বয়কে যাভা সুমাত্রা ও শ্যামদেশে এবং তাম্রপণী বা লঙ্কা, দ্বীপে স্থবির মহেন্দ্র প্রভৃতিকে উপযুক্ত সঙ্গী সহ প্রেরণ করেন। শুধু তিস্তু সঙ্ঘ প্রেরণই নহে, অশোক শিলা লিপিতে দেখা যায় তিনি নিজেও বুদ্ধের ধর্মানুশাসন তাম্রপট ও পাথরে লিখে নিজ অমাত্যদের দিয়ে তাঁর সম্রাজ্যের সর্বত্র পথের পাশে পাহার গাড়ে এবং জন গুরুত্ব পূর্ণস্থানে প্রতিষ্ঠিত করে। সম্রাট ধর্মশোকের এই সক্রিয় উদ্যোগের ফলেই বৌদ্ধ ধর্ম এত দ্রুত ভারত ও ভারতের বাইরে বিস্তার লাভে সক্ষম হয়।

১৮। প্রঃ গণ চিত্তকে ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করে রাখার জন্যে সম্রাট অশোক কি অভিনব উপায় অবলম্বন করেন?

উঃ ভগবান বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের পর তাঁর সমস্ত অস্থিধাতু যে সকল স্থানে নিদান তথা সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়েছিল তন্মধ্যে রামগ্রাম ব্যতীত অপর ৭টি স্থান হতে সংগ্রহ করে সমগ্র ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধাতু চৈত্য স্থাপন করে স্থানীয় লোকদের পূজার সুযোগ করে দেন। বুদ্ধের মানব কল্যাণ ধর্মীয় বাণী সমূহ, শিলালিপিতে উৎকীর্ণ করে জন সমাগমের স্থানে স্থাপন করেন, এমন কি পাষণময় গিরিগাত্রে খোদিত করে রাখেন। নগরে নগরে বুদ্ধবাণীযুক্ত শিলাস্তম্ভ স্থাপন, বৌদ্ধধর্মের আদর্শে মানুষ ও পশুর জন্যে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, রাজপথে ঔষধী ও ছায়া সম্পন্ন বৃক্ষ রোপন, দুর্ভিক্ষ উপশকে শাস্যে ভাগ্য এবং পানীয় জলের জন্যে দিঘী খনন ইত্যাদি বুদ্ধ প্রশংসিত পুণ্যকর্ম তিনি সম্পাদন করেন।

১৯। প্রঃ সম্রাট ধর্মাশোকের পর বৌদ্ধ ধর্মের ক্রম বিবর্তন বর্ণনা কর।

উঃ সম্রাট ধর্মাশোকের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ ধর্ম কিছুকাল তেমন রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেনি না, বিরাট ব্যক্তিত্ব শালী কোন সংঘনায়কের সন্ধানও তেমন পওয়া যায়নি। এই সুযোগে গুরু হল ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনঃ জাগরণ। তখন স্বভাবতঃই বৌদ্ধ ধর্ম পরবর্তী দুই তিন শতাব্দী ধরে ম্রিয়মান হয়ে রইল। এরপর আসল ভারতীয় ও অভ্যন্তরীণ সংঘাত জাত আর এক নবযুগের উত্তাল তরঙ্গ। সেই নবযুগের প্রভাবী উষার দীপ্তি নিয়ে খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বৌদ্ধ সম্রাট কণিষ্কের পৃষ্ঠ পোষকতায় জন্ম হল মহাযান মতবাদ।

বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যযুগ

(খ্রীষ্টীয় প্রথম শতক হতে সপ্তম শতক)

২০। প্রঃ বৌদ্ধ ধর্মে মহাযান মতবাদের উদ্ভবের কারণ নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মত কি?

উঃ খ্রীস্ট পূর্ব ২৫৩ অব্দে সম্রাট ধর্মাশোকের উদ্যোগে যে তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় তাতে স্থবিরবাদকে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর স্থান দিয়ে সমগ্র বুদ্ধ বচনকে সূত্র, বিনয় ও অভিধর্ম এই তিনভাগে বিভক্ত করে পালি ভাষায় সংগ্রহ করা হয়। কিন্তু সম্রাট অশোকের মৃত্যুর পর বৌদ্ধ সংঘ দীর্ঘ সাড়ে তিনশ বছরে বিনয়, ক্ষুদ্রানুক্ষুদ্র শিক্ষাপদ এবং ভিক্ষু মতাদর্শনের প্রায় ১৮টি দল উপদলে ভাগ হয়ে অবস্থা শোচনীয় করে তোলে। খ্রীষ্টীয় প্রথম শতকে (৭৮ খ্রীঃ) সম্রাট কণিষ্ক যখন বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন তখন সংঘের এই হীনদশা দূর করার জন্যে আচার্য বসুমিত্রের নেতৃত্বে তিনি পুরুষপুরে (আধুনিক পেশোয়ারা) মতান্তরে কাশ্মীরের

কুন্দল বনে ভারতের বুকে চতুর্থ ও সর্বশেষ মহাসভা আহবান করে সংঘের পুনঃ সম্মিলন প্রচেষ্টা করেন। ইহাতে মহাসাংঘিকদের মতকে প্রাধান্য দিয়ে সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যকে মহাকবি অশ্বঘোষ কর্তৃক সংশোধিত হয়ে সংস্কৃত ভাষায় পরিবর্তন করা হয়। এই রূপান্তরিত মতবাদের নাম হয় সর্বাঙ্গিবাদ। এরপর ক্রমশঃ আচার্য অশ্বঘোষ, নাগার্জুন, দিঙনাগ, অসঙ্গ, বসুবন্ধু বা বসুমিত্র, ধর্মকীর্তি প্রভৃতি প্রতিভাশালী প্রখ্যাত আচার্য-গণের দ্বারা সংস্কৃত ভাষায় বৌদ্ধ দর্শনের উপর অনেক মৌলিক গ্রন্থ রচিত হয়ে ধর্মপুস্তকের মর্যাদা লাভ করতে থাকে। অপরদিকে সমর্থ এবং প্রতিভাবান লেখকের অভাবে পালি ভাষা ক্রমশঃ তার পূর্ব মর্যাদা হারাতে থাকে। কিন্তু অত্যাশ্চর্যকালের মধ্যেই সর্বাঙ্গিবাদ নাগার্জুন, দিঙনাগ, বসুমিত্র, অসঙ্গ প্রভৃতির নেতৃত্বে সৌতান্ত্রিক, মাধ্যমিক, যোগাচার ও বৈভাষিক এই চারি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এই বিভক্তির পর পরই অতীতের মহাসাংঘিক ও লোকোত্তরবাদের অনুসরণে নাগার্জুন রচনা করলেন বিখ্যাত ‘প্রজ্ঞাপারমী সূত্র’। এই প্রজ্ঞাপারমী সূত্রকে ভিত্তি করেই মাধ্যমিক ও যোগাচার সম্প্রদায় সম্মিলিত হল। তারা তখন নিজেদের নাম রাখলেন সমষ্টি মুক্তিবাদ তথা বোধিসত্ত্ববাদ বা ‘মহাযান বাদ’ এবং অন্য দুই সম্প্রদায়কে আখ্যা দিলেন ‘হীনযান’ বা একক মুক্তিবাদ।

২১। প্রঃ মহাযানের উৎকর্ষতা কতদিন সমুন্নত ছিল?

উঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত মহাযান মতবাদ দার্শনিক চিন্তাধারার উচ্চতম শিখরে আরোহণ করে। তৎপর হতে তাঁদের পতন সুচিত হয়ে তন্ত্রযান, মন্ত্রযান বজ্রযান, সহজযান এসকল বিকৃত বৌদ্ধ ধর্মের জন্ম হয়।

২২। প্রঃ স্থবিরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে কোন্ সঙ্গায়নকে চতুর্থ ধর্মসঙ্গায়নের মর্যাদা দেয়া হয়? এই সঙ্গায়নের বর্ণনা দাও।

উঃ আচার্য বসু মিত্র এবং রাজা কনিষ্কের সহায়তায় অনুষ্ঠিত ধর্ম সঙ্গায়ন খেরবাদী মতের অনুকূলে না হওয়ায় খেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে ইহার স্থান নাই।

সম্রাট অশোকের দ্বারা অনুষ্ঠিত ৩য় সঙ্গীতির ধারামতে তথাগত পরিনির্বাণের ৪৫০ বছর পরে খৃঃ পূর্ব ২৫ অব্দে সিংহলের রাজা বট্টগামিনীর রাজত্বকালে সিংহলের মিহিন তালে আলো বিহারে রাজা বট্টগামিনীর সহায়তায় স্থবির মহা ধর্মরক্ষিতের নেতৃত্বে অনুষ্ঠিত ধর্ম সঙ্গায়নকে চতুর্থ সঙ্গীতির স্থান দেয়া হয়। কথিত আছে, সে সময় কাল পর্যন্ত লংকায় বুদ্ধ বচনের কোন লিখিত রূপ ছিল না। শ্রুতিধন অরহ-ত্বদের স্মৃতির মধ্যেই তা নিবদ্ধ ছিল। একবার শ্রীলংকায় দীর্ঘ অনাবৃষ্টির ফলে মহা দুর্ভিক্ষ দেখা দিল। তাতে বহু সংখ্যক সেই শ্রুতিধর অরহন্তগণ কালগত হলেন। এতে ভবিষ্যতে বুদ্ধ বচন লুপ্ত হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিলে রাজা বট্টগামিনী এই ধর্ম সঙ্গায়নের আয়োজন করে সমগ্র বুদ্ধ বচনকে মাগধী বা পালি ভাষায় তালপত্রে লিপিবদ্ধ করলেন। তাই এই সঙ্গায়নের নাম হয় পুস্তক সঙ্গায়ন।

২৩। প্রঃ বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে পঞ্চম ধর্ম সঙ্গীতি কখন কোথায় অনুষ্ঠিত হয় বর্ণনা দাও।

উঃ খ্রীস্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে ব্রহ্মরাজ মিনডন মিনের রাজত্বকালে তাঁরই সহায়তায় মান্দালয়ের দক্ষিণারামে ২৪১৫ বুদ্ধ বর্ষে ত্রিপিটক ধর জাগর মহাস্থবিরের নেতৃত্বে ২৪ শতের মতো অরহৎত ভিক্ষুকে নিয়ে পঞ্চম সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এই সঙ্গীতিতে ১৮৬০ খ্রীঃ হতে ১৮৭১খ্রীঃ পর্যন্ত ১১ বৎসর সময় ধরে সমগ্র বুদ্ধ বচনকে শ্বেত পাষাণ ফলকে উৎকীর্ণ করা হয়। তাই এই সঙ্গায়ণ পাষাণ সঙ্গায়ন নামে প্রসিদ্ধ। পুস্তক রোদ, বৃষ্টি বা কীটের দ্বারা নষ্ট হয়ে যায় বলে সেই ধ্বংসের হাত হতে বুদ্ধ বচনকে রক্ষার জন্যে পাচাণ সঙ্গায়নে এই ব্যবস্থা করা হয়।

২৪। প্রঃ ষষ্ঠ সঙ্গায়ন কোথায় এবং কখন অনুষ্ঠিত হয়?

উঃ সমাগত ২৫০০ বুদ্ধ বর্ষে বুদ্ধ জয়ন্তীর স্মারক রূপে স্বাধীন বার্মার প্রথম প্রধান মন্ত্রী উঃ নূর অকৃত্রিম সাহায্যে রেঙ্গুনের বিখ্যাত ‘কবোয়ে’-নামক সঙ্গায়ন গুহায় সমগ্র বিশ্বের প্রায় আড়াই হাজার পণ্ডিত ভিক্ষুর সমাগমে ১৯৫৪ খ্রীঃ হতে ১৯৫৬ খ্রীঃ পর্যন্ত দুই বৎসর ব্যাপী ৬ষ্ঠ সঙ্গায়ন অনুষ্ঠিত হয়। এই ধর্ম সঙ্গায়নে বিভিন্ন দেশের থেরবাদী পিটক গুলোর তুলনামূলক পাঠ শেষে অনুপযুক্ত বাক্য বা শব্দ বাদ দিয়ে সমস্ত থেরবাদী দেশের বৌদ্ধ পিটক সমূহকে এক নিয়মে পুনঃ মুদ্রণ করা হয়।

বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম

(বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয় যুগ বা আলো আধারী পর্ব)

১। বাংলাদেশে কবে থেকে বৌদ্ধ ধর্মের প্রচার শুরু হয়?

উঃ বিখ্যাত চীনা পরিব্রাজক হুয়েন সাঙ এর বিবরণী মতে বুদ্ধ পুণ্ডর্বর্ধন তথা পুণ্য বর্ধনে (বর্তমান উত্তর বঙ্গের মহাস্থান গড়াঞ্চল) এসেছিলেন এবং তথায় তিন মাস কাল অবস্থান করে ধর্মবাণী প্রচার করেছিলেন। হুয়েন সাঙ এর উক্তির সমর্থন মিলে সংযুক্ত নিকায় ও অপদান গ্রন্থে। সেখানে

বঙ্গান্ত পুত্র ও বঙ্গীশ নামে বুদ্ধের দুই মহাপ্রাবকের সন্ধান পাওয়া যায়। বঙ্গে জন্ম বলে তাদের এরূপ নামাকরণ বলে সেখানে উক্ত হয়েছে। এ ক্ষেত্রে বঙ্গীশ স্থবিরের উক্তি প্রণিধান যোগ্যঃ

“বঙ্গে জাতন্তা বঙ্গানং ইস্সরোহিতি,

বঙ্গীসো মে নামং অভবি লোক সম্মতো।”

অর্থাৎ-আমার পূর্ব জন্ম হয় (গৃহীকুলে) বঙ্গদেশে। তাই বঙ্গীশ নামেই আমাকে জনগণে জানেন।

উপরোক্ত প্রণিধান মতে খ্রীঃ পূর্ব পঞ্চম শতকেই বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বিস্তার শুরু হয়।

২। প্রঃ কত খ্রীষ্টাব্দ হতে বঙ্গদেশে মহাযানের প্রাদুর্ভাব ঘটে?

উঃ সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় ২য় শতকের দিকেই বঙ্গদেশে মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রাদুর্ভাব হয়। কারণ, তিব্বতীয় জনশ্রুতি মতে, মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তা নাগার্জুন বঙ্গদেশে এবং ইক্ষুবর্ধন (পুন্ড্র বর্ধন) দেশে অনেকগুলো বিহার তৈরী করেছিলেন। এই জনশ্রুতি ছাড়াও খ্রীষ্টীয় ২য় শতকে রচিত মহাযান সম্প্রদায়ের ‘ললিত বিস্তর’ নামক বুদ্ধের জীবনী গ্রন্থে ‘বঙ্গলিপির’ উল্লেখ থেকে এতদুৎসর্গে মহাযানের অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে হয়। ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রারম্ভের গুণাই ঘরে প্রাপ্ত তাম্র শাসনেও বাংলার দক্ষিণ পূর্ব অঞ্চলে মহাযানের অস্তিত্ব স্পষ্ট প্রমাণিত করে।

৩। প্রঃ বাংলায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের বিবর্তনের স্বরূপ বর্ণনা কর।

উঃ খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী হতে দ্বাদশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত উত্তর পূর্ব ও দক্ষিণ পূর্ব ভারত বিশেষতঃ বঙ্গদেশে মহাযান হতে বজ্রযান, সহজযান, প্রভৃতি বহুবিধ যান বা মতবাদের সৃষ্টি হয়। সঙ্গে সঙ্গে দেশের তান্ত্রিক সাধনা ও এগুলোর সাথে যুক্ত হয়ে পড়ে। তদানীন্তন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নালন্দা, (বর্তমান বিহার প্রদেশে); সোমপুরী ভাসু বিহার জগদ্ধাল (রাজশাহী পাহাড়পুর ও মহাস্থান গড়ে) বিক্রমপুরী মহা বিহার (ঢাকার বিক্রমপুরে); শালবন (ময়নামতি কুমিল্লা); এবং চট্টগ্রামের পন্ডিত বিহার (আনোয়ার ঝিয়রীতে) প্রভৃতি বিশ্ববিদ্যালয় সমূহ জটিল দর্শন ছেড়ে সহজ তন্ত্র ধর্মের চর্চা শুরু করে দেয়।

বৌদ্ধ পাল রাজাদের দীর্ঘ ৪ শত বৎসর বাংলা ও বিহারে রাজত্ব কালে তাঁদেরই সহায়তায় এই তন্ত্র ধর্ম তিব্বত, নেপাল, শ্যাম (থাইল্যান্ড), কম্বোডিয়া, ব্রহ্ম সিং-হল প্রভৃতি প্রতিবেশী দেশ সমূহে ছড়িয়ে পড়ে। এ সময়ে ভারতে তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের প্রখ্যাত আচার্যরূপে চুরাশী সিদ্ধার আবির্ভাব ঘটে। তাঁদের বেশীর ভাগ ছিলেন বাঙ্গালী। এই বাঙ্গালী সিদ্ধাদের মাধ্যমেই বঙ্গ লেখ্য ভাষার আদি পুস্তক ‘চর্যাপদ’ বা বৌদ্ধ দোহাবলী রচিত হয়।

পাল রাজাদের পর উগ্র ব্রাহ্মণ্যবাদের পৃষ্ঠপোষক সেন রাজাদের দ্বারা বাংলায় প্রথমে বৌদ্ধ ধর্ম ও হিন্দু ধর্মের সমন্বয় চেষ্টা শুরু হয়। ফলে বহু বৌদ্ধ তীর্থ হিন্দু তীর্থে পর্যবসিত হয় এবং বৌদ্ধদের বহু পূজা পার্বন হিন্দুদের লৌকিক পূজার অন্তর্গত হয়ে পড়ে। যেমন-রথযাত্রা, মগধেশ্বরী পূজা, মাভবানী বা কালী পূজা, ধর্ম ঠাকুর পূজা, শীতলা পূজা প্রভৃতি। শুধু তাই নহে হিন্দু তন্ত্র ও বৌদ্ধ মন্ত্রের সংমিশ্রণে ‘ধর্ম’ নামক বিষয়টা এ সময়ে সারা ভারত বর্ষে কিরূপ শোচনীয় পরিণতি ডেকে আনে তা ‘ভবতরঙ্গিনী’ নামক পুস্তকের ১৪ পৃষ্ঠায় পাওয়া যায়—

“সুরাপান অত্যাচার, প্রাণীহত্যা ব্যভিচার
তন্ত্র ধর্মে ভারত ব্যাপীল।
যক্ষ, রক্ষ, বিষহরি নানা উপহার করি
জীব সকল পূজিতে লাগিল।”

বাংলার এই তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মই ত্রয়োদশ শতকের প্রারম্ভে ইসলামের অভিযানে বিধ্বস্ত হতে থাকে। আর তান্ত্রিক অনাচার সেই ধ্বংসকে ত্বরান্বিত করে।

৪। প্রঃ বাংলার বিশিষ্ট বৌদ্ধ রাজা, ও তাঁদের সমকালীন বিখ্যাত বৌদ্ধ পন্ডিতগণ রচিত ধর্ম গ্রন্থ সমূহের এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো উল্লেখ কর।

উঃ বাংলার স্বর্ণ যুগ আনায়নকারী, বাঙ্গালী জাতির প্রতিষ্ঠাতা এবং বঙ্গ-ভাষা ও ইতিহাসের জন্মদাতা হলেন বাংলার বৌদ্ধ পাল রাজাগণ। বঙ্গ সন্তানের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত এই রাজ বংশের রাজত্ব কাল ছিল খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দী হতে অষ্টম শতাব্দী পর্যন্ত দীর্ঘ চারশত বছর।

পাল পূর্ব যুগ

পাল বংশের প্রতিষ্ঠা পূর্বে ও গুপ্তবংশীয়দের দীর্ঘ শাসনে বাংলাদেশে বৌদ্ধ শিক্ষার্থী ও উপাধ্যায়গণের জন্যে যে বহু বিহার ও সংঘারামের সৃষ্টি হয়েছিল তার উল্লেখ বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হুয়েন সাং এর ভ্রমণ বৃত্তান্তে পাওয়া যায়। ৫০৭ খ্রীষ্টাব্দে গুপ্ত বংশীয় রাজা বৈশ্যমিত্তের এক সামন্ত রাজা মহারাজ রুদ্রদত্ত কর্তৃক তাম্রলিপ্তে ‘আশ্রম বিহার’ নামে একাবিশিষ্ট বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন আচার্য শান্তিদেব। পরে এই বিহার হতেই তিনি নালন্দা মহা বিহারে প্রস্থান করেন। আচার্য শান্তি দেবের রচিত বিশিষ্ট গ্রন্থের মধ্যে ‘বোধিচর্যাবতার’ ও ‘শিক্ষা সমুচ্চয়’ প্রধান। ৬৩৯ খ্রীঃ সম্রাট হর্ষবর্ধনের রাজত্বে হুয়েন সাং যখন মগধ হতে বাংলায় আগমন করেন তখন তিনি বাংলায় সমতট, কর্ণসুবর্ণ, পুন্ড্রবর্ধন ও তাম্রলিপ্ত এই চারটি অঞ্চলে ৭০টির ও অধিক বৃহৎ সংঘারাম দেখেছিলেন। এগুলোর মধ্যে অবস্থানকারী মোট ভিক্ষু সংখ্যা ছিল ৮ হাজার। এদের অধিকাংশই ছিলেন হীনযান মতবাদী। ৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে চৈনিক পরিব্রাজক ইৎসিংএর মতে বাংলার ভিক্ষুরা বিনয়ের নীতি অত্যন্ত কঠোর ভাবে মান্য করতেন। হুয়েন সাং এবং ইৎসিংএর এই সময় কালের বর্ণনায় বাংলার বিশিষ্ট বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল পুন্ড্রবর্ধনের ভাসু বিহার (বগুড়া) কর্ণসুবর্ণের ‘রক্তভিক্তি বিহার, এবং তাম্র লিপ্তের’ ভারাহা সংঘারাম।

সম্রাট হর্ষের যুগে

বাংলার অমূল্য রত্ন শীলভদ্র ও আচার্য চন্দ্রগোমীর আবির্ভাব হয় সম্রাট হর্ষবর্ধনের যুগেই। আচার্য শীলভদ্রের জন্ম হয়েছিল সমতটের ব্রাহ্মণ রাজ বংশে। বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হওয়ার পূর্বে তিনি হেতু বিদ্যা, শব্দ বিদ্যা, চিকিৎসা বিদ্যা, অর্থববেদ, সাংখ্য প্রভৃতি শাস্ত্রে অগাধ পাণ্ডিত্য অর্জন করেছিলেন। এ সময়ে নালন্দার অধ্যক্ষ ছিলেন ধর্মপাল। ধর্মপালের পরেই তিনি নালন্দা মহা বিহারে অধ্যক্ষ হন। বিশ্ব বিখ্যাত চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাং ৬৩৭ খ্রীঃ মহা পণ্ডিত সদ্ধর্ম নিধি শীলভদ্রের পদতলে বসেই নালন্দায় পাঁচ বৎসর কাল বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করেছিলেন। এ সময়ে নালন্দার গৌরব খ্যাতির সর্বোচ্চ শিখরে। পণ্ডিত শীলভদ্রের রচনার মধ্যে তিব্বতীয় রেঙ্গুনে ‘আর্য ভূমি ব্যাখ্যান’ একখানি গ্রন্থের অনুবাদই মাত্র রক্ষিত আছে। কিন্তু তাঁর গ্রন্থাবলীর ভেতর সৌতান্ত্রিকদের অভিধর্মের বিভাষা-শাস্ত্র ও যে অন্তর্ভুক্ত ছিল, এ কথা হুয়েন সাং স্পষ্ট উল্লেখ করে গেছেন। মহা পণ্ডিত শীলভদ্রের এক ভ্রাতুষ্পুত্রও বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। নাম বোধিভদ্র। তিনিও সূত্র, ন্যায় শাস্ত্রে বিচক্ষণ পণ্ডিত ছিলেন। হিউয়েন সাং এর সাক্ষাতের সময় তার বয়স ছিল সত্তুরের কাছাকাছি। খুল্লতাতে বয়সটা না জানি তখন কত। প্রাচীন বাংলার কীর্তিধ্বজ মহা পণ্ডিত চন্দ্রগোমী। আজ দেশ বিদেশ এই প্রাচীন বাংলার যে সব কীর্তিমানদের গৌরব গাথায় আমাদের বক্ষস্থিত হওয়া দরকার তাঁদের মধ্যে চন্দ্রগোমী অন্যতম। তিনি একাধারে ছিলেন বৈয়াকরণিক, কবি নাট্যকার নৈয়ায়িক এবং বৌদ্ধতন্ত্রের বিশিষ্ট উপদেষ্টা ও লেখক। এ ছাড়াও জ্যোতিষ বিজ্ঞান, সঙ্গীত, নানা সুকুমার কলা, আয়ুর্বেদ প্রভৃতিতে ও তিনি ছিলেন পারদর্শী। এক জীবনে এতগুলো বিষয়ে পারদর্শীতা অর্জন সত্যিই বিরল দৃষ্টান্ত। তাঁর রচিত প্রসিদ্ধ গ্রন্থ ‘চন্দ্র ব্যাকরণ’ পাণিনীয় কীর্তির সমতুল্য শুধু নয়, অনেকাংশে শ্রেষ্ঠত্বের দাবীদার ও বটে। এই ব্যাকরণ সমগ্র ভারত, তিব্বত এবং সিংহলে পাণিনীর সমপর্যায়ে দীর্ঘকাল সমাদৃত ছিল। তিব্বতের তেঙ্গুরে চন্দ্র গোমীর-‘আর্যতার দেবী স্তোত্র’ ‘মুক্তিকামালা’, ‘শিষ্য লেখ’ নামক ধর্মকাব্য, ‘লোকানন্দ নামক পঞ্চাঙ্ক নাটক, ‘মনোহর কল্প’ এবং লোকনাথ নামক লোকনাথ স্তোত্র প্রভৃতি বহু গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়।

এই মহাপুরুষের বাড়ী ছিল উত্তর বঙ্গের বরেন্দ্র ভূমিতে। সপ্তম শতাব্দীর মধ্যভাগে চন্দ্ররাজ বংশে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন। বৌদ্ধাচার্য স্থির মতির নিকট সূত্র ও অভিধর্ম অধ্যয়নের পর নৈয়ায়িক বিদ্যাধরাচার্য কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মে তিনি দীক্ষিত হন। দীক্ষার পরেও গৃহে থাকতেন বলে 'গামীন' বলা হত। তাঁর পূর্ব নাম ছিল অমর চন্দ্র। ঠিক এমনি একজন গামী উপাধি ধারী বাঙ্গালী বৌদ্ধাচার্য নবম শতাব্দীতে রাষ্ট্র কূটরাজ প্রথম অমোঘ বর্ষের রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রে গিয়েছিলেন বলে- কান্-হেরীতে আবিষ্কৃত একখানি শিলালিপিতে উল্লেখ আছে।

পাল যুগে:

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম গোপাল দেব (অনুমানিক ৭৫০খ্রী:) বাংলার বুকে যে রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করলেন, খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে মদন পালের রাজত্বে (আনুমানিক ১১৪০ খ্রী:) সেই রাজ বংশের পতন ঘটে। দীর্ঘ চারশত বছরের এই রাজত্বে একদিকে প্রবল পরাক্রমতা, অপরদিকে আভ্যন্তরীণ শাসন তন্ত্রের সুব্যবস্থা ও উদার নীতির কল্যাণে একই বংশের সতের জন নৃপতির রাজত্ব ভারত বর্ষে এক বিরল দৃষ্টান্ত।

পাল বংশের প্রথম রাজা গোপাল দেব:

বাংলার বুকে এই বৌদ্ধ পাল রাজ বংশের প্রতিষ্ঠাতা হলেন প্রথম গোপাল দেবী তিনি সদ্ধর্ম ও সদ্ধর্মীগণের হিতার্থে মগধের সুপ্রসিদ্ধ ওদন্তপুরী মহা বিহার নির্মাণ করিয়ে দিয়েছিলেন। এই বিহারের আদর্শেই তিব্বতের বিখ্যাত সাম্ম্যে মহাবিহার নির্মিত হয়েছিল।

দ্বিতীয় রাজা ধর্মপাল

খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গোপাল দেবের পুত্র ধর্মপাল (৭৭৮ খ্রী:) রূপকথার দিগ্বজয়ীর মতো প্রসিদ্ধ কীর্তি মান ছিলেন। তিনি হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের সমভাবে উন্নতি বিধানে যত্নশীল ছিলেন। তাঁর শাসনকালে বাংলার বৌদ্ধ সাহিত্য যেমন পরিপুষ্ট লাভ করে তেমনি রাজশাহীর পাহাড়পুরের সোমপুরী মহা বিহার এবং মগধের বিক্রমশীলা মহা বিহার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করে।

তৃতীয় রাজা দেবপাল

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল (৮৫১খ্রী:) পিতার তুল্যই দিগ্বিজয়ী কীর্তিমান ও খ্যাতিমান ছিলেন। তাঁর শাসনকালে বিক্রমশীলা ও সোমপুরী বিহার পূর্ণাঙ্গ মর্যাদা লাভ করে। ধর্মপাল ও দেবপালের সময়েই জাভা ও সুমাত্রার নরপতিগণের সাথে বাংলার নৃপতিদের এক গভীর হৃদয়তা স্থপিত হয়। তার উল্লেখ কলসনের নিকটবর্তী কেলুর নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন শিলালিপিতে উল্লেখিত আছে।

প্রথম মহীপাল ও পুত্র নয়পাল

দেবপালের পর অনুক্রমে আরো পাঁচজন রাজা পুরুষানুক্রমে প্রায় একশত চল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। কিন্তু তাঁরা অপেক্ষাকৃত দুর্বল। ৯৯০ খ্রীঃ হতে ১০৫৫ খ্রীঃ পর্যন্ত প্রথম মহীপাল এবং তাঁর পুত্র নয়পালের রাজত্বে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস আবার নব যুগের সূচনা করে। এদেরই আগ্রহে ও যত্নে বিক্রমশীলা ও সোমপুরী মহাবিহার যশের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করে।

সোমপুরী বাংলার বিক্রমশীলা

একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে যে বিক্রমশীলা মহাবিহার নালন্দার শতাব্দীর পর শতাব্দীর পুঞ্জিভূত খ্যাতিকে ও অতিক্রম করেছিল সেই বিক্রমশীলের সমপর্যায়ে গণ্য করা যায় বাংলার সোমপুরী বিহারকে। সোমপুরী বাংলার বিক্রমশীলা। এই বিশ্ববিদ্যালয়েই অবস্থান করতেন আচার্যবোধি ভদ্রের মতো মহাপণ্ডিত, বাংলার বিদ্বজ্জন সমাজের মুকুটমণি অতীশ দীপঙ্কর এবং ভাব-বিবেকের মাধ্যমিক রত্ন প্রদীপের মতো মূল্যবান গ্রন্থ প্রণেতা করুণাশ্রী মিত্রাদি মহাযতিগণ। (বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ২১১ পৃঃ) আচার্য রত্নাকর শান্তির আবির্ভাবও এই যুগেই।

বাংলার সূর্য অতীশ দীপঙ্কর

বাংলার গৌরব সূর্য অতীশ দীপঙ্করের জন্ম ৯৮০ খ্রীস্টাব্দে। বজ্রাসনের পূর্বে বাংলার বিক্রম মনিপুরে গৌড়ের রাজবংশে এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষের জন্ম। বাল্য নাম চন্দ্রগর্ভ। পিতার নাম মহারাজ কল্যাণশ্রী। মাতার নাম রাণী প্রভাবতী। তাঁর বাল্য গুরু ছিলেন জেতারী নামে উত্তর বঙ্গের এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিত। অতীশ ২৫ বৎসর বয়সে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভের জন্যে কৃষ্ণগিরি বিহারাধ্যক্ষ রাহুল গুপ্তের নিকট তান্ত্রিক দীক্ষা নিলে নাম রাখা হয় গুহ্য জ্ঞান বজ্র। ২৯ বছর বয়স কালে তিনি গমন। করলেন ওদন্তপুরী মহাবিহারে। সেখানে মহাচার্য শীলরক্ষিতের নিকট প্রব্রজা গ্রহণ করলে নাম রাখা হয়, দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ৩১ বছর বয়স কাল পর্যন্ত সেখানে অধ্যয়ন করলেন মহাপণ্ডিত ধর্মরক্ষিতের নিকট ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে। তারপর সেখান থেকে যাত্রা করলেন সুবর্ণ দ্বীপের চন্দ্রকীর্তির নিকটে (বর্তমান বার্মার পেগু প্রদেশে থাটোন নামক স্থানে)। ১২ বছর সেখানে অধ্যয়ন করে জন্মভূমিতে ফেরার পথে সিংহলে গমন করেন। জ্ঞানান্বেষণে সিংহলে কিছুদিন অবস্থানের পর মগধে আসলেন। এখানে বসেও তিনি রত্নাকর শান্তি, নাড়পাদ কুশল ও অদ্বয় বজ্র প্রভৃতি তন্ত্রাচার্যের নিকট প্রভূত তন্ত্র শিক্ষা লাভ করলেন। জ্ঞানান্বেষণের এই দীর্ঘ পথ অতিক্রমের পর তিনি মগধের বৌদ্ধগণ কর্তৃক ভারতের শ্রেষ্ঠ পাণ্ডিত্যের সম্মান

স্বরূপ 'ধর্মপাল' উপাধি লাভ করলেন। ১০২৬ খ্রীস্টাব্দে পাল বংশীয় নরপতি প্রথম মহীপালের আমন্ত্রণে তিনি বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রধানাচার্য পদ গ্রহণ করেন। সে সময়ে তিনি 'রত্নকরভোদ্যট' নামক মধ্যম- কোপদেশ নামক পুস্তক রচনা করেন। এরপরে কিছুকাল সোমপুরী মহাবিহারে ও অবস্থান করেন। সোমপুরী মহাবিহারে অবস্থান কালেই তৎকালীন তিব্বতের রাজা লা-মা জে-সে হোডের আমন্ত্রণ লাভ করেন। এবারের আমন্ত্রণে তিনি তিব্বতে না গেলেও পরবর্তী তিব্বতের রাজা চানচুধ কর্তৃক প্রেরিত দূত নাগছোর মুখে তিব্বতের বৌদ্ধ ধর্মের শোচনীয় পরিণতির কথা শুনে ১০৪২ খ্রীঃ নয়পালের রাজত্বকালে তিব্বতের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। পথে নেপালে ১ বছর অবস্থান করে সমথ বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। এরপর তিব্বতের গুজে প্রদেশে ২ বছর অবস্থান কালে তথাকার নিরাভোগ মহাবিহারে 'লোকাতিত সপ্তাঙ্গ বিধি' নামক পুস্তক রচনা করেন। মধ্য তিব্বতে উ. এবং সা প্রদেশে কিছুকাল অবস্থানের পর 'ময়ে বিহারে গমন করেন। এরপর 'নৈৎথঙ্গ এ অবস্থান কালে লা-মা-দি অঞ্চলে কয়েকবার গেলেও বাকী জীবন সেখানেই অবস্থান করেন এবং ১০৫৩ খ্রীঃ ৭৩ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন। এই সময় কালের মধ্যে অতীশ দীপঙ্কর শুধু কালচক্রযান ও বজ্রযানের উপর অসংখ্য গ্রন্থ ও টিকা-টিপ্পনীই রচনা করেননি তিনি চিকিৎসা শাস্ত্রে, কৃষি বিজ্ঞানে এবং সামাজিক ন্যায় নীতি শৃঙ্খলা বিধানে ও তিব্বতে অনেক অবদান রেখে গেছেন। মোটামুটি বলতে গেলে অতীশ সমগ্র তিব্বতের ধর্ম, সমাজ ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক নব জীবন দান করেছিলেন। তাই তিব্বতের মানুষ অতীশ দীপঙ্করকে বোধিসত্ত্ব জ্ঞানে এখনও পূজা করেন।

প্রথম মহীপাল ও নয়পালের কৃতিত্ব :

সম্রাট কনিষ্কের আমলে ভারতের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের গান্ধারে যে গ্রীক বৌদ্ধ ভাস্কর্য শিল্পের উদ্ভব হয়েছিল বহু শতাব্দী পর বাংলার বুকে তাঁকে গোড়ীয় শিল্পরূপ দান করল প্রথম মহীপাল এবং তাঁর পুত্র নয়পালের অফুরন্ত উৎসাহ বাংলার বুকে বহু বৌদ্ধ দেব-দেবীর অনবদ্য বিগ্রহ এই যুগেরই শিল্প সাধনার নিদর্শন। এই যুগেই (১০২৬ খ্রীঃ) বরেন্দ্র হতে (উত্তরবঙ্গ) এক বাঙ্গালী শ্রমণ অনেক বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থ সহ চীনে গিয়ে চীনা ভাষায় তার অনুবাদ করেছিলেন।

তৃতীয় বিগ্রহ পাল ও তাঁর পুত্রগণ রামপাল :

নয়পালের পর তাঁর পুত্র তৃতীয় বিগ্রহ পাল রাজত্ব করেন। এর পর ক্রমান্বয়ে রাজত্ব করেন বিগ্রহ পালের তিন পুত্র-দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় গুরপাল এবং রামপাল। তাঁদের মধ্যে রামপালই ছিলেন প্রতাপশালী। তিনি অনবরত নানা বিদ্রোহ দমনে নিয়োজিত থেকেও বৌদ্ধ ধর্মের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে মনযোগী ছিলেন।

প্রশাসনিক সুবিধার্থে গঙ্গা ও করতোয়ার সঙ্গম স্থলে রমাবতীতে নতুন রাজধানী এবং তারই পাশে বিখ্যাত জগদ্দাল মহাবিহারের সাথে বিখ্যাত মনীষি অভয়াকর গুপ্ত, মোক্ষাকর গুপ্ত, শুভাকর গুপ্ত, ধর্মকর প্রভৃতির গৌরব গাথা ও বিজড়িত।

বাংলার অন্যান্য রাজা ও রাজবংশ :

খ্রীস্টীয় অষ্টম হতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে পাল বংশ ছাড়াও আরো দু একটি বৌদ্ধ রাজবংশ পূর্ব বঙ্গে রাজত্ব করেন। তাঁদের মধ্যে খড়্গবংশ, ও চন্দ্রবংশ (১০ম শতাব্দীর শেষার্ধ্বে) উল্লেখযোগ্য। খ্রীঃ ৯৫০ অব্দে কান্তি দেব নামে একজন প্রতাপশালী বৌদ্ধ রাজার ও কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। আর সেই সমুদয় বৌদ্ধ রাজন্যবর্গের পৃষ্ঠপোষকতায় নদীয়া জেলার কৃষ্ণ নগরস্থ প্রসিদ্ধ ‘সুবর্ণ বিহারস্তুপ’ পট্টিকেরার রাজা কর্তৃক কুমিল্লার ময়নামতীর শালবন মহাবিহার ও কনকস্তুপ মহাবিহার, চট্টগ্রামের বিখ্যাত পণ্ডিত বিহার ঢাকার বিক্রমপুরস্থ বিক্রমপুরী মহাবিহারাদি বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানাদি গড়ে উঠে।

কনকস্তুপ ও পণ্ডিত বিহার :

কনকস্তুপ বিহারে বসে বিনয়শ্রী নামক কাশ্মীরীয় ভিক্ষু (নাড়পাদ)- ‘বজ্রপাদ সার সংগ্রহ’ নামে একখানি পুস্তক রচনা করেছিলেন। একাদশ শতাব্দীর বৌদ্ধ তন্ত্র ও বৌদ্ধ সংস্কৃতির পীঠভূমি চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহার (বর্তমান আনোয়ারা স্থানার মিয়রীরে) প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য তিলোপা বা প্রজ্ঞাভদ্রের সাধনতীর্থ ছিল। তাঁরই প্রধান শিষ্য ছিলেন সেই কাশ্মীরীয় ভিক্ষু নাড়পাদ। তখন তিনি যশোভদ্র নামে পরিচিত ছিলেন। তাঁর গুরু প্রজ্ঞাভদ্র বা তিলোপা পণ্ডিত বিহারের অধ্যক্ষ থাকা কালে বজ্রযান ও সহজ যানের উপর বহু গ্রন্থ এবং একখানি দোহা কোষ ও রচনা করেন। এছাড়াও বাংলা ভাষার আদি স্রষ্টা সেই চর্যা কর্তাদের মধ্যে লুইপাদ, অনঙ্গবজ্র, সবরিপাদ, অবধূতপাদ কাহ্নপাদ, জ্ঞানবজ্র, অমোঘনাথ ও ধর্মশ্রী মৈত্রেয়াদীর স্মৃতি ও এই পণ্ডিত বিহারের সাথে বিজড়িত।

বাংলার অন্যান্য বিহার :

সেকালের চৈতন্যগ্রাম, আজকের চট্টগ্রামে পণ্ডিত বিহার ছাড়াও চক্রশালা মহাবিহার (পটিয়া) এবং রম্য বতী মহাবিহার (রামুর) রাংকুট এই মহাবিহার সমূহ ও তৎকালে কম গুরুত্বপূর্ণ ছিল না।

ঢাকার বিক্রমপুরী মহা বিহার ৪

ধর্মপালের সময়কার ঢাকা জেলার বিক্রমপুরস্থ বিক্রমপুরী মহাবিহার অতীশ দীপঙ্করের জন্ম স্মৃতির সাথে বিজড়িত। এই বিহারে বসেই ‘অবধূতাচার্য’ উপাধিধারী কুমার চন্দ্রের লিখিত তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মের টিকাখানি লীলা বজ্রী নাম্নী সাধিকার সাহায্যে তিব্বতী ভাষায় অনুদিত হয়েছিল।

৫। প্রশ্নঃ পাল যুগের অবসানে বাংলার শাসন ভার কাদের হাতে আসে? এবং এর পরবর্তী বৌদ্ধ ধর্মের অবস্থা কিরূপ হয়েছিল?

উঃ এক কথায় বলতে গেলে সমস্ত পাল রাজারাই ছিলেন ধর্মের ক্ষেত্রে উদার পন্থী অধিকন্তু হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের সমন্বয় বাদী। তাঁদের এই মনোভাব রাজ্য শাসনের স্থায়িত্বকে দীর্ঘায়ি এবং করেছে বটে, কিন্তু মহাযানের খেয়াল খুশী নীতি অসংখ্য দেবদেবী সৃষ্টিতে এবং বজ্রযানের গুহ্য মার্গের ন্যায় পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত হওয়ার যথেষ্ট ইন্ধন ও পালরাজাদের এই উদার পন্থা হতে লাভ করেছে বাংলার বৌদ্ধ ধর্ম। বৌদ্ধ ধর্মে অসংখ্য দেব-দেবীর আমদানীর পরিণামে বাংলা ভারতের বৌদ্ধগণের এক বিরাট অংশ পরবর্তী কালে সামান্য প্রচেষ্টায় ব্রাহ্মণদের কুক্ষিগত হয়ে তাদের সংখ্যা বাড়ালো। গুহ্যপন্থী তান্ত্রিকেরা সংখ্যায় ছিল খুব কম। তারা নিজেদেরকে সর্বদা ভীতি মিশ্রিত রহস্যময় করে রাখতে চাইতেন লোক সমাজকে আকৃষ্ট করতে। মাঝে মধ্যে তাদের অলৌকিক ক্রিয়া কাণ্ড জনগণের মধ্যে কিছুটা প্রভাব বিস্তার করলেও একটা বিশাল জাতীকে স্বধর্মে ধরে রাখার জন্যে যে আদর্শ চরিত্র শক্তির প্রয়োজন ছিল, তা এই সম্প্রদায়ের নিকট থেকে আশাকরা ছিল অকল্পনীয়। এই দুই শ্রেণীর বাইরে সংখ্যায় স্ববসা হলেও কিছু বৌদ্ধ ভিক্ষু ও গৃহী ছিলেন যাদের মধ্যে বুদ্ধের নৈর্বাণিক দৃষ্টি ও নীতি আদর্শের ক্ষীণ দীপ শিখা তখনো অবশিষ্ট ছিল। তাঁরাই ছিলেন সংঘরাজ সারমেধ প্রমুখগণ।

বৌদ্ধ পাল যুগের অবসানে, বাংলার শাসন কিছুদিনের জন্যে আংশিকভাবে বৌদ্ধ রাজা চন্দ্রবংশের হাতে ছিল। চন্দ্রবংশের সমকালে পূর্ববঙ্গে শাসনভার হস্তগত করে বৈষ্ণবপন্থী বর্মবংশ। সেই বংশের রাজাধিরাজ ভোজবর্মার বেলাব লিপিতে পঞ্চম শ্লোকে বেদ বহির্ভূত বৌদ্ধগণকে ‘নগ্ন’ বলে কটাক্ষ করা হয়েছে। এর পরবর্তী রাজা হরিবর্মার প্রখ্যাত সচিব ভবদেব ভট্টকে ‘পাষণ্ডি-বৈতণ্ডিক-প্রজ্ঞা-খণ্ডন-পণ্ডিত’ অর্থাৎ পাষণ্ডি বৌদ্ধমত খণ্ডকে দক্ষ বলে তাঁর প্রশংসা করা হয়েছে, তাঁরই সুপ্রসিদ্ধ প্রশস্তির ২০ নং শ্লোকে। এখানেই শেষ নহে সমগ্র বাংলার শাসনভার যখন ঘোর ব্রাহ্মণ্য পন্থী সেন রাজ বংশের হস্তগত হল সেই বংশেরই প্রসিদ্ধ প্রতাপশালী রাজা বল্লাল সেনের অন্তরে বৌদ্ধ বিদ্বেষ যে যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল এর সুস্পষ্ট সাক্ষ্য রয়েছে তাঁর প্রচারিত ‘দান সাগর’ গ্রন্থের শেষ

নিবন্ধ, এই শ্লোকটিতে- “কলিযুগে বল্লাল সেন নামা প্রত্যক্ষ নারায়ণের আবির্ভাব হয়েছে ধর্মের অভ্যুদয়ের জন্যে, তথা নাস্তিক দিগের (বৌদ্ধ দিগের) পদোচ্ছেদের জন্য।” বল্লাল সেনের এমন একটি নিষ্ঠুর প্রকৃতির প্রতি লক্ষ্য করেই বিশিষ্ট ঐতিহাসিক নলিনী নাথ দাসগুপ্ত বলেছেন- “পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ও অসহিষ্ণুতায় তিনি শুধু নিজের রাজ সিংহাসনকেই অপমান করেন নি বাংলার অন্তরাত্মাকে ও যেন বহুধা বিভক্ত করেছিলেন।” (বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ২২১ পৃঃ)। বল্লাল সেনের এমন নিষ্ঠুরতা কুমারিল ভট্ট প্ররোচিত উজ্জয়নীর রাজা সুধম্মার সেই নিষ্ঠুরতাকেই স্মরণ করিয়ে দেয়-

আসেতোরাভূষারাদ্রে বৌদ্ধানাং বৃদ্ধবালকান্।

যো ন হান্তি সে হন্তব্যো ভৃত্যানিত্যম্শান্নপঃ।

অর্থাৎ, রামেশ্বর সেতুবন্ধ হতে হিমালয় পর্যন্ত বৃদ্ধ হোক, বালক হোক, বৌদ্ধ দেখিলেই সংহার করতে হবে। যে হত্যা করবে না সে জনই হত্যার যোগ্য কৃতদাসের ন্যায় বিচার্য হবে। মোটামুটি রাজ শক্তি হারা বাংলা-ভারতের বৌদ্ধগণ যেন, বর্ম বা অন্যান্য অনেক ব্রাহ্মণ্যবাদী রাজা মহারাজাদের রাজত্বে অপমান, ঘৃণা, বিদ্বেষ, সংহার ও অত্যাচারের মধ্যে তিলে তিলে ক্ষয়ে ক্ষয়ে ভারতে ইসলামের আগমন না হওয়া পর্যন্ত দীর্ঘ দুইশত বৎসর কাল হরণ করে। এই সময়কালের মধ্যে পর ধর্ম বিদ্বেষের জ্বালা হতে নিস্তারের জন্যে বাংলা-ভারতের বৌদ্ধদের এক বিরাট অংশ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়। এর পরেও নিন্দা অপমান সংহারকে শিরোধার্য করে যাঁরা অবশিষ্ট থাকল, তাদের উপর ১২শ, ১৩শ শতাব্দীতে বর্ষিত হল এক হাতে কোরান, এক হাতে তরবারি নিয়ে ‘ইসলাম’। সে সময়ে হয় স্বেচ্ছায়, নয় প্রাণের বিনিময়ে যে কোন একটিতে এদেশের বৌদ্ধরা ইসলামের গর্ভে বিলীন হল। তাই ১৩শ শতাব্দীর হিন্দু নির্যাতিত প্রচলন বৌদ্ধ কবি রামাই পণ্ডিত তাঁর শূন্য পুরানের ভণিতায় যদি এদেশে ইসলামের আগমনকে ‘ধর্মের গাজনে ভাই যখন আইল’-বলে অভিনন্দিত করে, তাতে অতিরঞ্জিত কি?

৬। প্রঃ বাংলায় মুসলিম আক্রমণ ও তাদের রাজত্বে বৌদ্ধদের পরিণতি বর্ণনা কর।

উঃ ব্রাহ্মণ্যবাদী সেন রাজা বা বৈষ্ণবপন্থী বর্মণদের মধ্যে সকলেই ঘোর বৌদ্ধ বিদ্বেষী ছিলেন এমন নহে। তাই ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসনের অবসানের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা-ভারতের বিশেষতঃ বাংলার ও বর্তমান পাকিস্তানের বহু অঞ্চল বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। আজ আমরা ভারত উপমহাদেশের যে সমস্ত অঞ্চলে মুসলিম প্রাধান্য দেখতে পাই তার সবই সেকালে ছিল বৌদ্ধ প্রধান। ব্রাহ্মণ্যবাদের অসি-মসির সমন্বিত আক্রমণের মুখে বৌদ্ধরা সংখ্যায় ক্ষীণ হতে থাকলেও নালন্দা বিক্রমশীলা তক্ষশীলা, ওদন্তপুরী, জগদাল, সোমপুরী আদি বৃহৎ বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান গুলো তখনও ধুলিস্যাৎ হয়ে যায়নি।

কিন্তু যেদিন সম্পূর্ণ অসি শক্তিতে আস্থাশীল মুসলিম শক্তি, এক হাতে অসি ও অপর হাতে ইসলাম নিয়ে এদেশে আবির্ভূত হলেন, তখন কিভাবে মগধের প্রাকার ও পরিখা বেষ্টিত, দুর্গোপম ওদন্তপুরী বিহার, দেখতে দেখতে বিজয়োন্মত্ত বিদেশী মুসলমানের হাতে বিলীন হয়ে গেল; কিভাবে অভ্যন্তরস্থ হাজার হাজার ভিক্ষু সংঘ ক্ষীণতম প্রতিরোধের চেষ্টার পর, দলে দলে অসি মুখে প্রাণত্যাগ করলেন; কিভাবে এসব প্রতিষ্ঠানে মহাজ্ঞানী বৌদ্ধ ভিক্ষু শ্রামণগণের ফোঁটায় ফোঁটায় শরীরের রক্ত জল করে লেখা সংরক্ষিত পুঁথিগুলো পদদলিত ছিন্ন বিছিন্ন ও পরিশেষে রাক্ষসী অগ্নিশিখার উন্মত্ত নৃত্যে ভষ্মস্তুপে পরিণত হল; একথা আজ আর কারো অজানা নয়। ওদন্তপুরীর পর নালন্দা বিক্রমশীলাদি একে একে সব মহাবিহারই একই ভাগ্যলিপির যখন শিকার হতে লাগল তখন এই বার্তা শুনে বাংলার সোমপুরী, জগদাল শালবন প্রভৃতির ভিক্ষু শ্রামণেরা কি করলেন? পৃষ্ঠ ঝুলিতে খান কয়েক অত্যাবশ্যক পুঁথি লঘু হস্তে ভরে, আত্মরক্ষার্থে যে যে দিকে পারলেন পালিয়ে গেলেন এ ভিন্ন অন্যকোন গত্যান্তরও ছিলনা। কোন কোন ভিক্ষু গেলেন উত্তরে নেপাল তথা তিব্বতে, কেহ কেহ গেলেন দক্ষিণে চট্টগ্রাম ও আরকান তথা ব্রহ্মদেশে। বাংলার শ্রামণহীন বিহারগুলো ভূমিসাৎ হওয়ার পূর্বেই ভূতের বাড়ীর মতো খাঁ খাঁ করতে লাগল, সেই সাথে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও ফলে সম্পূর্ণ বিহার নির্ভর বৌদ্ধরাও মস্তকহীন দেহের ন্যায় আশ্রয়হীন হয়ে গেল। অপর দিকে রাজশক্তিকে সম্পূর্ণ কজাগত করে মুসলমানদের আক্রমণ ক্রমে মন্দির ছেড়ে গৃহস্থের উপর, ধন ছেড়ে ধর্ম বিজয়ে যখন মোড় নিল তখন অসহায় বৌদ্ধদের সেই রাজকীয় ধর্ম গ্রহণ না করে, আর অন্যকোন উপায় থাকল না। এভাবেই বৌদ্ধ প্রধান বঙ্গ আজ মুসলিম প্রধান অঞ্চলে পরিণত হল।

বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের বর্তমান যুগ (১৮০০ সাল হতে)

৭। প্রঃ বাংলার বর্তমান বৌদ্ধদের সম্পর্কে কি জান?

উঃ বাংলার বর্তমান বৌদ্ধ বলতে চট্টগ্রাম ও কুমিল্লা অঞ্চলের সমতলীয় এবং বৌদ্ধ পার্বত্য চট্টগ্রামের পাহাড়ী বা উপজাতীয় চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, মুরুং বৌদ্ধ এবং পটুয়াখালী, কক্সবাজার ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আরাকান সম্প্রদায় উদ্ভূত মারমা তথা রাখাইন বৌদ্ধগণকে বুঝায়। এই বৌদ্ধগণের বস্তুতঃ দুইটি ভিন্ন রক্ত ধারায় বিভক্ত। চাকমা তঞ্চঙ্গ্যা ও মুরুং বৌদ্ধদের মধ্যে মঙ্গোলীয় রক্তের প্রভাব ধারা এবং সমতলের বড়ুয়া ও মারমা বৌদ্ধদের মধ্যে আর্যরক্তের প্রভাব বেশী। সামাজিক রীতি নীতি এবং আচার্য ব্যবহারের ক্ষেত্রেও ঠিক একই ভাবে ভাগ করা যায়। কিন্তু দীর্ঘ সহাবস্থান এবং ধর্মীয় নীতি আদর্শের গভীর বন্ধনে এরা

একে অপরকে বহুলাংশে প্রভাবিত করেছে শুধু নয় বহু ক্ষেত্রে দুই রক্তের ধারা একই রেখা ভুক্ত হয়ে গেছে। বাংলার এ সকল অঞ্চলে এই বৌদ্ধদের অস্তিত্ব এখনো টিকে থাকার মূল কারণ এই অঞ্চল সমূহ দীর্ঘকাল অর্থাৎ খ্রীঃ সতের শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী আরকান সম্রাটদের এবং চাকমা রাজাদের অধিকারে ছিল। অন্যদিকে তেরশো শতাব্দীর মুসলিম তরবারীর সেই উন্মত্ততা সতের শতাব্দীতে এই অঞ্চলে পৌঁছতে পৌঁছতে এক প্রকার স্থিমিত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু, ধর্ম বিজয়ের নেশা ছিল তখনো পুরাদমে। সেই বিজয় সমাপ্ত করতে যতটুকু সময়ের প্রয়োজন ছিল ১৭৬৬ খ্রষ্টাব্দে ব্রিটিশ ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানী এই অঞ্চল সমূহ অধিকার করে নেয়ায় তা আর হয়ে উঠল না। তাই এখনো বাংলার বৃকে কিছুমাত্র বৌদ্ধের স্মৃতি চিহ্ন এখনো থেকে গেল।

বাংলার এই বৌদ্ধগণের মধ্যে ইতিহাসের উত্থান পতনে যারা বিশেষ ভাবে আন্দোলিত তারা হলেন চাকমা, বড়ুয়া ও সিংহ বৌদ্ধরা। এদের তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রখ্যাত গবেষক হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর উক্তিটি প্রণিধান যোগ্য। তিনি বলেন- “বাংলার অর্ধেকের বেশী বৌদ্ধ মুসলিম হয়ে গেল, কিছু অংশ ব্রাহ্মণের শরণাগত হল। যত কিঞ্চিৎ অবশিষ্ট বৌদ্ধ আপন পায়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করল তারা নতুন সমাজে অস্পৃশ্য রূপে ব্রাহ্মণ মুসলমান উভয়ের পক্ষ হতে নির্যাতিত হতে থাকল। তারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলে গেল, শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ, ভুলে গেল, দর্শন ভুলে গেল, শীল-বিনয় ভুলে গেল তখন রইল জন কতক মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। (হরপ্রসাদ রচনাবলী, ৪২৪ পৃঃ)

৮। প্রঃ বৌদ্ধ সমাজে ‘রাউলী পুরোহিত’ সম্পর্কে কি জান?

উঃ মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহোদয়ের উল্লেখিত সেই প্রজ্ঞা, উপায়, বোধিসত্ত্ব, শূন্য, বিজ্ঞান, করুণাবাদ বিস্মৃত, শীল-বিনয় বিস্মৃত ভিক্ষু নামধারী মূর্খ বিবাহিত পুরোহিতই বৌদ্ধ সমাজের ‘রাউলী পুরোহিত’ সম্প্রদায়; এমন একটি মন্তব্য তৎকালীন অবস্থা বিচারে অনেকাংশে সত্য। কারণ ইসলামের ধ্বংস যজ্ঞের অবসানে সেদিনের সমাজে অতীতে ভারত বাংলার হাজার বছরের ধর্ম, ইতিহাস, কৃষ্টি সংস্কৃতির সমস্ত নিদর্শনই ভষ্মস্তুপে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। প্রাচীন বাংলা সাহিত্য চর্যাপদ, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের গৌরব বিজয়, প্রাণ সংগনি ও রূপরামের ধর্ম মঙ্গল প্রভৃতি গ্রন্থ, শঙ্করাচার্যের বদরিকাশ্রম প্রভৃতিতে এই ‘রাউল’ শব্দের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। এসবের বর্ণনায় রাউল শব্দটি গৃহস্থ যোগী বলেই প্রমাণিত হয়। যেমন-

ভাল কথা রাউলানী এ বলিলা বচন,
মী নেরে দেখিতে মোর শ্রদ্ধানেত্র মন।

(গোর্থ বিজয়- ৪৬ পৃঃ)

অথবা কবন যোগী কবন রাবল কবন ধান কবন চাবল।

(প্রাণ সংগনি)

এই গৃহস্থী পুরোহিতের অস্তিত্ব আমাদের চাকমা সমাজে এখনো বিদ্যমান। বড়ুয়া সমাজে যধরা রাউলী, থান রাউলী, খুদ্যা রাউলীর গোষ্ঠী বা বংশধর গুলো এবং রাউলীর রাস্তা, রাউলীর পুল হাট, দীঘি, পুকুর, ভিঠা প্রভৃতি তৎকালীন সমাজ এই রাউলী গৃহী বৌদ্ধ পুরোহিত সম্প্রদায়ে স্মৃতি বহন করছে। আরকানী পুংগ্রী, উপাধীধারী আরো কয়েকটি গোষ্ঠী এই সমাজে দৃষ্ট হয়। যেমন- আরিপা পুংগ্রী, আনপ্লা পুংগ্রী, মোরপ্লা পুংগ্রী ও হাসিপা পুংগ্রী, এসকল উপাধি অষ্টাদশ শতাব্দীর চর্যাপদোক্ত তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য হাড়িপা, কানুপা, তিলোপাদের সাথে যেন একই সূত্রে গাঁথা। এই ধর্ম পুরোহিতদের বংশধর চাকমা সমাজের রাউলী বা লুরীরা চাকমা সমাজে প্রচলিত- গাঙ্গ পূজা, থামান পূজা অথবা শ্রাদ্ধ ও বিবাহের মাস্তলিক কর্মে স্বহস্তে পশু হত্যা করেন বা হত্যার বিধান এখনো দিয়ে থাকেন। তেমনি বড়ুয়া সমাজেও এককালে কালীপূজা, দুর্গাপূজা, মনসাপূজা এবং মগধেশ্বরী পূজায় বড়ুয়া রাউলী ঠাকুরের স্ব হস্তে পশু হত্যা করতেন। বিবাহ অনুষ্ঠানাদির নিমন্ত্রণ বাড়ীতে ‘তভাঙ্গা’ বা খাদ্য বস্টনের দায়িত্ব গ্রহণ করতেন, এবং বিবাহের নিমন্ত্রণে শুকর ঠেঙ্গানী নামক প্রচলিত হত্যাকর্মটি প্রবাদ রূপে এখনো সেই পুরানো স্মৃতি স্মরণ করিয়ে দেয়।

এখন প্রশ্ন হল কি প্রকারে বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজে এমন একটি অভাবনীয় সম্প্রদায় ও মতবাদ গড়ে উঠল। বৌদ্ধ ধর্মের ক্রম বিবর্তনের ইতিহাসের দিকে তাকালে দেখা যায় গুপ্ত সম্রাজ্যের প্রারম্ভিক কাল হতে হর্ষবর্ধনের সময়কাল পর্যন্ত মহাযান বাদে মঞ্জুশ্রীকল্প, গুহ্যসমাজ ও চক্র-সংবর প্রভৃতি অনেক তন্ত্রের উদ্ভব হয়ে গিয়েছিল। মোটকথা বোধিসত্ত্ববাদী মহাযান পিটকীয় নিয়ম নীতির ওলটপালটে যে নিঃসংকোচ উৎসাহের সৃষ্টি করেছিল তারই চূড়ান্ত পরিণতি স্বরূপ অষ্টম শতাব্দীর উড়িষ্যার রাজা ইন্দ্রভূতি এবং তাঁর গুরু সিদ্ধা অনঙ্গ বজ্র ও অন্যান্য পণ্ডিত সিদ্ধারা স্ত্রী লোকদেরকে মুক্তিদাত্রী প্রজ্ঞা, পুরুষকে মুক্তির উপায় এবং শরাবকে অমৃত রূপে সিদ্ধ করার জন্যে আপনাদের পাণ্ডিত্য ও সিদ্ধির সাফল্যে রীতিমত আশ্বালন করতেন। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম বস্তুতঃ বজ্রযান বা ভৈরবী চক্রের ধর্মেই পর্যবসিত হল। এই গুহ্যবাদী প্রথা ক্রমে সমগ্র দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বৌদ্ধ প্রাবিত অঞ্চল গুলোকেও গ্রাস করে ফেলে। সেই যানের অনুসারীরা বাহ্যতঃ ভিক্ষুর বেশ ধারণ করলে ও তারা ভেতরে ভেতরে মঞ্জুশ্রী কল্পের ধারায় স্ত্রীকে প্রজ্ঞা এবং শরাবকে অমৃত রূপে

সিদ্ধির সাধনাতেই নিয়োজিত থাকতেন। আর এই নেশায় মত্ত হয়ে বহু বড় বড় বিদ্যান ও প্রভাবশালী কবি আধ পাগলা চৌরাশি সিদ্ধায় পরিণত হয়ে সাক্ষ্য তথা অস্পষ্ট ভাষায় নির্ভন গান করতেন।

তান্ত্রিক বজ্রযানীদের এই প্রথা হতেই বৌদ্ধ ধর্মগুরু সমাজে কালক্রমে স্ত্রী গ্রহণের প্রথা শুরু হয়। চীন, জাপান, ভূটান, তিব্বত, সিকিম, নেপাল প্রভৃতি মহাযান প্রাবিত দেশে অনেক বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের মধ্যে যুগের মার্জিত ধারায় এখনো এই প্রথা বিদ্যমান থাকলেও আমাদের দেশে প্রকৃত বুদ্ধবাণীর সংরক্ষক থেরবাদের আশীর্বাদে বর্তমানে সেই অভিশাপে মুক্তি সম্ভব হয়েছে।

৮ (খ)। প্রঃ বাংলা-ভারত হতে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্ত হওয়ার পেছনে যে সকল কারণ বিদ্যমান তার একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

উঃ এই ভারত উপ-মহাদেশে বুদ্ধের সমকাল হতে বর্তমান পর্যন্ত একে একে বহু ধর্মীয় প্রবক্তার আবির্ভাব হয়েছে। এ সবার মধ্যে ভগবান বুদ্ধই একমাত্র মহাপুরুষ যার বাণী বিশ্বব্যাপী শান্তি মৈত্রীর এক মহা-বিপ্লবের সূচনা করেছে। এই যুগজয়ী বাণী। সমগ্র বিশ্বের এক তৃতীয়াংশ লোকের দ্বারা এখনো অভিনন্দিত। অথচ তেমন ধর্মকে স্থায়ী জন্ম ভূমি হতে এমনভাবে নিষ্চিন্ন হওয়ার উদাহরণ পৃথিবী পৃষ্ঠে বিরল। অধিকন্তু বুদ্ধ সমকালীন বৈদিক ও জৈন মতবাদ ধর্মের মতো সুপ্রাচীন যেই ভারতের বৃকে এখনো সগৌরবে বিদ্যমান, সেখানে শুধু বৌদ্ধ ধর্মের বেলায় কেন এমন নিষ্ঠুর অভিশাপে নেমে এল, তা একবার ভেবে দেখা দরকার।

বুদ্ধের জীবন, তাঁর বাণী এবং বুদ্ধ পরবর্তীকালে এর বিবর্তনের ধারা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, রাজনৈতিক বা বিধর্মীর আক্রমণ ভারতের বৃক হতে বৌদ্ধ ধর্ম বিলুপ্তির বাহিরের দিক। শুধু এই একটি মাত্র কারণে এমনভাবে কেন মতবাদ স্বভূমি হতে অপসৃত হতে পারে না। বস্তুতঃ বৌদ্ধ ধর্মের কিছু আভ্যন্তরীণ দিকও এই বিলুপ্তির জন্যে কিছুটা দায়ী বলে মনে করার বাস্তবতা যথেষ্ট আছে। এই দিকগুলো নিম্নরূপ ১) প্রথমতঃ বুদ্ধ ছিলেন চরিত্র ও ব্যক্তিত্বের উপর প্রবল আস্থাশীল। এই গুণেই তিনি শিষ্য সংঘের মধ্যে কোন নেতৃত্বের দাবী না করেও অদ্বিতীয় এবং অবিসংবাদিত নায়ক সংঘ ছিলেন। কিন্তু নিজের অবর্তমানে তেমন ব্যক্তিত্বের অভাবে সংঘ পরিচালনা ও সদ্ধর্ম রক্ষার জন্যে তাঁর কোন সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকায় বুদ্ধের সংঘে খুব শীঘ্রই বিভেদের বীজ উগ্ধ হয়েছিল। এক্ষেত্রে তিব্বতের ধর্মগুরু দালাইলামা মনেনয়নের পদ্ধতিটি আমাদের কাছে যতটো বিজ্ঞোচিত মনে হয়। যেমন, একজন দালাইলামার জীবিত অবস্থায় অপর একজন যে কোন শিশুর মধ্যে কতগুলো দৈহিক লক্ষণ ও স্বভাব আচরণ বিচার দ্বারা পরবর্তী দালাই লামার আবির্ভাব নির্ধারণ করা হয়। এভাবে মনোনীত শিশু একাধিক হলেও সবাই কে অতিযত্নে যাবতীয় শিক্ষাদীক্ষা ও ধ্যান-সাধনায় সমৃদ্ধ করে তোলায় পদক্ষেপ নিয়ে অনাগত নেতৃত্বকে নিষ্কণ্টক করা হয়।

২) দ্বিতীয়তঃ বুদ্ধ তাঁর বাণীর স্থায়িত্ব ও শৃঙ্খলা বিধানে এক অদ্বিতীয় বিনয়-বিধান নির্দেশ করেছিলেন। কিন্তু সেই আইনকে ব্যক্তি বা সমষ্টি জীবনে বলবৎ রাখার জন্যে রাজকীয় আইনের ন্যায় স্থান, কাল, পাত্র ভেদে যে কিছু কঠোরতার ব্যবস্থা থাকতে হয়, মহাকারণিক বুদ্ধ কর্তৃক তা সম্ভব হয়নি। প্রশ্ন জাগে, সেই কারণেই কি মহামতি ধর্মাশোককে সংঘের ঐক্যও শৃঙ্খলা রক্ষার্থে একদিন দণ্ড পারুষ্য নামক একটু কঠোর নির্দেশ নামা প্রবর্তন করতে হয়েছিল? মহাকারণিকের এই গণতান্ত্রিক উদারতার পরিণামেই পরবর্তী কালে বৌদ্ধ ধর্মের উপর এত স্বেচ্ছাচারিতার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছিল এবং এত দ্রুত উত্থান-পতন সাধিত হয়েছিল।

৩) তৃতীয়তঃ বৌদ্ধ ধর্মের ত্রিলক্ষণ অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মবাদ সাধারণ মানুষের জন্যে এক অপ্রিয় অথচ অনিবার্য সত্য বাণী। অপ্রিয় সত্য কখনো সরাসরি ব্যবহার করা যায় না। তাতে হিতে বিপরীত হয়। এ কারণেই শ্রেষ্ঠ মনোবিজ্ঞানী ভগবান বুদ্ধ সত্যকে লৌকিক হতে পরমার্থিক পর্যায়ে ক্রমিক ব্যাখ্যার কথা বলেছিলেন। বৌদ্ধ ধর্মের অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্ম জ্ঞান পরমার্থিক সত্যের অন্তর্গত। এই সত্যের মমার্থ উপলব্ধি করতে হলে সাধারণ জ্ঞানকে প্রথরতর করতে হয়। তার জন্যে প্রয়োজন হয় শান্ত, সুন্দর, সুশৃঙ্খল পরিবেশ। এই শান্ত, সুন্দর, সুশৃঙ্খল পরিবেশ গড়ে তোলার ক্ষেত্রটি লৌকিক সত্যের অন্তর্গত। লৌকিক সত্য দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, অভাব-অনটন, লাভ-ক্ষতি, মান-যশ, প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রভৃতিরই নামান্তর। এই লৌকিক সত্যই জাগতিক প্রতিকূলতা হতে একটি ধর্ম সম্প্রদায়কে রক্ষা করতে পারে। যেমন-কোন জাতি বা সম্প্রদায় তাঁর নিজস্ব ঐতিহ্য, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মতাদর্শকে যে কোন প্রতিকূলতার মধ্যেও অটুট রাখতে চাইলে সেই জাতিকে সর্ব প্রথম ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ শক্তি অর্জন করতে হয়। এরপরে স্বাস্থ্য সম্পদ, ধন সম্পদ, ব্যবহারিক জীবনে প্রতিনিধিত্বশীল বিবিধ কারিগরী শিল্প সম্পদ, ব্যবসায়-বাণিজ্য সম্পদ, জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্পদ প্রভৃতি সম্পদের অধিকারী হওয়া চাই। এ সকল সম্পদের অধিকারী হতে হলে চাই প্রবল উদ্যম, উৎসাহ, উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও কঠোর শ্রমশীলতা। লৌকিক সত্যের এই দিকগুলো যথাযত আয়ত্ত্ব করে সামাজিক ঐক্য, ন্যায় নীতি বোধকে শৃঙ্খলা ও ভ্রতৃত্ব বোধের গভীর বন্ধনে আবদ্ধ হতে পারলে একটা সুস্থ ও সুখী সমাজ গড়ে তোলা যায়। এমন একটি সমাজের বুকেই বুদ্ধের গুরু গম্ভীর পণ্ডিত বোধগম্য লোকুন্তর পরম সত্য অনিত্য, দুঃখ ও অনাত্মবাদের উপলব্ধির সুযোগ পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সমাজে লোকসংঘ আশ্রিত ভিক্ষুরা সমাজ গুরু হিসেবে সাধারণ মানুষকে এই ক্রমিক ভৎ প্রতিষ্ঠা লাভে উদ্বুদ্ধ করতে পারেন। এ পর্যায়ে পরমার্থিক ধ্যান সাধনায় জীবন যাপনকারী ভিক্ষুরা ধর্মগুরু হিসেবে সূর্যের মতো জীবনের সঠিক দিক নির্দেশক

শিক্ষক রূপে জন সমাজে দায়িত্ব পালন করবেন জন লৌকিক লোকুন্তর প্রতিষ্ঠার পর্যায় ভিত্তিক উত্তোরণ না ঘটিয়ে যদি লোকুন্তর সত্য-অনিত্য-দুঃখ-অনাত্ম বাদকে সকলের জন্যে সমভাবে প্রয়োগের চেষ্টা করা হয়, তখন সমাজ বুকে সংসার বিমুখী অথচ সংসারীর ত্যাগের উপরে নির্ভরশীল কতগুলো নিষ্কর্মা ভীরা; বীর্যহীন, উদ্যম উৎসাহ বিহীন মানুষের সৃষ্টি হয়। এই শ্রেণীর মানুষ সমষ্টি জীবনে দূরের কথা, ব্যক্তি জীবনে ও বুদ্ধের পরমার্থিক সত্যে উত্তোরণ মার্গ সেই শীল, সমাধি, প্রজ্ঞার ধারে কাছে ও অবস্থান করতে পারে না। অলস মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা- এই প্রবাদটি সেই শ্রেণীর মানুষের জীবনে একান্ত সত্য হয়ে দাঁড়ায়। বৌদ্ধ ধর্মের মধ্য যুগে ও মহাযানের অনিবার্য পরিণতি তন্ত্রযান, বজ্রযান ও সহজযানের আশীর্বাদে এমন একটি বিশাল চরিত্রহীন পরগাছা শ্রেণীর উদ্ভব হয়ে ছিল। এই শ্রেণীর আচার আচরণ ও ক্রিয়া কাণ্ডের মাশুল দিতে গিয়ে বৌদ্ধ ধর্মকে স্থায়ী জন্মভূমি ভারত হতে বিলুপ্ত হতে হল।

৯। প্রঃ বাংলার চাকমা, বড়ুয়া মগ ও সিংহ উপাধি ধারী বৌদ্ধদের এ সকল উপাধির ঐতিহাসিক তথ্য প্রদান কর।

উঃ বাংলার বর্তমান বৌদ্ধগণের মধ্যে সংখ্যায় বড়ুয়ারা প্রধান। কিন্তু একটি ভৌগলিক সীমানায় একত্রে অবস্থানের সুবাদে চাকমাদেরই প্রধান্য তা প্রতীয়মান হয়। সেই চাকমা জাতির কিংবদন্তি মতে তাদের আদি বাসভূমি ছিল কিংবদন্তী মতে চম্পক নগরে এবং সেই চম্পক নগরের অধিবাসী বলেই তাদের নাম 'চাকমা' ধারণা করা হয়। ত্রিপিটকে তৎকালীন মগধ অঞ্চলে (বর্তমানে ভারতের ইউ, পি ভাগল পুরে) চম্পক বা চম্পাবতী নামে এক রাজ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। বহু চাকমারা মনে করেন আমরা শাক্য বংশোদ্ভূত সেই চম্পকেরই অধিবাসী। চট্টগ্রামের ইতিহাস লেখক মাহবুব উল আলম, নুরুল হক প্রভৃতির মতে এই চম্পক নগর খ্রীস্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে বর্তমান ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের মধ্যবর্তী স্থানে ছিল। কিন্তু চাকমা সমাজের প্রাচীন লিপি বার্মা অক্ষরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। শোনা যায় বার্মাতেও চম্পক নামের একটি নগর আছে। এবং রাজনৈতিক অভ্যুত্থানে তথাকার বহু মানুষ সেই চম্পক থেকে পালিয়ে গেছে। এই চাকমারা কি সেই ব্রহ্মদেশে স্থিত চম্পাকেরই অধিবাসী? অথচ চাকমা সমাজের প্রচলিত ভাষা চট্টগ্রামী এবং আসামীদের সাথে অয়বই সাদৃশ্যপূর্ণ। দৈহিক গঠনে আচার কৃষ্টি ও বেশ ভূষায় আসামী ও ত্রিপুরীদের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ এই চাকমাদের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে মাহবুব-উল-আলমের মন্তব্যই গ্রহণযোগ্য মনে হয়। কিন্তু নেলসনের এন্ সাইক্লোপিডিয়া এবং বার্মা গবেষণা সংস্থা মতে দুই হাজার বছর পূর্বে উত্তর ভারতের কয়েকটা ক্ষত্রিয় বংশ বার্মার ইরাবতী অঞ্চলে উপস্থিত হয়ে এই অঞ্চলে সর্বপ্রথম রাজ্য স্থাপন করেন। এদের মধ্যে চন্দ্র বংশীয় রাজাদের রাজধানীর নামাকরণ হয় বৈশালী। এই সেই সূত্র ধরে

ব্রহ্মদেশে চাকমাদের দাবীকৃত সেই আদি বাসভূমি চম্পক এবং উত্তর ভারতের চম্পক কি একই রক্তের ধারায় অবস্থান করে না? উৎপত্তি যেখানেই হউক চাকমা সমাজে আদি হতে বর্তমান পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শই বিদ্যমান। এ অঞ্চলের অন্যান্য বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের ন্যায় বহু প্রাচীন কাল হতেই তারা বুদ্ধের ধর্মের সংস্পর্শে এসেছে। চাকমা সমাজে ‘বউরগা গোজা’ বা বড়ুয়া গোষ্ঠীর অস্তিত্ব থেকে প্রাচীন কাল হতে বড়ুয়া বৌদ্ধদের সাথে ধর্ম ও রক্ত উভয় বন্ধনের সন্ধান মিলে। বস্তুতঃ প্রাচীন কালের বড়ুয়া ও চাকমারা দীর্ঘকাল ধরে একই পরিবারের সদস্যের মত। বর্তমানেও চাকমা সমাজে ধর্ম ও শিক্ষা সভ্যতার পুণঃ জাগরণে বড়ুয়া বৌদ্ধদের দান অপরিসীম।

‘বড়ুয়া’ শব্দটি আধুনিক ভারত উপমহাদেশে আসামী ও চট্টগ্রামী কিছুকাল লোক ছাড়া আর কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। আসামীদের মধ্যে যারা এই উপাধি ব্যবহার করেন তারা সেখানে বৈষ্ণব ধর্মী ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ের পর্যায় ভুক্ত। আর চট্টগ্রামীরা, বহু প্রাচীন কাল হতেই বৌদ্ধ। আসামীরা চট্টগ্রামীদেরকে ‘ভাগরিয়া বরুয়া’ বা পলায়িত বরুয়া বলে আখ্যায়িত করেন। ১৫০১ খ্রীঃ রচিত ত্রিপুরার রাজ বংশের ইতিহাস গ্রন্থ ‘রাজমালা’য় এবং আসামের ইতিহাসে ও আসামী অভিধানে ‘বরুয়া’ শব্দটি রাজকীয় উচ্চ পদস্থ কর্মাধ্যক্ষের উপাধি বলে উল্লেখ দেখা যায়। মধ্যযুগের শ্রেষ্ঠ বাঙ্গালী কবি বডুচন্ডী দাস প্রথম জীবনে ছিলেন সহজিয়া বৌদ্ধ। পরবর্তী কালে বৈষ্ণব সম্প্রদায় ভুক্ত হলে একই নামে তিনি স্থান লাভ করলেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়ে। ব্রাহ্মণদের মধ্যে বর্তমানে ‘বাড়ুজ্যে’ বা বন্দোপাধ্যায় নামে যে উপাধির প্রচলন, তা এই বডুআ-শব্দেরই বিবর্তন। এতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় বডুআ ‘বড়ুয়া’ ‘বরুয়া’ অথবা বডু উপাধিধারী একটি গোত্র তৎকালে সারা বাংলায় বিদ্যমান ছিল। বস্তুতঃ চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী এতদঞ্চলের আদিবাসীন্দা হলেও, সুপ্রাচীন কাল থেকে তাদের মাঝে ‘অমগধ’ একটি শব্দ তুচ্ছার্থে ব্যবহার প্রচলিত আছে। কোন ব্যক্তি মর্যাদাহানীকর কোন আচরণ করলে ‘তুই অমগধ’ বাক্যটি তার প্রতি নিন্দার্থে প্রয়োগ হয়ে থাকে। এ বাক্যটির অর্থ হলো-তুমি মগধের রক্তের ধারক নও বলেই এমন হীন আচরণ করতে পেরেছ। মাতৃ ভূমির প্রতীক মগধেশ্বরীর পূজারী প্রদেশের বড়ুয়াদের এই হৃদয়ানুভূতি থেকেই তারা নিজেদেরকে বুদ্ধ সমকালীন মগধের বৈশাখী রাজ্যের বাসিন্দা বজ্জীজাতি বলেই বিশ্বাস করে থাকেন। সেই বজ্জী শব্দটিই পরবর্তীকালে এভাবে বিবর্তিত হয়েছে বজ্জী-ব্জ্জী-বডু/বরু-বড়ুয়া/বরুয়া। তুলনামূলক ঐতিহাসিক বিচারে দেখা যায় বাংলার এবং আসামের বড়ুয়ারা একই রক্তের ধারা সেই মগধ ক্ষত্রিয় বৃজিদের বংশধর। বাংলা আসাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে খ্রীস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর বৈষ্ণব ধর্মের প্রবল উত্থানের স্রোতে বিশাল বড়ুয়া জন গোষ্ঠীর অনেকে স্বধর্মচ্যুত হলেও বাংলার সর্ব দক্ষিণ কোণের চট্টগ্রামী

বড়ুয়ারা রক্ষা পেয়েছে স্বধর্মী আরকান সম্রাজ্যের আশীর্বাদে। চট্টগ্রাম ব্রিটিশ করতলগত না হওয়া পর্যন্ত এ অঞ্চল এক প্রকারে পূর্বাপর আরকানী বৌদ্ধ বৌদ্ধ রাজাদের শাসিতই বলা চলে। তাই চট্টগ্রামের ভূমি জরীপের মঘী সন সেই ব্রিটিশ শাসন পর্যন্ত বলবৎ ছিল। ফলে বাংলার বড়ুয়া গোত্রের একটি সঠিক তথ্য আরকানের ইতিহাসে পাওয়া যায়। সেই তথ্যের সুবাদে বড়ুয়ারা 'মারমাঘী বা মারমাদের বড়ো ভাই বলেই পরিচিত এবং সম্মানিত। খ্রীঃ পূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকেই বাংলা ও সিংহলের মধ্যে গভীর যোগসূত্র ছিল। ফলে বড়ুয়া শব্দটির অস্তিত্ব বর্তমান শ্রীলঙ্কায় ও বিদ্যমান। সেখানে 'স্বামী' বা প্রধান অর্থেই এই শব্দটির ব্যবহার দেখা যায়।

বাংলার বুদ্ধের 'মগ' নামের যে বৌদ্ধগণ বর্তমানের পার্বত্য চট্টগ্রাম ও পটুয়াখালী জেলায় অবস্থান করছেন তাদের প্রচলিত উপাধি আসলে মগ নয়। এরা 'মারমা' বা রাখাইন উপাধিই ব্যবহার করে। কিন্তু ঐতিহাসিক তথ্যে তাদের 'মগ' নামটাই যথায়ত। আরকানের কিংবদন্তী নেলসন'স এন সাইক্লোপিডিয়া এবং বার্মা গবেষণা সংস্থার মুখপত্র (Jurnal of Burma Resrch Society, Voll- 111,1960) মতে খ্রীস্টীয় ২য় শতাব্দীতে উত্তর ভারতের কয়েকটি ক্ষত্রিয় গোত্র ব্রহ্মদেশে আগমন করেন। বস্তুতঃ তারাই হচ্ছেন বর্তমানে এদেশের বড়ুয়া, চাকমা ও মারমা সম্প্রদায় নামে এদেশের বৌদ্ধ জন গোষ্ঠী। এদের বংশধরগণ পরবর্তী কালে আরকানে রাজ্য স্থাপন করেন। খ্রীস্টীয় নবম শতাব্দীর আরকানের 'চন্দ্র সূর্য বংশীয়' রাজ্য বর্গ নিজেদের মগধ বংশীয় বলেই পরিচয় দিতেন এবং তাঁদের রাজধানীর নামও রাখেন বৈশালী। তারা ফেলে আসা মাতৃভূমির পূজায় তৈরী করেন 'মা-মগধেশ্বরীর মূর্তি' পর্যন্ত। নেলসন এন সাইক্লোপিডিয়া মতে এই বৌদ্ধ মগধ ক্ষত্রিয়রাই দুই হাজার বছর পূর্বে বার্মার ইরাবতী নদী উপত্যকায় সর্ব প্রথম রাজ্য স্থাপন করেন। তাই পরবর্তীকালে সমগ্র আরকান বাসীরা 'মগ' নামেই ইতিহাসে সমধিক প্রসিদ্ধি লাভ করেন। এই সূত্র ধরে ডক্টর মুহম্মদ এনামুল হক মগ শব্দের ক্রম বিবর্তন দেখিয়েছেন এভাবে- মগধ মগহ মগ। বস্তুতঃ এটাই মগধ বংশোদ্ভূত বাংলার বড়ুয়া, চাকমা, মারমা এই বৌদ্ধদের আসল পরিচিতি।

বাংলার বর্তমান বড়ুয়া সমাজের সাথে আরকানী মারমা সম্প্রদায়ের রক্তের বন্ধন এত গভীর যে অন্য সম্প্রদায়ের চোখে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত বস্তুতঃ কোন প্রভেদই গোচরীভূত হত না। ত্রিপুরার রাজমালা গ্রন্থে 'মগধেশ্বরী' বা ত্রিপুরা সুন্দরী দেবীকে নিয়ে চট্টগ্রামী বড়ুয়া বৌদ্ধ ও ত্রিপুরার বৌদ্ধদের মধ্যে যে দীর্ঘ দ্বন্দ্ব চলছিল তার উল্লেখ দেখা যায়-

“চট্টগ্রাম সদরঘাট এক বৃক্ষমূলে,
পূজয়ে আমাকে সদা মগধ সকলে ।
সেই স্থান হইতে শীঘ্র আনহ আমায় ।”

[ধন্য মানিক্য খণ্ড (১৫০১ খ্রীঃ)]

এবং অন্যত্র- “কালিকার মঠচূড়া মঘে ভাঙ্গি ছিল,
পুনবার মহারাজ নির্মাণ করিল ।”

[কল্যাণ মাণিক্য খণ্ড (১৬৮১ খ্রীঃ)]

বর্তমান বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজের বংশ তালিকায় বরমঘের গোষ্ঠী, পরাণ মঘের গোষ্ঠী, আনক্কা পুংখীর গোষ্ঠী, আনপ্লা জেদির গোষ্ঠী, বোইন মঘের, গোষ্ঠী আরিপা, পুংখীর গোষ্ঠী, প্রভৃতি আরো বহু গোষ্ঠী যেমন আরকানীদের সাথে বড়ুয়াদের সংমিশ্রণ প্রমাণ করে তেমনি বড়ুয়াদের ব্যক্তিগত নামাকরণে অংচাপ্র, মংচাপ্র, কেয়াপ্র, চরপপ্র প্রভৃতি নামের ব্যবহারও আরকানী মাগধী সম্প্রদায়ের কৃষ্টি ও সংস্কৃতির প্রভাব যথেষ্ট ।

সিংহলের ইতিহাসে দেখা যায় বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ বর্ষে অর্থাৎ খ্রীঃ পূর্ব ৪৮৩ অব্দের দিকে বঙ্গের রাজা সিংহ বাহুর সন্তান ‘বিজয়া’ বেশ কিছু সংখ্যক অনুসারী নিয়ে লঙ্কাদ্বীপে আগমন করেন এবং সর্বপ্রথম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন । তিনিই সিংহলা জাতির প্রতিষ্ঠাতা । বর্তমান শ্রীলঙ্কায় বহু বৌদ্ধ স্ব স্ব নামের সাথে সিংহ উপাধি ব্যবহার করেন । যেমন- শুভা সিংহা, অনোমা সিংহা, অমরা সিংহা, গুণাসিংহা, সামরা সিংহা ইত্যাদি ।

শ্রীলঙ্কার ইতিহাস দৃষ্টে এই প্রশ্ন জাগে সিংহল জাতির প্রতিষ্ঠাতা কি বাংলার বর্তমান ‘সিংহ’ উপাধিধারী বৌদ্ধদেরই পূর্ব পুরুষ নয়? যদি, এ অনুমান সত্য হয়ে থাকে তাহলে বাংলার বুদ্ধের আদি বাসিন্দাদের মধ্যে এই সিংহ বৌদ্ধগণ অন্যতম এবং রক্তে মাংসে তারাই খাঁটি বঙ্গের সন্তান । বর্তমানের সিংহ বৌদ্ধদের অনেকে মনে করেন তাঁদের পূর্ব পুরুষগণ কপিলাবাস্তুর অধিবাসী এবং শাক্য সিংহের বংশ ধর বলেই তাদের এই ‘সিংহ’ উপাধি গ্রহণের কারণ । কিন্তু পিটকীয় বর্ণনায় শাক্য বংশের যে তথ্য আমরা লাভ করি তাতে মহানাম শাক্য, শুক্লধন শাক্য বা শুদ্ধোদন শাক্য এরূপ উপাধির ব্যবহারই দেখি । শুধু বুদ্ধের বেলায় শাক্য মুণি বা শাক্য পুত্র বা শাক্য সিংহ এ সকল গুণবাচক শব্দের ব্যবহার হয়েছে তথাগত, অমিতাভ, দশবল প্রভৃতির ন্যায়; কোন জাতি বা বংশগত উপাধি হিসাবে নয় । বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণে এবং বুদ্ধের প্রতি গারবতা বশে এমন একটি উপাধির ব্যবহার সম্ভব ।

বাংলায় এই সিংহ বৌদ্ধরা বর্তমানের ন্যায় কখনো মুষ্টিমেয় ছিলেন না। সমগ্র বাংলাতেই এক কালে সিংহ বৌদ্ধরা অবস্থান করতেন। তাদের মধ্য হতে যারা ইসলামের কবলে পড়ল তারা ইসলামের ঐতিহ্য মাফিক পূর্বের কোন স্মৃতি চিহ্নই নামের সাথে রাখলেন না। কিন্তু হিন্দুদের অপেক্ষাকৃত সহিষ্ণুতা গুণে সেই ধর্মান্তরীত বৌদ্ধরা হিন্দু হয়েও এখনো পূর্বের উপাধি ‘সিংহ’ পদবী ব্যবহার করেন। যেমন চট্টগ্রামের কুণ্ডেশ্বরী ঔষধালয়ের প্রতিষ্ঠাতা নূতন চন্দ্রসিংহ, মস্ত সিংহ প্রমুখেরা বাংলার বর্তমান সিংহ বৌদ্ধগণেরই বংশধর।

১০। প্রঃ বাংলার বিপুল বৌদ্ধগণ ধর্মান্তরীত হওয়ার পর এখন কোথায় কি অবস্থায় আছে?

উঃ বাংলার বর্তমান সংখ্যা গরিষ্ঠ সম্প্রদায় মুসলমান। এই সমাজের বিশ্বাস মতে যে সকল মুষ্টিমেয় মুসলমান ‘শেখ’ ও ‘সৈয়দ’ উপাধি ধারী কেবলমাত্র তারাই আরব দেশ হতে আগত মুসলমান অথবা আরবীয় ঔরসে জন্ম। অবশিষ্ট সকলেই স্থানীয়। এই স্থানীয়ের মধ্যে সামান্য সংখ্যক হিন্দু হতে এবং অবশিষ্ট সকলেই বৌদ্ধ ধর্ম হতে ইসলামে ধর্মান্তরিত হয়েছে। অন্য দিকে হিন্দুদের মধ্যে বর্তমানে বাডুই, সাহা, বণিক, নাথ, সিংহ, গুপ্ত এবং পাল উপাধিধারী সকলে ধর্মান্তরীত বৌদ্ধদেরই বংশ ধর।

১১। প্রঃ চট্টগ্রামের আদি অধিবাসী ও আদি ধর্ম সম্পর্কে কি জান?

উঃ চট্টগ্রামের আদি অধিবাসীরা ‘তিবেতো বর্মণ’ জাতির বংশধর বলেই অনুমান করা হয়। এই আদিবাসীরা কোল, ভিল, মুরুং এবং সাঁওতাল। এ সকল লোকদের মধ্যে বস্তুতঃ কোন প্রচারিত ধর্মমত ছিলনা। তাঁরা নদী পর্বত বৃক্ষ, সূর্য প্রভৃতি প্রকৃতি পূজাই করত। কোন প্রবর্তক বা প্রচারকের ধর্মমত হিসেবে বৌদ্ধ ধর্মই অত্র অঞ্চলের আদি ধর্ম। আরকানের ‘ধাইয়া ওয়াদি রাজা বাইন’ বা ধন্যবতী রাজবংশ নামক ইতিহাস গ্রন্থে দেখা যায় খ্রীস্টীয় ১৬৪ অব্দে ‘চন্দ সুরিয়া’ বা চন্দ্র সূর্য রাজা সগৌরবে বুদ্ধের স্বর্ণ প্রতিবিম্ব ‘মহামুণি’ প্রতিষ্ঠা করছেন। নেলসনের এন সাইক্লোপিডিয়া মতে প্রায় দুই হাজার বছর পূর্বেই বার্মার ইরাবতী নদী উপত্যকায় উত্তর ভারত ও মধ্য এশিয়ার মঙ্গোলীয়া হতে আগত বৌদ্ধরা সর্ব প্রথম সেখানে রাজ্য স্থাপন করেন। এতদৃষ্টে চট্টগ্রামে বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব খ্রীঃ পূর্বাব্দেই সূচিত হয়েছে বলা যায়। বৌদ্ধ ধর্মের আগমনের সাথে অত্রাঞ্চলের আদিবাসীদের সাথে আর্থ রক্তের ও সংমিশ্রণ হতে শুরু করে। কালক্রমে চট্টগ্রামীদের উপর আর্থ ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব এতদকালের সবকিছুকে আর্থময় করে তোলে। তাই চট্টগ্রামী কথ্য ভাষায় পালি ভাষার প্রভাব এখনো সমধিক। যেমন, পালি ভাষার- ‘উজ্জু’ শব্দটি চট্টগ্রামের কথ্য ভাষায়ও সম অর্থে (মোজা) বহুল ব্যবহৃত। তেমনি ভাবে উজ্জ্বতি (উল্ঠা), উদ্ (উদবিড়াল), বৈঁকা (বন্ধ বাঁকা) প্রভৃতি বহু পালি শব্দের হুবহু বা কিঞ্চিৎ বিকৃত রূপ চট্টগ্রামী ভাষায় এখনো সেই বৌদ্ধযুগের প্রভাবই প্রমাণ করে।

১২। প্রঃ বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজে ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের পূর্বাবস্থা বর্ণনা কর।

উঃ বেশী দিনের কথা নয় চট্টগ্রাম ও কলিকাতার বড়ুয়া সমাজে অনেক গুলো লৌকিক পূজা প্রচলিত ছিল যেমন- দূর্গা পূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, শনিপূজা, মগধেশ্বরী পূজা, কালী পূজা, গঙ্গা বা গাঙ পূজা, ডাকনীর পূজা, গ্রাম্য দেবতার পূজা, গৃহদেবতার পূজা, কার্তিক পূজা, কার্তিক ব্রত বিষুর সংক্রান্তির উৎসব ও নবান্ন।প্রচলিত লৌকিক পূজা পদ্ধতি হতে প্রমাণিত হয় যে..... বড়ুয়া সমাজ একটি হিন্দু ভাবাপন্ন গৃহস্থ সমাজ। শক্তিদের সহিত তাঁদের ঘনিষ্ট সম্বন্ধ। [বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি ডঃ শ্রী মাধব বড়ুয়া] উপরোক্ত বিষয়াবলী ছাড়াও চাকমা সমাজে ধর্ম গ্রন্থ হিসেবে বিশেষ সমাদৃতঃ ১৮২০ খ্রীস্টাব্দে লিখিত শিবচরণের ‘গোজেন লামা’ নামক পুস্তকে ‘গোজেন কে বিশ্বের সৃষ্টি কর্তা রূপে বর্ণনা করা হয়েছে। যেমন-

“জলের উপরে বইস্যে থল,
বানেল গোজেন জীব সকল।”

ঠিক একই ভাবে ১৮৫০ খ্রীস্টাব্দে লিখিত এবং বড়ুয়া সমাজে ধর্মগ্রন্থ হিসেবে বিশেষ সমাদৃতঃ ‘মঘা খম্বোজা’ নামক হস্তলিখিত গ্রন্থে তদানীন্তন প্রচলিত প্রথামতে ‘ও’ নমঃ গণেশায়, নমঃ সরস্বতী; অথ মঘ খম্বোজা লিখতে;- বলে গ্রন্থকার আরম্ভ করেছেন। প্রারম্ভে তিনি প্রভু নিরঞ্জনকে প্রণাম করেছেন- যিনি ত্রিভুবনের সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কারণ। এই নিরঞ্জন প্রভু বুদ্ধ নহেন, ইনি পরমেশ্বর।

[ডঃ বড়ুয়া, সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ৫২শ বর্ষ]

শুধু তাই নহে, ‘বৌদ্ধ বিবাহ মন্ত্রের প্রাচীন পুংথি ‘শ্রী এ দূর্গা’ ‘শ্রী হরি শরণ’ বলে আরম্ভ হয়েছে..... প্রাচীন বিবাহ মন্ত্রে ব্যবহৃত “উ নামহ ওম তারা তারা, মহাতারা পূর্বতারা তারা ত্রিংশ ভরে স্বহাঃ” এরূপ মন্ত্র বাক্য উচ্চারিত হত। এছাড়াও বড়ুয়া সমাজে ‘ফরা তারা সাজ্জা, ‘অনিচ্ছা, দুক্খা, অনাত্মা’ এবং ‘বুদ্ধো বোধ্য্য মুত্তো মোচেয়াং, তিন্নো তারেয়াং- প্রভৃতি বাক্য ব্যবহারে এটাই স্পষ্ট যে অত্রাঞ্চলের বৌদ্ধ ধর্মের উপর হিন্দু পুরাণ এবং মন্ত্রযান বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব পুরাদমে বিদ্যমান ছিল।

চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও কুমিল্লাঞ্চলের বৌদ্ধদের তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্ম ও পৌরাণিক হিন্দু ধর্মের সংমিশ্রণ জাত এমন বিদগুটে অবস্থার মধ্যে ও এই অঞ্চল সমূহের রাজ্যভার ১৬৬৬ খ্রীঃ পর্যন্ত বৌদ্ধদের হাতেই ছিল। ১৬৬৬ হতে ১৭৬০ খ্রীঃ পর্যন্ত সেই রাজ্যভার হস্তগত করেন মোগল প্রতিনিধিরা। মুসলমানদের এই শতাব্দী কালের শাসনে বৌদ্ধরা ব্যাপকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণে বাধ্য হয়। এই সময় কালের মধ্যে একে একে ময়নামতির শালবন,

আন্দরকিল্লার মহাবিহার, আনোয়ারা ঝিয়রীর পণ্ডিত বিহার, পটিয়ার চক্রশালা, মহাবিহার, এবং রামুর রম্যবতী রাংকুট মহাবিহার ধূলিষ্যাত হয়। অবশিষ্ট ছোট মাঝারি স্থানীয় বিহার গুলি হয় লুপ্ত নয় মসজিদ দরগাহে রূপান্তরিত হয়। ১৭৬০ খ্রীস্টাব্দে চট্টগ্রাম এবং ক্রমে সমগ্র বাংলাদেশ ব্রিটিশ অধিকারে আসার পর তাদের পরমত সহিষ্ণুতার কারণে অবশিষ্ট বৌদ্ধরা শিক্ষা সংস্কৃতি ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে কিছুটা উন্নতির সুযোগ যেমন লাভ করে, তেমনি স্বধর্মী ব্রহ্মবাসীর সাথে পুণঃ সহজ যোগাযোগের সুযোগ ও সৃষ্টি হয়। এ সময়ে ব্রহ্মদেশে তান্ত্রিক মহাযানের অপসারণ ও থেরবাদের যে অভ্যুত্থান সূচিত হয় তা ক্রমে আরকানের পথ বেয়ে আরকানের সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের নেতৃত্বে চট্টগ্রামেও উপস্থিত হয়। এই মহাপুরুষই ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের অগ্রদূত।

বাংলায় বৌদ্ধ নব জাগরণের যুগ (ঊনবিংশ শতাব্দী)

১৩। প্রঃ ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলার বৌদ্ধ সমাজে ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনের বর্ণনা দাও।

উঃ বাংলার বৌদ্ধ সমাজে ঊনবিংশ শতকের ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন বলতে ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে আরকান সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের চট্টগ্রাম আগমনকে এর সূচনা কাল হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। সংঘরাজ সারমেধ ১৮৫৬ খ্রীস্টাব্দে বুদ্ধগয়ায় তীর্থ ভ্রমণে গেলে বোয়ালখালী শাকপুরার শ্রদ্ধেয় রাধুমাথের সাথে তাঁর দেখা হয়। তীর্থ ভ্রমণে পারম্পরিক আলাপ পরিচয়ে রাধুমাথে সংঘরাজকে তীর্থ হতে ফেরার পথে একবার চট্টগ্রামে পদার্পনের অনুরোধ জানান। শ্রদ্ধেয় রাধুমাথের এই অনুরোধ রক্ষা এবং তৎকালীন আরকান ও চট্টগ্রামী বৌদ্ধদের পূণ্য তীর্থ চন্দ্রমুণির তপোবন চন্দ্রনাথ (বর্তমানে সীতাকুণ্ড) দর্শন এই দুই সংকল্প নিয়ে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে সংঘরাজ সারমেধ চন্দ্রনাথ তীর্থের বার্ষিক মেলা উপলক্ষে চট্টগ্রামে উপস্থিত হন।

সেকালের লোকেরা চন্দ্রনাথকে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ স্থান কুশীনগর বলেই ধারণা করতেন। তাই, চন্দ্রনাথের বার্ষিক মেলায় অত্র অঞ্চলের ভিক্ষু গৃহী সকলেই সমবেত হতেন এবং গৃহীরা মৃত জ্ঞাতীর উদ্দেশ্যে গত টিকুজীর বিসর্জন সহ প্রয়াতদের উদ্দেশ্যে পিণ্ডদান করতেন। সংঘরাজ সারমেধ এই তীর্থ মেলায় উপস্থিত হয়ে স্ব-চক্ষে অত্র অঞ্চলের ভিক্ষু-গৃহীদের ধর্ম বিষয়ক ধারণা এবং বৌদ্ধ ধর্মের বিপরীত আচার-আচরণ লক্ষ্য করে মেলায় উপস্থিত রাধুমাথে ও অন্যান্যদের সাথে বিস্তারিত আলাপ করে বুঝতে পারলেন এখানকার বৌদ্ধরা

প্রকৃত পক্ষে মহান বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ। তাঁদের সেদিনের ধর্ম-বিনয় জ্ঞান সম্পর্কে ‘সদ্ধর্ম রত্নাকর’ নামে একটি প্রমাণ্য গ্রন্থে প্ররূপ উল্লেখ আছে—“তখন বিনয় শিক্ষার অভাবে ক্রমে ভিক্ষুদের শীল পরিহানী ঘটেছিল। তাহারা ভাত-তরকারী ব্যতীত দিবা ১২টার পর চিরা, মিঠা, ফল প্রভৃতি ভোজন করিতেন। ভিক্ষুদের তিনটি শ্রেণী ছিল, মাথে, কামে ও পাইংজাং নিমন্ত্রণে যাওয়ার সময় কালে ভিক্ষুগণ মুকুট (হতুক) পড়িতেন, পাইংজাংগণ মস্তক বস্ত্রাবৃত করিয়া যাইতেন ও মাথেগণ বৃহৎ শ্বেতছত্র ধারণ করাইয়া গমণ করতেন। তাহারা শ্রামণেরকে (মৈসাংকে) সীমায় (চিংঘরে) নিয়া কম্বাচা পাঠান্তে উপসম্পদা দিতেন বটে, কিন্তু আবার সীমা হইতে বিহারে আনয়ন করিয়া তাহাদিগকে দশশীল দিতেন। এভাবে বিনয় কার্যের অতিশয় বিশৃঙ্খলা হইয়া পরিয়াছিল। ১২২৭ মঘাব্দে (১৮৫৭খৃঃ) আকিয়ার হইতে সংঘরাজ শ্রীমৎ সারমেধ মহাস্থবির চট্টগ্রামে পদার্পন করিয়া ভিক্ষুদের বিনয় বিরুদ্ধ নীতির প্রতি কটাক্ষ করিছিলেন এবং ভিক্ষুদিগকে বিনয়-সম্মত ভাবে উপসম্পদা প্রদানের আবশ্যকতা হৃদয়ঙ্গম করিলেন। চট্টগ্রামের প্রাচীন ভিক্ষুগণ উত্তর মূল নিকায় ভূক্ত হইলে ও তাঁহাকে কালসহানয়ে বিনয়াচার সষ্ট হইয়াছিলেন,.....। এই সংঘরাজ হইতে চট্টগ্রামের উক্ত প্রাচীন ভূক্ত ভিক্ষুদের কেহ কেহ নূতন ভাবে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহারা হইলেন বর্তমানে সংঘরাজ দলের ভিক্ষু। আর যাহারা সংঘরাজ হইতে দীক্ষা লইলেন না, তাহারা হইলেন ‘মহাস্থবিরের (বা মাথের) দলের ভিক্ষু’। (সদ্ধর্ম রত্নাকরঃ ৪৪২-৪৪৩পৃ)তাই, স্থির হল চট্টগ্রামের এই শাক্তি পন্থী তান্ত্রিক ধর্ম গুরুরা সংঘরাজের নিকট বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম বিনয় মতে দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করে সমাজ সংস্কারে মনোনিবেশ করবেন। এই সিদ্ধান্ত মতে মাননীয় সংঘরাজ ১৮৬৪ খ্রীস্টাব্দে উপসম্পদা দানের উপযোগী ভিক্ষু সংঘ নিয়ে চট্টগ্রামের মহামুণি পাহাড়তলীতে উপস্থিত হন। দুর্ভাগ্য বশতঃ পাহাড়তলী গ্রামের এক সামান্য সামাজিক গোলযোগকে হেতু করে রাধুমাথে, দাস্যা মাথে ও তিতন মাথে এই তিন নেতৃস্থানীয় ধর্মগুরু তাদের কতিপয় সমর্থক সহ সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের নিকট দীক্ষা গ্রহণে বিরত থাকেন। তাদের সেদিনের এই অদূরদর্শী সংকীর্ণ চেতনার কুফল অনির্দিষ্ট কালের জন্যে সমাজকে বিভেদের অভিশাপে অভিশণ্ড করল। যারা সংঘরাজের নিকট দীক্ষা নিলেন তারা পরবর্তী কালে সংঘরাজ নিকায় এবং যারা যোগদান করলেন না তারা মাথের নিকায় নামে বাংলার বড়ুয়া সমাজে পরিচিত হলেন। সেদিন প্রচলিত অন্ধ কুসংস্কার পরিত্যাগের এবং প্রকৃত সদ্ধর্মকে জানার তাগিদ যারা অনুভব করেছিলেন তারা যৌথ ভাবে না হলেও অন্ততঃ উভয় পক্ষ হতে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়।

সারমেধ যুগ : ১৮৬৪ খ্রীঃ হতে ১৮৮২ খ্রীঃ পর্যন্ত সংঘরাজ সারমেধ এতদঞ্চলে তাঁর অনুসারীদের নিয়ে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে নেতৃত্ব দেন। সংঘরাজ নিকায় ভূক্তদের মধ্যে যারা এ সময়ে সংস্কার আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে পাহাড়তলীর জ্ঞানালংকার মহাস্থবির (লালমোহন) ও কমল ঠাকুর, অভয়শরণ মহাস্থবির (দমদমা), দুরাজ মহাস্থবির (গুমানমর্দন), হরি মাথে (বিনাজুরী), সুস্ম মাথে (মির্জাপুর), হরিমাথে (ধর্মপুর)। এই সাতজন ছিলেন সংঘরাজের নিকট প্রথম দীক্ষা গ্রহণকারী। এই সময় কালের মধ্যে তান্ত্রিক মতের অনুসারী চাকমা রাণী কালিন্দী দেবীকে থেরবাদ মতাদর্শে উদ্ধৃত করা হয় এবং তাঁর সহায়তায় ১৮৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রাঙ্গুণীয়ার রাজানগর বিহারে বহু শতাব্দী পর বাংলার বুদ্ধে পুণঃ থেরবাদী বিনয় সম্মত স্থল ভিক্ষু সীমা প্রতিষ্ঠা ও বিহার উৎসর্গ করা হয়। ভিক্ষুদের ধর্ম বিনয় শিক্ষার জন্যে সংঘরাজ সারমেধ কর্তৃক পাহাড়তলীতে টোল স্থাপন করা হয়।

পূর্ণাচার যুগ : ১৮৬৯ খ্রীঃ রাজানগর বিহার উৎসর্গের পর সংঘরাজ সারমেধ আরকান চলে গেলে ভিক্ষু সংঘের পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে বাংলার বৌদ্ধকুল গৌরব পূর্ণাচার তথা চন্দ্রমোহন মহাস্থবিরের উপর। কিন্তু ১৮৭১ ইংরেজীতে তিনি অভিধর্ম শিক্ষার্থে ব্রহ্মদেশে গিয়ে প্রায় ১২ বৎসর সেখানে ও শ্রীলঙ্কায় অতিবাহিত করেন। এই সময়কালের মধ্যে সংঘের পরিচালনার দায়িত্ব পড়ে জ্ঞানালংকার মহাস্থবিরের উপর। এ সময়ে তিনি সংঘ সম্মিলনী নামে ভিক্ষুদের নিয়ে একটি সমিতি গঠন করেন। ইহার উদ্দেশ্য ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনকে আরো জোরদার করা। ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম বিনয়ে সুশিক্ষিত আচার্য পূর্ণাচার বার্মা ও লঙ্কা ঘুরে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালংকার মহাস্থবির তাঁকে সংঘনায়কের দায়িত্বভার অর্পন করেন। সংঘরাজ পূর্ণাচারের নেতৃত্বে ভিক্ষু এবং গৃহী উভয় ক্ষেত্রে দুর্বীর আন্দোলন দুর্বীরগতি লাভ করে। ক্রমে আচরিয়া পূর্ণাচারের পিতৃব্য তদানীন্তন রাউলী নেতা উনাইনপুরার সুধন মাথে, বেলখাইনের রাধুমাথে, সাতবাড়ীয়া দেওয়ানজী পাড়ার পহরচাঁন মাথে, বাঁশখালীর জয়গোপাল মাথে, সাতকানিয়ার পহরচাঁন মাথে, রাঙ্গুণীয়ার নবীন মাথে, রাউজানের পরাগ ঠাকুর নিশি মাথে, বিনাজুরীর দেবু মাথে ও হরি মাথে, গহিরার নব মাথে ও রামমণি মাথে, জোবরার বেপারী মাথে, আব্দুল্লাপুরের হরি মাথে, গুমানমর্দনের অমরসিংহ ও দুরাজ মাথে, ধর্মপুরের রাজু মাথে, হাইদচকিয়ার নৈচাঁন মাথে, ভুজপুরের গোলক মাথে, দমদমার গুরুদাস মাথে প্রমুখ নেতৃস্থানীয় বহু প্রাচীন তন্ত্র-ধর্মী রাউলী ধর্মগুরুরা স্বশিষ্যে থেরবাদী উপসম্পদা গ্রহণ করেন এবং সেই থেরবাদী নীতি আদর্শে নানা স্থানে ধর্ম ও সমাজ জীবনে সংস্কার সাধন করতে থাকেন। আচরিয়া পূর্ণাচারের যুগেই বাংলায় ব্যাপকভাবে পালিভাষা ও সাহিত্য চর্চা শুরু হয়। তাঁর চেষ্টায় মুকুট নাইটে ও মহামুনি পাড়ারতলীতে দুইটি পালি ও ধর্ম-বিনয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠে। বহু ভিক্ষু-শ্রমণেরা তথায় ধর্ম-বিনয়ে জ্ঞান লাভ করেন।

পূর্ণাচার পরবর্তী যুগ : সংঘরাজ আচারিয়া পূর্ণাচারের অনুপ্রাণিত আদর্শে তাঁর পরবর্তী কালে কবিধ্বজ গুণালংকার মহাস্থবির (ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির রাসুনীয়া), তৃতীয় সংঘরাজ প্রজ্ঞালংকার মহাস্থবির, চতুর্থ সংঘরাজ বরজ্ঞান মহাস্থবির প্রভৃতি প্রতিভাধর কর্মবীর ভিক্ষু ও সংঘরাজগণের নেতৃত্বে ধর্মে ও সমাজে এক অভাবনীয় পরিবর্তন সূচিত হয় এবং বহু সংখ্যক ভিক্ষু-শ্রামণ লঙ্কা বার্মাদি সঙ্ঘরাজ প্রধান দেশে গিয়ে ত্রিপিটক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের সুযোগ লাভ করেন।

অপরদিকে মাথের নিকালে শ্রদ্ধেয় অগ্রসার মহাস্থবির, অগ্রলঙ্কার মহাস্থবির, প্রভৃতি মহাস্থবিরগণ থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের আদর্শে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারে যথেষ্ট অবদান রাখেন। তাঁদেরই অবদানে পরবর্তী যুগে কর্মবীর বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের মতো প্রতিশ্রুতিশীল কয়েকটি প্রতিভা বাংলার বৌদ্ধ সমাজ লাভ করে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলনে ভিক্ষুরা মুখ্য ভূমিকা নিলেও গৃহীদের মধ্যে কয়েকজনের অবদান অবিস্মরণীয়। এই গৃহীদের মধ্যে আবুরখিলের ধর্মরাজ পণ্ডিতের অবদান সর্বোচ্চ। তিনিই একমাত্র গৃহী যিনি ত্রিপিটক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভের জন্যে সর্বপ্রথম লঙ্কা ও শ্রীলঙ্কা দেশে গমন করেন। তাঁর রচিত ভিক্ষু বিনয় সংক্রান্ত বাংলা ভাষায় প্রথম পিটকীয় গ্রন্থ “উবুত শীল পাতিমোক্খ” এবং থেরবাদী আদর্শের ধর্ম গ্রন্থ ‘হস্তসার’ বাংলার বৌদ্ধদের ধর্মীয় জীবনে যুগান্তকারী অবদানের দাবীদার। তেমনিভাবে যুগান্তীত অবদান রেখেছেন- বৌদ্ধ কবি সর্বানন্দ বড়ুয়ার রচিত শ্রী শ্রী বুদ্ধ চরিতামৃত, ডাক্তার রামচন্দ্র বড়ুয়ার অভিধর্মার্থ সংগ্রহ, প্রভৃতি গ্রন্থ। সমাজ-সংগঠনের ক্ষেত্রে ডাক্তার ভগীরত, কৃষ্ণনাজির, কালীকিষ্পর মুৎসুদ্দি, উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি প্রমুখ ব্যক্তিদের অবদান অনস্বীকার্য।

উপসংহারে বলা যায়, ঊনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশ রাজত্বের আশীর্বাদ রূপে সমগ্র বাঙ্গালীর জীবনে ইউরোপীয় ভাবধারায় যে সব জাগরণের প্লাবন বয়ে যায় তার ঢেউ বাংলার বৌদ্ধ সমাজকেও আন্দোলিত করে। যুগ পরিবর্তনের এই সুবর্ণ মুহূর্তে আরকানের সংঘরাজের আবির্ভাব যেন মণি কাঞ্চন সংযোগ। সেই ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ফল স্বরূপ- বাংলার বৌদ্ধ সমাজে উপোসথ ব্রত, বর্ষাব্রত, কঠিন চীবর দান, সংঘদান, বৈশাখী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা প্রভৃতি প্রকৃত বৌদ্ধ আচার কৃষ্টির প্রবর্তন করা হা। ফলে তান্ত্রিক ও পৌরাণিক আচার ও ধর্ম বিশ্বাস রূপ সহস্র বর্ষের আবর্জনা পরিত্যাগের মাধ্যমে বাংলার বৌদ্ধ সমাজ শিক্ষায়-দীক্ষায়, আচারে-সংস্কারে পুণঃ একটি প্রগতিশীল মার্জিত রুচি সম্মত সম্প্রদায় রূপে নব জন্ম লাভ করে।

৪। বিংশ শতাব্দীতে বাংলার বৌদ্ধদের ধর্ম ও সমাজ জীবনের অগ্রগতিতে যাদের অবদান উল্লেখযোগ্য তাঁদের নামোল্লেখ কর।

উঃ বাংলার বৌদ্ধ সমাজে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে যে নব জাগরণ শুরু হয় তা ছিল মূলতঃ ধর্ম ও সমাজ ভিত্তিক। বিংশ শতাব্দীতে পদার্পণ করে তা আরো ব্যাপক এবং বিচিত্র খাতে প্রবাহিত হয়। তাই এ যুগের কৃতি পুরুষদেরকে নিম্নোক্ত কয়েক শ্রেণীতে বিভক্ত করতে হয়। এর আগে উল্লেখ করতে হয় যে, ঊনবিংশ শতাব্দীর কয়েকজন দীর্ঘজীবী প্রতিভাবান বিংশ শতাব্দীর বুকেও উল্লেখযোগ্য

অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন। আমরা একে একে সকলের কথা উল্লেখ করবো।

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ্বে যারা বিভিন্ন ভাবে ধর্ম ও সমাজে অবদান রাখতে সক্ষম হয়েছেন তাঁদের মধ্যে-

১। ধ্যান সাধনার ক্ষেত্রে : আনোয়ারার আচার্য প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির (পণ্ডিত ঠাকুর), হাটহাজারী জোবরার ঋদ্ধিবন্ত গোবিন্দ ঠাকুর, গুমানমর্দনের বিদর্শনাচার্য রাজেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দী, আর্যপুরুষ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, সংঘরাজ ধর্মানন্দ মহাস্থবির, ধৃতঙ্গশ্রেষ্ঠ আর্যবংশ মহাস্থবির, বিদর্শনাচার্য সুমনাচার মহাস্থবির, আর্যপুরুষ ধর্মবিহারী স্থবির (প্রভাত বড়ুয়া) প্রভৃতির নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।

২। ধর্ম ও সমাজ সেবার ক্ষেত্রে : পুরাতত্ত্ব বিশারদ জগৎ চন্দ্র মহাস্থবির (উনাইনপুরা), কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির, কোলকাতা সংস্কৃত ও পালি শিল্প বোর্ডের প্রথম বিনয় বিশারদ মুনিন্দ্রপ্রিয় ভিক্ষু ও কর্মবীর গুণালঙ্কার মহাস্থবির (জোবরা), ধর্মবংশ মহাস্থবির (চট্টগ্রাম শহর), আগরতলার রাজগুরু আর্যমিত্র মহাস্থবির, সংঘরাজ অভয়তিষ্য মহাস্থবির, উমেশা মুৎসুদ্দী, রাসুনীয়ার পরিব্রাজক গান্ধী ভিক্ষু ভারতীয় সংঘরাজ পণ্ডিত ধর্মাধার সমৃথ কর্মবীর বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির কালগত ব্যক্তিগণ বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ্বে ও মধ্যভাগে ধর্ম প্রচার ও সংস্কারের কাজে যথেষ্ট অবদান রাখেন।

৩। ধর্ম ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে : এ ক্ষেত্রে যিনি শীর্ষস্থানের দাবীদার তিনি হলেন বঙ্গীয় বৌদ্ধ মিশন ও প্রেস (রেঙ্গুন) এর প্রতিষ্ঠাতা, বাংলার বৌদ্ধকুল রত্ন অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির। তিনি রেঙ্গুনে ও আকিয়াবে প্রচার মিশনের মাধ্যমে বিহার ও প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন। শিষ্যমণ্ডলীকে নিয়ে সংঘ শক্তি নামক একটি মাসিক পত্রিকা পরিচালনার মাধ্যমে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে এক বিরাট সাহিত্যিক গোষ্ঠীর জন্মদান করেন। শুধু তাই নহে সমগ্র ত্রিপিটককে বঙ্গ ভাষায় অনুবাদ করার মতো এক মহান লক্ষ্যকে সামনে রেখে তিনি স্ব হস্তে ছোট বড় প্রায় শতাধিক পুস্তক রচনা ও প্রকাশনা করেন। ধর্ম ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে এর পরে অবদান স্বীকার করতে হয় 'জগজ্জোতি' বৌদ্ধবন্ধু প্রভৃতি মাসিক পত্রিকার পরিচালনা মণ্ডলীদের এবং 'যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক প্রচার ট্রাস্ট', রাজেন্দ্র ত্রিপিটক প্রকাশনী প্রভৃতি সংস্থার প্রতিষ্ঠাতাদের।

এ সময়কালের মধ্যে পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ স্থবিরের বিনয় পিটকের মহাবর্গ 'বুদ্ধের অভিযান' বাংলার গৌরব, এশিয়ার প্রখ্যাত দার্শনিক ডঃ বেনীমাধব বড়ুয়ার 'মধ্যম নিকায়' ১ম খণ্ড, 'বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি' ও 'বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধদের অবদান'- প্রভৃতি গ্রন্থ ও নানা তত্ত্বমূলক প্রবন্ধের প্রকাশনা বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদীর- 'অভিধর্মার্থ সংগ্রহ' 'উপোসথ সহচর' রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবিরের 'দীর্ঘ নিকায় (শীলস্কন্ধ)', 'মহাপরিনির্বাণ সূত্র' ত্রিপিটকাচার্য-বংশদ্বীপ মহাস্থবিরের পালি ব্যাকরণ 'বালাবতার' 'কচ্চায়ন' ব্যাকরণ ভিক্ষু বিনয় 'প্রাতিমোক্ষ' এবং আর্যপুরুষ জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের 'পালি প্রবেশ' এবং ভাবগত সাহিত্য রচনায়-সাহিত্যিক অশোক বড়ুয়া, প্রখ্যাত বৌদ্ধ সাহিত্যিক শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ডঃ দীপক বড়ুয়া, ডঃ সুকোমল চৌধুরী প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

উপরোক্ত ধর্ম ও সমাজ হিতৈষী ব্যক্তিবর্গের যৌথ ও একক প্রচেষ্টায় বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে ধর্ম-ভিত্তিক এক বিরাট সাহিত্য সমাজ গড়ে উঠেছিল বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে। এরপরে সেই যুগেরই সৃষ্টি, আরো যারা বিংশ শতাব্দীর শেষার্ধ্বে পর্যন্ত ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের ক্ষেত্রে অবদান রাখছেন এবং আরো নতুনের সংযোজনে এই প্রবাহ ব্যাপক ও বৈচিত্র্যতা লাভ করেছে তাঁদের অবদানের বিষয় নিম্নে উল্লেখিত হল-

১। ধ্যান সাধনার ক্ষেত্রে- ভিক্ষুদের মধ্যে সাধক অতুল্যানন্দ মহাস্থবির (বার্মা), বিদর্শনাচার্য বিশুদ্ধাচার, ডঃ রাষ্ট্রপাল, অখিল ভারতীয় সংঘনায়ক সাধক আনন্দমিত্র মহাস্থবির, সাধক শ্রেষ্ঠ সাধনানন্দ মহাস্থবির (বনভন্তে), বিদর্শনাচার্য প্রজ্ঞাজ্যোতি স্থবির (রামু), বিদর্শনাচার্য জ্ঞানজ্যোতি স্থবির (শিলিগুরী), বিনয়ানন্দ স্থবির (কাঞ্চনপুর ত্রিপুরা) এবং সাধনমিত্র ভিক্ষু (পার্বত্য চট্টগ্রাম)।

আন্তর্জাতিক মানের বিদর্শনাচার্য অনাগারিক মুনিদ্রাজী, আন্তর্জাতিক মানের বিদর্শনাচার্য সাধিকা ননীবালা (কলিকাতা), সাধিকা বাবুলের মা (রাঙ্গানীয়া); বিদর্শনাচার্য বুদ্ধরক্ষিত স্থবির (কোলকাতা), বিদর্শনাচার্য দিকপাল মহাথেরো (কোলকাতা), বিদর্শনাচার্য ডাঃ প্রিয়নাথ বড়ুয়া ও রুনা বড়ুয়া, সাধক যোগাসিদ্ধি স্থবির (রাঙ্গামাটি), সাধক বিশুদ্ধানন্দ স্থবির (রাঙ্গামাটি), সাধক ধর্মতিষ্য স্থবির (রাঙ্গামাটি); আর্যপুরুষ শীলানন্দ স্থবির (খাগড়াছড়ি),

ধর্ম ও শাসনিক ব্রতে যাদের নাম উল্লেখযোগ্য : ভদন্ত ধর্মপাল মহাথেরো (কোলকাতা), ভদন্ত ধর্মবিরিয়া, ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মহাথেরো (ঢাকা), ভদন্ত সুগতানন্দ মহাথেরো (গুজরা) ভদন্ত রাষ্ট্রপাল মহাথেরো (বুদ্ধগয়া), ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো (গহিরা শান্তিময়), সংঘরাজ জ্যোতিপাল মহাথেরো, ভদন্ত শীলভদ্র থেরো, ভদন্ত ধর্মরক্ষিত মহাথেরো, উপসংঘরাজ জ্ঞানশ্রী মহাথেরো, রাজগুরু অগ্রবংশ মহাথেরো (রাঙ্গামাটি), ভদন্ত নন্দপাল মহাথেরো, ভদন্ত প্রজ্ঞালংকার মহাথেরো (খাগড়াছড়ি), ভদন্ত ভৃগু থেরো (মারিশ্যা), ভদন্ত

শাসনরক্ষিত থেরো (পানছড়ি), ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো (রাঙ্গামাটি), ভদন্ত বিমলতিষ্য মহাথেরো (কোলকাতা), ভদন্ত শঙ্কালংকার মহাথেরো (রাঙ্গামাটি), ভদন্ত তিলোকনন্দ মহাথেরো (মারিশ্যা), ভদন্ত উ পঞ্ঞাজোতা থেরো (বান্দরবান), ভদন্ত করুণাশাস্ত্রী (আসাম), ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দ মহাথেরো (শিলিগুড়ি), ভদন্ত ডঃ সত্যপাল মহাথেরো (দিল্লী), ডঃ জিনবোধি থেরো (চট্টগ্রাম), ডঃ জ্ঞানরত্ন (জাপান), ডঃ শরণপাল থেরো (অষ্ট্রেলিয়া); ডঃ ধর্মানন্দ থেরো (আমেরিকা); ভদন্ত শাসনরক্ষিত থেরো (মহাপরিচালক বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ কেন্দ্র), (মিজাপুর); প্রমুখ আরো অনেক দীপ্তিমান ভিক্ষু ও গৃহী সংঘ।

এ পর্বে মহান ত্রিপিটক ও বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে যাদের উজ্জল অবদান অনস্বীকার্য তাঁরা হলেনঃ- ভদন্ত শান্তরক্ষিত মহাথেরো, সত্যপ্রিয় মহাথেরো, ভদন্ত ধর্মরক্ষিত মহাথেরো (কুমিল্লা), ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো, ডঃ সুকোমল চৌধুরী, ভদন্ত বুদ্ধ বংশ ভিক্ষু, ভদন্ত করুণা বংশ ভিক্ষু, অধ্যাপক সুমঙ্গল বড়ুয়া, ডঃ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, ডঃ সুনীথানন্দ ভিক্ষু, ভিক্ষু প্রজ্ঞাদর্শী, ডঃ ধর্ম কীর্তি থেরো, ডঃ বর সম্বোধি থেরো, ডঃ প্রণব কুমার বড়ুয়া, মি. প্রকাশ দেওয়ান, সুদর্শন বড়ুয়া, ডঃ সীতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, প্রমুখ আরো অনেক প্রতিভাদীপ্ত ভিক্ষু ও গৃহী সংঘ।

সমাপ্ত

বিবিধ পর্যায়

বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম এবং প্রকৃত শিক্ষা

অতীতে যেমন ছিল বর্তমান বিশ্বেও ঠিক তেমনটি হচ্ছে বুদ্ধকে নিয়ে। ভাববাদীদের কাছে বুদ্ধের এবং তাঁর শিক্ষা উপদেশের উপর অলৌকিকত্ব আরোপের প্রবণতা যেমন বিশেষ ভাবে লক্ষণীয়; অপরদিকে বস্তুবাদী বা বাস্তববাদীদের কাছে বুদ্ধকে রক্ত-মাংসের মানুষটিতে ধরে রেখে তাঁর মানবিক গুণাবলীর উপস্থাপনা। এবং তার শিক্ষার যুক্তি-উপমা গুলোকে যুক্তি ও বাস্তবতার উপর দাঁড় করানোর প্রবণতা সবিশেষ লক্ষণীয়। ভাববাদীদের অন্তরে আছে বুদ্ধের রাজ্য, ধনজন, স্ত্রী, পুত্র এ সকল ত্যাগের অপার মহিমার প্রতি অগাধ ভক্তি, এবং বুদ্ধ জীবন কাহিনীর সাথে জড়িত তাঁর জন্ম-জন্মান্তরের পারমী পূরণে জাতকাবলীর কাহিনী আর বর্তমান জন্মে ভূমিষ্ট হতে মহাপরিনির্বাণ পর্যন্ত খুঁজে পাওয়া অলৌকিক শক্তির পরিচায়ক ঘটনা গুলোর প্রতি ও আছে অতিশয় গুরুত্ব প্রদান ও তদগত বিশ্বাস। এই ভক্তি ও বিশ্বাসের উপর কোন কোন সময়, তারা বাস্তব বাদীদের যুক্তির সূত্র আবিষ্কার করতে পারলে উৎফুল্ল বোধ করেন। কিন্তু তাতে ভক্তের ভাবের গদগদ অবস্থার জোয়ারে একটু টান ধরে। তাই তাঁরা অতসব যুক্তির কচ্কচিতে অরুচি ভোগ করে করে সময় নষ্ট করার চেয়ে, পরকালে ধনী, শ্রেষ্ঠীদের ঘরে জন্ম বা অপার স্বর্গ সুখের প্রত্যাশায় দান-ধর্ম, শীল-ভাবনাদি সহ যত পারা যায় বেশী বেশী করে পূজা-অর্চনা, কাতর প্রার্থনা ইত্যাদির মাধ্যমে ভাবের জোয়ারে ভেসে যাওয়াকেই বুদ্ধিমানের কাজ মনে করেন।

এ-তো গেল প্রাচীনপন্থী ভক্তিবাদের কথা। মহাযানী নব্য ভক্তিবাদ কিন্তু এতবিশাল সিন্ধুতে পরিণত হয়ে গেছে যে, সেখানে ‘ইহ জীবনেই নির্বাণ-লাভের পন্থা প্রদর্শক’ সেই মানুষী বুদ্ধের কায়া ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হয়ে, বিরাটকায় বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের প্রশস্ত কপালের ঠিক মাঝখানে একটি যৎসামান্য টিপে পরিণত হয়ে গেছে। অতএব, নির্বাণগামী বুদ্ধ তাঁদের কাছে আর মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নহে। সহস্র কোটি রূপে অধিষ্ঠিত মহান বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বরের অসংখ্য স্বরূপ হিন্দু শ্রীকৃষ্ণের মতো যুগে যুগে আবির্ভূত হবেন, এই গল্প তারাবেশ ভালো করেই তৈরী করে নিয়েছেন। অসংখ্য দেব-দেবীর সাকার মূর্তি গুলোর উপাসনা এবং আশীর্বাদ ধন্য হতে পারাটাই এখন মহাযান পন্থীদের কাছে সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আবার ভক্ত সরাসরি এসকল দেব-দেবীর সান্নিধ্য পাওয়ার উপায় মোটেই নেই, যতক্ষণ না তারা মাধ্যম হিসেবে অতিশয় কাম ভোগী, অথবা বিস্ত ভোগী কোন মানুষী গুরুর নিকট দীক্ষা-নিয়ে আপন দেহ-মন ও ধন-সম্পদ সমর্পন না করেন। অতএব হিন্দু ব্রাহ্মণদের ব্যবহার্য সেই মোক্ষম অস্ত্র, ‘গুরুহি পরমং তপঃ- গুরুতেই সব কিছু; ধর্ম, অর্থ, কাম-মোক্ষ, যশ-কীর্তি সবই পাওয়া যায়, এই পরম গুরু- সেবাতে। বৌদ্ধ নাম ধারী মহাযানী এসকল ক্রিয়াকাণ্ড এভাবেই শেষ পর্যন্ত ব্রাহ্মণের উদরে গিয়েই ঠাঁই নিল।

‘তথাগত বুদ্ধের শিক্ষা কি’ এ প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে গেলে বুদ্ধ ও তাঁর শিক্ষাকে ভাববাদের দৃষ্টিকোণ থেকে তুলে ধরা অন্যায় হবে। কারণ, সত্য অনুসন্ধিসুদের কাছে এদিকটি বুদ্ধের শিক্ষায় তেমন গ্রহণ যোগ্য নহে। তথাগত বুদ্ধ, আমাদেরই মতো রক্ত-মাংসে গড়া একজন মানুষ। তিনি অনন্য সাধারণ উদ্যম, প্রচেষ্টা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞানের চরম উৎকর্ষতায় এক পরম সত্যের সন্ধান পেয়েছেন; যেই সত্য অধিগমে যে কোন মানুষ জীবন-দুঃখের চির অবসান ঘটাতে সক্ষম। যুক্তি ও বাস্তব বাদীদের এই দৃষ্টিকোণ থেকেই বুদ্ধের জীবন ও বাণীকে তুলে ধরা হলে। মানুষী বুদ্ধের মহান শিক্ষার সাথে যেমন অকৃত্রিম পরিচয় লাভের সৌভাগ্য হবে; একই সাথে বুদ্ধ শিক্ষার আলোকে নিজেকে নিজে আত্ম-জিজ্ঞাসায়, আত্ম-অনুসন্ধানে রত হলে স্বীয় জীবনের বহু মানসিক ও শারিরীক সমস্যার সমাধানে ও আপনি সক্ষম হবেন নিশ্চিত ভাবে। বুদ্ধ জ্ঞানের মাধ্যমে আত্ম-জিজ্ঞাসায় সমুৎসাহী ব্যক্তির চরিত্রও মননশীলতায় এক অভাবনীয় পরিবর্তন ঘটে যায় নিজের অজান্তেই। ক্রুর-দুর্দর্ষ প্রাণঘাতক পর্যন্ত মহাপ্রাণ মহাদয়াবান হয়ে যায় অনায়াসে বুদ্ধের শিক্ষা-উপদেশ নামক পরশ পাথরের পরশে, তার অধ্যয়ন ও মননশীলতায় এবং আপন আত্ম জিজ্ঞাসার মাধ্যমে।

বুদ্ধের অধীত সত্য এবং তাঁর শিক্ষাকে কি ভাবে তুলে ধরা উচিত, তার একটি পরিচয় এখানে তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করি। যেমন-

যারা সত্যের অনুসন্ধান করেন তাদের কাছে ‘সত্যটা’ কোথেকে আসলো, বা কে বললেন, তা গুরুত্বপূর্ণ নহে। কোন্ ধ্যান-ধারণার উৎস বা পর্যায় থেকে সত্যটা প্রকাশিত হলো তা-ও তাত্ত্বিক বিষয় মাত্র। কিন্তু যেটা প্রয়োজন, তা হলো বিষয় বস্তুটাকে সম্যক্ দৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে তার প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচন করার মাধ্যমে সত্যকে দর্শন করা।

সত্যের পরিচয়ে খৃষ্টান, মুসলিম, হিন্দু, বৌদ্ধ এরূপ কোন মোড়কের প্রয়োজন হয় না। কোন ব্যক্তি জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের একছত্র আধিপত্যের কোন দাবী থাকতে পারে না, সত্য-উপলব্ধির ক্ষেত্রে। যেমন, শিশুর প্রতি মায়ের আপত্য স্নেহটিকে কোন জাতি বা সম্প্রদায় বিশেষের মোড়কে আবদ্ধ করা যায় না, পরিচয় দেয়ার প্রয়োজন ও হয় না। সত্য ও ঠিক তেমনি স্থূল মোড়ক বিহীন বাণী-চিরন্তনী রাজ্যেরই বাসিন্দা।

কোশল রাজ্যের অন্তর্গত কেশ পুত্ত নামক ছোট্ট নগরের বাসিন্দাগণ কালাম নামে অভিহিত। একদিন বুদ্ধ তথায় উপস্থিত হলে নগরবাসী অভিযোগ করলেন, এ নগরে যে সকল ধর্ম প্রচারকগণ আসেন তাঁদের প্রত্যেকের মধ্যে দেখা গেছে, তাঁরা তাদের নিজস্ব মতবাদকে প্রধান্য দিয়ে অন্য সবকে হীন, তুচ্ছ, পরিত্যাজ্য বলে যুক্তি দিয়ে থাকেন। এতে নগরবাসীর মধ্যে এই মানসিক-দ্বন্দ্ব-দেখা দিয়েছে যে, আসলে কোন্ দলের মতবাদ সত্য, আর কোন্ দলেরটা মিথ্যে। ভগবান এই বলে তাদের এহেন দ্বন্দ্ব নিরসন করলেন-

“হে কালামগণ! কোন ধর্ম বা দার্শনিক মত, তা যত বড়ো পণ্ডিত বা দার্শনিকেরই হোক, যত অধিকসংখ্যক লোকের দ্বারা সম্মানিত ও আচরিত হোক, এমন কি তোমাদের পিতা, পিতামহ পরম্পরা আচরিতই হোক না কোন, ততক্ষণ তা সত্য বলে গ্রহণ করবে না, যতক্ষণ ঐমত তোমাদের বিবেক-বুদ্ধি দিয়ে যাচাই করে তার সত্যাসত্য নির্ণয় করতে পারনি।”

এই সত্য নির্ণয়ে ভিক্ষুগণের প্রতি বুদ্ধ উপদেশ দিতে গিয়ে বলেন, “হে ভিক্ষুগণ! তোমাদের পক্ষে তথাগতের বিষয়ে পরীক্ষা করা কর্তব্য, তিনি কি সত্যই সম্যক্ সম্বুদ্ধ; না-কি নহেন। তা বিশেষ ভাবে জানার জন্যে তথাগতের প্রকৃত স্বরূপ অন্বেষণ করবে।”

মহামতি বুদ্ধ সত্যের এই নিখাঁত সন্ধানে শুধু যে মুক্ত-চিন্তার স্বাধীনতায় বিশ্বাসী ছিলেন তা নয়, অধিকন্তু অন্যের মতাদর্শের প্রতি ও সহিষ্ণুতা, উদারতায় ছিলেন অদ্বিতীয়। বুদ্ধ জীবনে এজাতীয় অসংখ্য ঘটনার মধ্যে নালন্দার তৎকালীন ধনকুবের উপালীর কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যেতে পারে। সেই উপালী ছিলেন জৈন ধর্মের প্রবর্তক মহাবীরের ‘কর্ম-বাদের’ একান্ত অনুরাগী। মহাবীর উপালিকে এই বলে নির্দেশ দিলেন যে, তিনি যেন গৌতমের নিকট উপস্থিত হয়ে গৌতম প্রচারিত ‘কর্মবাদ’ কে খণ্ড-বিখণ্ড, চূর্ণ-বিচূর্ণ করে আসেন। কিন্তু, তর্ক শেষে ফল দাঁড়ালো উপালি বুদ্ধে কর্মবাদকে মনে প্রাণে গ্রহণ করে পূর্ব মত ত্যাগ পূর্বক বুদ্ধের তদ্রূপ উপাসকত্ব গ্রহণ করতে বার বার অনুরোধ জানাতে লাগলেন। উপালীর ঐকান্তিক আগ্রহে বুদ্ধ তাঁকে ত্রিরত্নের উপাসক রূপে গ্রহণ করলেও বলে দিলেন, আজ থেকে উপালী বুদ্ধের, তাঁর প্রচারিত সদ্ধর্মের এবং তৎ প্রতিষ্ঠিত সংঘের উপাসকত্ব গ্রহণ করলেও তিনি যেন কোন কারণে তার পূর্ব গুরু মহাবীর ও তৎ শিষ্যগণের অশ্রদ্ধা, অসম্মান, অগৌরব প্রদর্শন না করেন।

বুদ্ধ শিক্ষার এই উদার মহনীয়তা গুণেই এমতবাদের প্রাচারে বিগত আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে বুদ্ধ ধর্মের কারণে বিন্দুমাত্র রক্তপাত ঘটানোর প্রয়োজন হয়নি, অপরকে এই মহান ধর্মের অনুরাগী করে তুলতে। বুদ্ধের এই উদার নৈতিক শিক্ষাদর্শের মূর্ত প্রতীক সম্রাট অশোকের শিলা-লিপিতে এই ধর্মের মর্মবাণী ঠিক এভাবেই উৎকীর্ণ রয়েছে, হাজার হাজার বছর ধরে-

“শুধুমাত্র নিজ ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করে, অন্যের ধর্মকে নিন্দা করা উচিত নহে। বরং প্রত্যেকে অপরের ধর্মকেও সম্মান প্রদর্শন করা উচিত। অন্য ধর্মকে সম্মান প্রদর্শন করলে, সে যেমন নিজ ধর্ম বিস্তারে সহায়তা করে থাকে; একই সাথে অন্য ধর্মের প্রতিও তার সহায়তার হাত প্রসারিত করা সহজ হয়। অন্যথায় সে শুধু অন্য ধর্মের ক্ষতিই করে না, উপরন্তু নিজ ধর্মেরও গুরুতর ক্ষতি সাধন করে থাকে।” (অশোক শিলালিপি- XII)

বুদ্ধের শিক্ষা কি ও কেন?

বুদ্ধ ইন্দ্রিয় ‘সুখ সম্পর্কে তিনটি বিষয়ে সকলের স্বচ্ছ ধারণা রাখতে বলেছেন। তা-এই; ১. আকর্ষণ, আসক্তি ও উপভোগ (আসুসদ), ২. এসবের পরিণতি ঝুঁকি, অতৃপ্তি, অসন্তুষ্টি (আদিনব), ৩. এসব থেকে মুক্তির উপায় মোক্ষ (নিস্‌সরণ)।

বুদ্ধের ধর্ম দুঃখবাদ বা আশাবাদ কোনটাই নহে; ইহা দুঃখ-মুক্তিবাদ বা দুঃখের নিস্‌সরণ। এই ‘দুঃখ’ শব্দের ধারণাকে তিন ভাবে দেখা যেতে পারে; যথা- ১. দেহ ধারণে সাধারণ ভোগান্তি জনিত দুঃখ, (পঞ্চক্‌খ-দুঃখ), ২. পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট দুঃখ (বিপরিণাম দুঃখ), ৩. হেতু প্রত্যয় তথা কার্য-কারণে সৃষ্ট দুঃখ (সজ্জার-দুঃখ)।

কিছু কিছু ব্যক্তি এক মহাদ্রাস্ত ধারণার বশবর্তী হয়ে বলে থাকেন, বৌদ্ধ জীবন বিধান হলো বিষাদপূর্ণ ও দুঃখময়। অথচ সত্যিকার অর্থে বৌদ্ধ জীবন বিধান হলো অত্যন্ত সুখী ও দুঃশ্চিন্তা-মুক্ত জীবন বিধান। বৌদ্ধেরা যেহেতু সবকিছুকে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে অবলোকন করেন, সেহেতু তারা শঙ্কা এবং দুঃশ্চিন্তা মুক্ত থাকতে পারেন; স্থির এবং শান্ত থাকতে পারেন; কোন পরিবর্তন ও বিপর্যয়ে বিচলিত বা হতাশ তারা হন না। তাই বুদ্ধ এবং অরহতগণকে, কেহ কোন দিন বিষন্ন ভাবে দেখতে পাননি। তাঁদের সদা স্মিত-হাস্যের প্রসন্ন আননকে সদ্য বোটা-মুক্ত পক্ষ-তালের মুখের মতো উজ্জ্বল বলে উপমিত করেছেন, বিজ্ঞজনেরা।

এই জীবনে যদিও দুঃখের অন্ত নেই; তবু বুদ্ধের আশ্রিত যারা তাঁদের পক্ষে অধৈর্য, রাগান্বিত কিংবা বিষন্ন হওয়া উচিত নহে। বুদ্ধের মতে মানব জীবনের প্রধান খারাপ দিক হচ্ছে ‘বিষাদ-ভাব’ বা ঘৃণা (প্রতিঘা)। প্রতিঘা বা বিষাদ-ভাব বলতে প্রাণীদের জীবনে দুঃখ এবং দুঃখ-সংশ্লিষ্ট উপাদান ও কু প্রবৃত্তি সমূহকে বুঝায়। বিষাদ থেকেই অতৃপ্ততা ও মন্দ-চরিত্রের উদ্ভব হয়। তাই দুঃখ যাতনায় অধৈর্য হওয়া উচিত নহে। অধৈর্য, রাগান্বিত হলে দুঃখ প্রশমিত হওয়া দূরে থাক, পরন্তু যন্ত্রণাই বাড়ে, ভোগান্তির মাত্রা বাড়ায়, পরিস্থিতিকে জটিলতর করে। এমন পরিস্থিতিতে যা খুবই প্রয়োজন তা হলো সংগঠিত দুঃখটি উৎপত্তির কারণ সন্ধান করা। ধৈর্য, প্রজ্ঞা, বীর্য পরাক্রম ও দৃঢ়তার সাথে সমস্যাটি হতে মুক্তির চেষ্টা করা।

এমন প্রশ্ন প্রায় উত্থাপিত হয়ে থাকে ‘জীবনের শুরু আছে কি-না?’। বুদ্ধের মতে ইহা অচিন্তনীয় ব্যাপার। জীবনের স্রষ্টায় বিশ্বাসীরা বুদ্ধের এই বাক্যে বিস্ময় বোধ করবেন, নাস্তিক বলবেন। কিন্তু, সেই জনকে যদি প্রশ্ন করা হয় “ঈশ্বরের শুরু কোথেকে?” তিনি নিশ্চিন্তে উত্তর দেবেন- ‘ঈশ্বরের কোন শুরু নেই’। কথাটি বলতে কিন্তু, তার মধ্যে বিস্ময়ের কোন চিহ্ন পাওয়া যাবে না।

বুদ্ধ অচিন্তনীয় এই জীবনের শুরুকে চক্রবৎ ঘূর্ণায়মান একটি বিশেষ অবস্থার মাধ্যমে প্রতীকি রূপে প্রকাশ করতে গিয়ে কার্য-কারণ সূত্রে ‘অবিদ্যা’ বা অজ্ঞতাকে আদিতে স্থাপন করেছেন- একারণেই। যতক্ষণ পর্যন্ত অজ্ঞতা প্রসূত তৃষ্ণা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা দ্বারা তাড়িত হয়ে এই জীবন চক্র ঘুরতে থাকবে, ততক্ষণ জীবনের শুরু কোথায় চিহ্নিত করা অসম্ভব। অবিদ্যা বা অজ্ঞতাকে প্রজ্ঞার তীব্র আলোয় উদ্ভাসিত করে অপসৃত করতে পারলেই, জীবনের শুরু এবং শেষ অবলোকন করা যায়।

তৃষ্ণা হলোঃ লোভ জাত আকাঙ্ক্ষা, ব্যাঘ্রতা, আকুলতা, যা বিভিন্ন প্রকারে আত্ম প্রকাশের মাধ্যমে সকল প্রকারের দুঃখ উৎপাদনকারী, এবং পুণঃ জন্মের সহায়তাকারী। তবে, এই তৃষ্ণাই বলুন বা অবিদ্যাই বলুন কোনটাই দুঃখ উৎপত্তির প্রথমকারণ নহে। বুদ্ধের শিক্ষা-দর্শনে সম্ভাব্য প্রথম কারণ বলে কিছুই নেই। সবকিছুই পারস্পরিক সম্পর্ক যুক্ত, এবং পরস্পর নির্ভরশীল। সবকিছুই তাৎক্ষণিক কারণ, যা প্রতীত্য সমুৎপাদনীতিতে প্রবর্তিত হয়। তবে আমাদের এটুকুই স্মরণ রাখা যথেষ্ট যে, ‘তৃষ্ণার কেন্দ্র বিন্দু হচ্ছে অজ্ঞতা থেকে সৃষ্ট ‘আমিত্ব’ বোধ (সন্ধায় দিট্ঠি) নামক ভ্রান্ত ধারণা।

ভগবান বুদ্ধ রট্ঠপাল থেরোকে বলেছিলেন, “এই জগত অভাববোধ এবং তীব্র লালসার কারণে তৃষ্ণার শৃঙ্খলে আবদ্ধ (তণ্হাদাসো)। স্বার্থপর অভিলাসই সকল কুকর্মের জন্মদাতা।

ভবচক্রে সত্ত্বগুণের অস্থিত্ব রক্ষায় ৪টি আহারের প্রয়োজন। যেমন- ১) সাধারণ আহার্যবস্তু (কবলীক আহারো), ২) বাহ্যিক পার্থিব বস্তুর সাথে ষড়েন্দ্রিয়ের স্পর্শজ আহার (ফসেসা আহারো), ৩) সজ্ঞানতা আহার (বিঞ্ঞাণাহারো), এবং ৪) মানসিক চেতনা বা ইচ্ছা আহার (মনসঞ্চেতনাহারো)। এখানে ইচ্ছা বা মনোসঞ্চেতনা আহারটি হলো বেঁচে থাকার ইচ্ছা বা স্বর্গ-সুখাদি ভোগের ইচ্ছা। তাই ইচ্ছাশক্তির অপর নাম চেতনা। আর এই ইচ্ছা শক্তি তথা চেতনাকেই বুদ্ধ ‘কর্ম’ বলেছেন।

বুদ্ধের শিক্ষার গুরুত্ব পূর্ণ কথা হলো- দুঃখ, সে নিজেই দুঃখ সৃষ্টির কারণ, বাইরের অন্য কোন কিছু এর কারণ নহে। তাই দুঃখের মধ্যেই দুঃখের বিনাশ বা দুঃখ নিবৃত্তির উপায় ও বিদ্যমান। বৌদ্ধ বাহ্যিক কর্মতত্ত্বকে তথাকথিত নৈতিক বিচার, বা কৃতকর্মের পুরস্কার ও শাস্তি নামক বিধানের আওতা ভুক্ত করা মোটেই উচিত নহে। ইহা স্রষ্টাবাদীদের ভীতিও শাস্তনার বিষয় মাত্র। বৌদ্ধ কর্মতত্ত্ব নিয়ে এমন সিদ্ধান্ত মহা বিভ্রান্তিকর। শুধু বৌদ্ধদের জন্যে নহে, বিশ্ববাসীর জন্যে ও ‘বিচার’ শব্দটি বিভ্রান্তি কর, ও বিপদজনক। এই বিচারের নামেই মানবতার প্রতি যুগে যুগে ভালো করার চেয়ে বহু মন্দ-কুকর্ম করা হচ্ছে সবচেয়ে বেশী। বৌদ্ধ-কর্মতত্ত্ব হলো- ‘ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্ট কার্য-কারণ তত্ত্ব। এটা হলো বিশ্ব-প্রকৃতির স্বাভাবিক নীতি। তাই একাজে তৃতীয় কারো হাতের কল্পনা নিতান্তই অবাস্তব। মন্দ চৈতসিক মন্দ কর্মের বীজ উৎপন্ন করে, মন্দ ফলই প্রদান করে। একইভাবে ভালো চৈতসিক ভালোকর্মের বীজ উৎপন্ন করে, অনিবার্য ভাবে ভালো ফলই প্রদান করে থাকে। কেন তাতে তৃতীয় কোন মাধ্যমের প্রয়োজন হবে?

বুদ্ধের শিক্ষাদর্শে বিশ্বাসীকে এ বিষয়টি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সতর্কতার সাথে স্মরণ রাখতে হবে।

বুদ্ধের বিখ্যাত উক্তির মধ্যেই একথার তাৎপর্য বিদ্যমান। যথা- “যং কিঞ্চি সমুদয় ধম্মা সৰ্ব্বং তং নিরোধধম্মন্তি”।

অর্থাৎঃ যা কিছু উৎপন্ন শীল, তৎ সমুদয় নিরোধধর্মী।

কর্ম বলতে সাধারণ অর্থে কাজ বুঝায়। কিন্তু বৌদ্ধ দর্শনে ইহাকে শুধুমাত্র মানসিক চেতনা বা চৈতসিককেই নির্দেশ করে। অন্য কোন কাজকে নহে।

আমরা যাকে মানুষ বা প্রাণী বলি, আসলে তা কায়িক ও মানসিক সঞ্চরমান গতি বা কর্মশক্তির পুঞ্জীভূত রূপকে বুঝায়। আর যাকে মৃত্যু বলি তা হলো দেহের নিরুজীবতা, স্তব্ধতা, অসাড়তা। এই নিরুজীবতার সাথে সাথে কি দেহ-মনের উল্লেখিত সঞ্চরমান গতি বা কর্মশক্তি ও কি স্তব্ধ হয়ে যায়? না; ইচ্ছা, চেতনা, অভিলাস, তৃষ্ণা তখনো আশ্চর্যজনকভাবে বিদ্যমান থাকে, অবিরত থাকে, প্রচণ্ড আকাঙ্ক্ষা সহকারে এগুলো সঞ্চরমান হয়; এমন কি সমস্ত বিশ্বকে

আলোড়িত করে। এ গুলো বিশ্বে এক প্রচণ্ড গতিময়তা ও শক্তিমত্তার প্রকাশ। বৌদ্ধ ধর্ম মতে মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে এই শক্তি বা গতি স্তব্ধ না হয়ে, ক্রমবিন্যস্ত অবিচ্ছিন্ন গতিধারায় অন্যান্যরূপ পরিগ্রহ করে পুনঃ অস্তিত্বের প্রকাশ ঘটায়, যাকে বলা হয় পুণঃজন্ম।

যদি প্রশ্ন করা হয়, বৌদ্ধ দর্শনতো আত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করে না। কিন্তু ‘আত্মার’ মতো অপরিবর্তনশীল কিছু না থাকলে, অন্য কোন্ সত্ত্ব বা উপাদান পুণঃজন্ম গ্রহণে কি করে সক্ষম হয়? ‘স্রষ্টা’ ও ‘আত্মা’ নামক দৃঢ় বিশ্বাসের এই গোলক ধাঁ ধাঁ অতিক্রম করতে হলে বুদ্ধ-জ্ঞানের বাস্তব উপলব্ধি জাত এই সত্যটি বুঝতে হবে; বুদ্ধ বলেন, “হে ভিক্ষুগণ! এবিশ্বের সব কিছু প্রতি মুহূর্তে উৎপত্তি ধাবমান ও ধ্বংসের মধ্যদিয়ে এক বিশাল জন্ম-মৃত্যুর স্রোতে অতীত হতে বর্তমান, এবং বর্তমান হতে অনন্ত অনাগতের দিকে ধাবিত হচ্ছে।” শিশুর জন্ম, ক্রমিক বৃদ্ধির পূর্ণতায় যৌবন, তার পর থেকে ক্রমিক অন্তগমনে বাধক্য এবং মৃত্যুতে বিলীন একটি প্রাণীর এইদেহ মন হতে শুরু করে বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সবকিছু এভাবে উৎপত্তি এবং ধ্বংসের অধীন। বুদ্ধ উক্তির ইহাই প্রত্যক্ষ প্রমাণ।

বুদ্ধের এই মহা-ক্ষণিক বাদের সিদ্ধান্ত বর্তমানে সমগ্র বিজ্ঞান জগত তাদের অনু-বিজ্ঞানের স্বতঃসিদ্ধ বলে মেনে নিলেও, প্রাচীন পন্থী ধার্মিক ও দার্শনিকদের বোধগম্যতায় কেন পৌছবে না, তা বুঝে উঠা কঠিন। ইহা একান্তই বাস্তবতা বর্জিত, আবেগ সর্বস্ব কল্পনা প্রিয়তা ছাড়া আর কিছু নহে।

শিশুর ভ্রূণ উৎপত্তির ক্রম বিন্যাসকে লক্ষ্য করলেও তো, বুদ্ধে ক্ষণিক বা অনিত্য বাদের সত্যতা নিরূপণ করা যায়। যেমন, শিশুর শরীর, মন, বুদ্ধি মস্তা এবং অপরাপর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলো শুরুতে এত ক্ষীণ দুর্বল আকারে থাকে যে, তার কিছুই সহজে বুঝা যায় না। কিন্তু, সে গুলো অতিক্ষুদ্র সেই একটি ভ্রূণের মধ্যে ও বিদ্যমান থাকার কারণেই, একটি ক্রমিক অবিচ্ছিন্ন পরিবর্তনের গতির মাধ্যমে সেই মানবীয় ভ্রূণ একদিন পূর্ণাঙ্গ যৌবন উদ্ভীষ্ট মানবে রূপ লাভ করে। শিশুর ক্রম বৃদ্ধির এই সঞ্চারমান দৈহিক বা মানসিক শক্তি একসময় পারিপার্শ্বিক ধ্যান-ধারণায় প্রভাবিত হয়ে, এক সময়ে আমি, ‘আমিত্ব’ বা ‘আত্মা’ বলে বিশ্বাস করে বসি। এই বিশ্বাস পশু-পাখীতেও যে থাকে, তা একটু অভিনিবেশ সহকারে পর্যবেক্ষণ করলে সহজে বুঝা যায়। বুদ্ধের ক্ষণিক বাদকে বুঝতে পারলে আত্মা-বিহীন প্রাণ প্রবাহের ক্রম বিন্যস্ত অবিচ্ছিন্ন এবং নিয়ত পরিবর্তন মুখী গতিশীল জন্মান্তর কে স্বীকার করে নেয়া মোটেই কষ্ট সাধ্য নহে। তবে মনে রাখতে হবে যে, যতদিন পর্যন্ত অজ্ঞানতা বা অবিদ্যা জাত তৃষ্ণা বা আশা-আকাঙ্ক্ষা বিদ্যমান থাকবে ততদিন এক অভাবনীয় পরিবর্তনের মাধ্যমে প্রাণীর জন্মান্তর চলতেই থাকবে।

পরিপূর্ণ তৈল-সলিতা যুক্ত সন্ধ্যায় প্রজ্জ্বলিত দীপ-শিখা, কিভাবে মধ্যরাত অথবা রাত্রি শেষে নিভে গেল? এটা সাধারণ জ্ঞানেও বোধগম্য। এমন কি নিভে যাওয়া শিখাটির অস্তিত্ব পর্যন্ত বিবর্তিত আকারে বিজ্ঞানের গবেষণাগারে ধরা পড়াতে, বস্তুর স্বাস্থ্য বাদকে স্থির নহে, বিবর্তিত স্বরূপের মাঝেই বিজ্ঞানকে স্বীকার করে নিতে হয়। প্রাণের জন্মান্তরকে অবিনশ্বর আত্মা-ব্যতীত, এভাবেও প্রমাণ করা যায়। সেই দীপ-শিখা প্রজ্জ্বলন মুহূর্তে যেমনটি ছিল, রাত দূপুরে কি তাই? নিভে যাওয়ার পূর্ব মুহূর্তেও কি একই? না একই নহে। তবে কি সম্পূর্ণ ভিন্ন? না সম্পূর্ণ ভিন্ন ও নহে (ন একো, ন চ অঞঞো)। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই শিখা কিছুটা পরিবর্তিত হলেও, অতীতের সাথে ইহা অবশ্যই সম্পর্কিত। যেমন নবজাত শিশু হতে বৃদ্ধ লোকটির জন্ম। অতীত থেকে বর্তমানের উদ্ভব যদি এভাবেই সম্পর্কিত হয়ে সম্ভব হয়, তাহলে বর্তমান থেকে ভবিষ্যতের উৎপত্তিতে আপত্তি কেন? বিজ্ঞান এক্ষেত্রে কি বলবেন?

নির্বাণ কি? এই প্রশ্নের উত্তর ভাষায় ব্যক্ত করার চেষ্টা বৌদ্ধ দর্শন জগতে বিগত ২৫০০ বছরের মধ্যে বিস্তর বিশালাকার ধারণ করেছে। এত চেষ্টাশ্রম সত্ত্বেও বিষয়টি বোধগম্য না হয়ে, বরং জটিল হয়ে গেছে। কারণটা কি? প্রধান কারণ মানব সৃষ্ট ভাষার অক্ষমতা। মানুষের মনের ভাব প্রকাশের সাংকেতিক বাহন এই শব্দ-সমষ্টি নামক ভাষা বর্তমানে পর্যন্ত এত দুর্বল যে, একদেশের ভাষা, অন্যদেশের মানুষের বোধগম্যতা নহেই, এমনকি একই ভাষা-ভাষী মানুষকেও তার অপরিচিত, অজ্ঞাত বিষয়টির ধারণা দিতে, এই ভাষা অনেক সময়ে লজ্জাজনক দুর্বলতার পরিচয় দিয়ে থাকে। তাই ‘নির্বাণের’ মতো এত গম্ভীর, দূরাধিগম্য অতিমানবীয় অশরিরী চিন্তা-ভাবটি, কি ভাবে মানুষের দুর্বল ভাষা যথার্থ ভাবে প্রকাশে সক্ষম হবে? স্বয়ং বুদ্ধ, যিনি এই নির্বাণের অচিন্ত্যনীয় শান্তি-সুখে দিবা-রাত্র অবগাহণ করতেন, তিনি ও বলেছেন, এই নির্বাণের স্বরূপ ভাষায় বর্ণনায় যথায়থ প্রকাশ করা অসম্ভব। ইহা নিতান্তই যার যার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় উপলব্ধির বিষয়। যিনি সেই প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অভিজ্ঞ, কেবল তিনিই মানসিক এই অবস্থাটি নিজে উপলব্ধি করতে পারতেন; এবং কি ভাবে আয়ত্ত্ব করা যায়, তার উপায়টি অন্যকে বলে দিতে পারবেন, পথ দেখিয়ে দিতে পারবেন। তার বেশী নহে। অতএব, ‘নির্বাণ’ যাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার মধ্যে এখনো ধারণ করা সম্ভব হয়নি, শুধুমাত্র বই পড়াও চিন্তাময় জ্ঞানে তিনি তার কতটুকু নাগাল পাবেন? এই প্রশ্নটি কোন্ পর্যায়ে অসহায়ত্ব প্রমাণ করে, তা নিম্নের গল্পটি হতে ধারণা করার চেষ্টা করতে পারেন। যেমন-

এক যে ছিল কচ্ছপ। তার বন্ধু ছিল এক মাছ। একদিন মাছ কচ্ছপটি কে বুঝাতে চেষ্টা করলো যে, সে এই কিছুক্ষণ আগেই ডাঙায় অনৈক্ষণ হাঁটা হাঁটি করে এসেছে। ‘হাঁটা হাঁটি’ শব্দটা শুনে মাছ বললো ‘হাঁটা হাঁটি’ যে বলছে এটা কি? কচ্ছপ বন্ধু মাছ মহাশয়কে ‘হাঁটা’ এর মমার্থ যেমন বুঝাতে পারলো না; তেমনি পারলোনা জলের তারল্য মাটিতে নেই। নির্বাণের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাহীন ব্যক্তিকে নির্বাণের স্বরূপ বুঝাতে গেলে, ঠিক এমনই অসহায় পরিস্থিতিতে পড়তে হয়; এবং শ্রোতা বা পাঠককেও তেমন বিভ্রান্তির শিকার হতে হয়। সাধারণ চিন্তা ও যুক্তি উপমায় নির্বাণকে যার যার রুচি ও আশা-আকাঙ্ক্ষার রঙিন তুলিতেই বুঝার চেষ্টা হয়; যেমন, মাছ ধারণা করতে পারে যে, ডাঙ্গার মাটি হবে জলের মতোই তরঙ্গ বহুল কোমল পদার্থ। এতে সহজেই সাঁতার কাটা যায়, ডুব দেয়া যায়।

লঙ্কাবতার সূত্রে ভাষার এই অক্ষমতাকে প্রকাশ করতে গিয়ে বলা হয়েছে “অজ্ঞ ব্যক্তি শব্দের জটিলতায় আটকে যাওয়া, আর কাদা মাটিতে হস্তী আটকে যাওয়া, একই কথা।

নির্বাণ সম্পর্কে অনেকের এমন ভ্রান্ত ধারণা রয়েছে যে, ‘নির্বাণ’ একটি নেতিবাচক বিষয়। যেহেতু এতে ‘আত্মার’ ধ্বংস বা উচ্ছেদ ভাব প্রকাশ করে। অথচ সুস্পষ্ট ভাবে বলা যায় যে, বৌদ্ধ নির্বাণ কিছুতেই আত্মার ধ্বংস বা উচ্ছেদ বুঝায় না। কারণ, ‘আত্মা বলতে বাস্তবে কিছুই নেই; যাকে উচ্ছেদ বা ধ্বংস করা যাবে। নির্বাণ যাকে উচ্ছেদ করে, তা হলো ‘আমিত্ব’ বা অহংবোধ। ‘মোহ’ নামক ঘোর অজ্ঞতা ও প্রবল আসক্তি (তৃষ্ণা) জাত যে মিথ্যাদৃষ্টি, তথা ভ্রান্তবিশ্বাস; তারই উচ্ছেদ সাধন করে থাকে তথাগত বুদ্ধ আবিষ্কৃত এই ‘নির্বাণ’ নামক নিখাত সত্য উপলব্ধিটি।

এটা বলা ঠিক নহে যে, নির্বাণ হলো ‘না বোধক’; বা ‘হ্যাঁ বোধক’ ভাব। নির্বাণকে এভাবে আপেক্ষিক ও দ্বৈত ভাবের মধ্যে রাখা যায় না। নির্বাণ এদু’ই তত্ত্বের বাইরে একটি পরমার্থিক সত্য। নির্বাণ এর অতি নিকট প্রতি শব্দ হলো নিঃশর্ত ‘মুক্তি বা বিমুক্তি। মুক্তি নেতিবাচক শব্দ না হলেও, ইহার একটি নেতিবাচক প্রেক্ষাপট বিদ্যমান। যেমন, মুক্তি হলো সকল প্রকার মন্দ কামনা, ঘৃণা এবং অজ্ঞতা থেকে মুক্ত হওয়া।

বিষয়টির উপর আরো কিছু ধারণার জন্যে মধ্যম নিকায়ে ধাতু-বিভঙ্গ সূত্রে (১৪০ নং) নির্বাণের এই পরমার্থ সত্যের বর্ণনাটি অনুধাবন করতে পারি, যেমন-

একজন মানুষ ৬টি উপাদান দ্বারা গঠিত; যথা- কঠিনত্ব (পটবী), তরলত্ব (অপ), গতি (বায়ু), তাপ (তেজো), শূন্যতা এবং চেতনা দ্বারা গঠিত। তিনি এ গুলোকে বিশ্লেষণ করে দেখলেন যে, এগুলোর মধ্যে কোনটিতে আমার, আমি বা আমিত্বের অস্তিত্ব বা ধারণা বিদ্যমান নেই। তিনি বুঝলেন কি ভাবে চেতনার

উদয় ও বিলয় হয়, কি ভাবে সুখানুভূতি, দুঃখানুভূতি কিম্বা উপেক্ষা-অনুভূতির উদয় ও বিলয় হয়। এই জ্ঞান অনুধাবনে যাবতীয় বিষয়ে তাঁর চিন্তাক্রমে অনাসক্ত বা নিরাসক্ত হলো। তখন তিনি, তাঁর নিজের মধ্যে একটি নিগূঢ় খাঁটি অনাবিল প্রশান্তি (উপেক্ষা) ভাব অনুভব করলেন। এটাকে তিনি ইচ্ছা করলে উচ্চ আধ্যাত্মিক মার্গ লাভের পথে পরিচালিত করতে পারেন। তখন তিনি তা-ই করলেন; এবং বুঝতে পারলেন এইরূপ নিগূঢ় খাঁটি অনাবিল প্রশান্তিময় অবস্থা তার মধ্যে দীর্ঘ সময় ধরে রাখতে তিনি সক্ষম। তখন তিনি চিন্তা করলেন-

এই নিগূঢ় খাঁটি অনাবিল প্রশান্তিকে যদি অনন্ত মহাশূণ্যের ব্যাপ্তির প্রতি এবং অনুরূপ চিন্তকেও বিকশিত এবং তৎপ্রতি নিবদ্ধ করি, তাহলে সেটা হবে তার মানসিক সৃষ্টি (সংখত) কোন বাস্তব সত্য নহে।

এই নিগূঢ় খাঁটি এবং স্বচ্ছ অনাবিল প্রশান্তিকে এভাবে চিন্তের অনন্ত চেতনার ব্যাপ্তির প্রতি, অনন্ত শূণ্যতার প্রতি, অথবা না বিমুক্ত না অবিমুক্ত অনন্ত ইন্দ্রিয় উপলব্ধির ব্যাপ্তির প্রতি, বিকশিত ও তৎপ্রতি যদি নিবদ্ধ করা হয়; তাহলে সেটাও হবে মানসিক সৃষ্টি। তখন তাঁর এই মানসিক সৃষ্টি জাত চিন্তাটি এমন এক অবস্থায় বিরাজ করে যে, ইহা 'না ভব', 'না বিভব'। তাই তিনি এই তৃষ্ণা দ্বয়ের অবিরাম অনুবৃত্তি আর ইচ্ছা করেন না। সেহেতু তিনি বিশ্বের কোন কিছুই প্রতিও তখন আর আসক্ত নহেন। এমন অনাসক্ততার কারণে কোন অবস্থাতেই তিনি তখন আর বিচলিত নহেন। অবিচলতা হেতু তিনি নিজের মধ্যে নিজেই তখন এক অভাবনীয় প্রশান্ত ভাব নিয়ে অবস্থান করতে সক্ষম হন (পচ্চথং য়েব পরিনিব্বাযতি)। তখন তিনি নিজেই জানেন, তাঁর জন্মের শেষ হয়েছে, নিবৃত্তি হয়েছে, জীবন পূণ্যাত্মা হয়েছে, যা করণীয় তা কৃত হয়েছে, করণীয় আর কিছুই অবশিষ্ট নেই।

এরূপ ধারণা করা ঠিক নয় যে, তৃষ্ণা নিবৃত্তির স্বাভাবিক পরিণতি হল 'নির্বাণ'। নির্বাণ যদি কোন কিছুই পরিণতি স্বরূপ হতো, তা হলে বলতে হবে নির্বাণ কোন একটা হেতুর প্রভাবেই উৎপন্ন হয়েছে। এবং সেটাকে অবশ্যই চিহ্নিত করা হতো উদ্ভব ও ধ্বংস বা পরিণামশীল সেই মানসিক সৃষ্টি (সংখত) কে। কিন্তু, মনে রাখতে হবে, নির্বাণ কোন হেতুর ফল যেমন নহে, তেমনি কোন কিছুই পরিণতি ও নহে। ধ্যান-সমাধির ফলে যেই অতীন্দ্রিয়, আধ্যাত্মিক, মানসিক অনুভূতির সৃষ্টি হয়, নির্বাণ সেরূপ সৃষ্টি কোন বিষয় বা অবস্থা ও নহে। নির্বাণকে দর্শন করতে হলে, আপনাকে উপলব্ধি করতে হবে এবং সেই উপলব্ধির পন্থা ও বুদ্ধ কর্তৃক আবিষ্কৃত হয়েছে। ইহাই আর্য় অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা পথ। এই পথের নির্দেশিকা অনুযায়ী আপনার জীবনকে পরিচালিত করতে হবে তবেই নিরাপদে, যথাসময়ে সেই নির্বাণ আয়ত্ত্ব হবে।

রাধ-নামে এক ভিক্ষু বুদ্ধকে প্রশ্ন করেছিলেন, ‘কি উদ্দেশ্যে এই নির্বাণ?’ নির্বাণের পর আরো কিছু থাকতে পারে, এই কৌতুহল জাত এই প্রশ্ন। বুদ্ধ উত্তরে বলেছিলেন, হে রাধ! নির্বাণ নিয়ে এমন প্রশ্ন অবাস্তব। কারণ, নির্বাণ হল মহাপ্রাজ্ঞ জীবনের অনন্য সত্যে’ চূড়ান্ত পদক্ষেপ, অভিষ্ট লক্ষ্যের পরম সমাপ্তি। ‘সত্য’ কোন পরিণতি ও নহে, হেতু ও নহে। নির্বাণ পরমার্থ সত্য, পরম সত্য। তাই ইহা বাস্তব, অবাস্তব নহে। নির্বাণ বাস্তব পরম সত্য বিধায় নির্বাণের পরে আর কিছু থাকতে পারে না। যদি থাকতো, তাহলে সেটাই হতো পরম সত্য, নির্বাণ নহে।

নির্বাণ সম্পর্কে কিছু আকর্ষণীয় বাক্য আছে। কিন্তু তা অশুদ্ধবাক্য। যেমন, ‘বুদ্ধ দেহ ত্যাগের পর নির্বাণ বা পরিনির্বাণে প্রবেশ করলেন’। এই বাক্যটি কিন্তু নির্বাণ সম্পর্কে অনেক কাল্পনিক ধারণার জন্মদাতা। এসকল ধারণা নির্বাণকে একটি অস্থিত্ব সম্পন্ন মহাসুখের রাজ্য হিসেবে চিহ্নিত করে। পালিতে “পরিনিব্বাতু” শব্দটি বুদ্ধ বা অরহত গণের দেহত্যাগ বুঝায়। এটা কিন্তু কোন ক্রমেই নির্বাণে প্রবেশ করা বুঝায় না। ‘পরিনিব্বাতু’ শব্দটি সাধারণ অর্থে ‘সম্পূর্ণ নিবৃত্তি ঘটা’ ‘সম্পূর্ণ নিষ্ক্রান্ত হওয়া’ অথবা ‘সম্পূর্ণ উচ্ছেদ হওয়া’ বুঝায়। কারণ বুদ্ধ, অরহতগণ দেহত্যাগের পর আর পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন না।

অরহতগণের দেহত্যাগকে দীপ-শিখা তৈল-সলিতা বিহীন হয়ে নিভে যাওয়ার সাথে তুলনা করা গেলেও, নির্বাণিত প্রদীপ শিখাকে কিন্তু ‘দীপ শিখার নির্বাণ’ একথাটি বলা চলেনা। কারণ, ঐ দীপ শিখার উৎপত্তিতে তৈল, সলিতায় কোন একজন সংগ্রাহক এবং প্রজ্জ্বলন কারীর হাত আছে এবং তাতে কোন চিত্ত বিজ্ঞানের অস্থিত্ব ও নেই। বৌদ্ধ-দর্শনের নির্বাণ হলো, ‘পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধে’ গঠিত সেই সত্ত্ব, যা ‘নির্বাণ’ কে উপলব্ধি করে।

এখানে এই পঞ্চ উপাদান স্কন্ধের মধ্যেই রয়ে গেছে, সেই উপাদান স্কন্ধ নামক দুঃখের কারাগার থেকে মুক্তির উপায়। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধের এক বিখ্যাত উক্তির মর্মার্থ হলো- “এই সাড়ে তিন হাত পরিধির (ব্যায়ামো) দেহ-ভাণ্ড রূপ ব্রহ্মাণ্ড বা জগৎকে বলছি উৎপত্তি ও বিনাশশীল জগত এবং জগৎ নিরোধ গামিনী প্রতিপদ (মার্গ)।” এর অর্থ হলো “চারি আর্যসত্যের” অবস্থিতি হচ্ছে এই পঞ্চ উপাদান-স্কন্ধের মধ্যেই। মহাসতিপট্টান সূত্রে তাই ‘লোক’ বা জগত বলতে এই পঞ্চ-উপাদান স্কন্ধকেই নির্দেশ করা হয়েছে।

বিশ্বের প্রায় সকল ধর্মেই মৃত্যুর পরেই স্বর্গ-কিংবা নরক প্রাপ্তিকে জীবনের শেষ পরিণতি লাভ বলা হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মে জীবনের এই শেষ পরিণতি ‘নির্বাণ’ কিন্তু ইহ জীবনেই লভ্য, অনুভব্য এবং ভোগ্য বিষয়। নির্বাণকে এক্ষেত্রে ভোগ্য, উপভোগ্য পরম সুখ বললে কেহ কেহ প্রশ্ন উত্থাপন করতে পারেন।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ বা বুদ্ধের মধ্যম পন্থার আলোকে জীবন গঠনের আনুক্রমিকতা হলো- শীল, (নৈতিক চরিত্র), সমাধি (মানসিক শৃঙ্খলা) এবং প্রজ্ঞা (বুদ্ধিবৃত্তিক গুণাবলী)।

শীলের প্রথম এবং প্রধান অঙ্গ হলো সকল প্রাণীর প্রতি দয়া এবং করুণা। বুদ্ধ মতে একজন ব্যক্তি নিজেকে পরিপূর্ণ মানুষে পরিণত করতে হলে দুইটি প্রধান গুণের অধিকারী হতে হবে; যথা- অপরের প্রতি দয়া বা করুণা এবং প্রজ্ঞা তথা বুদ্ধি বৃত্তি। যদি কোন ব্যক্তি দয়াবান, কিন্তু বুদ্ধি বৃত্তির অধিকারী নহেন। এমন ব্যক্তিকে বলতে হবে হৃদয়বান বোকা। আবার কোন ব্যক্তি প্রবল বুদ্ধি সম্পন্ন, কিন্তু হৃদয়হীন। তাহলে তাকে বলতে হবে, নিষ্ঠুর বোদ্ধা। অতএব, মানবতার পরিপূর্ণ বিকাশে দয়া এবং বুদ্ধি বৃত্তি এদুই গুণের অধিকারী হতে হবে সমান ভাবে।

প্রীতি এবং করুণার উপর ভিত্তি করে বিকশিত হয় মানুষের নৈতিক চরিত্র বা শীল। এই শীলের প্রাণ প্রতিষ্ঠা এবং ক্রম-বিকাশ হয় যেই তিনটির মাধ্যমে তা হলো আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের 'সম্যক বাক্য, সম্যক কর্ম ও সম্যক জীবিকার অনুশীলন।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের পরবর্তী স্তর হলো 'সমাধি'। এই সমাধিতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে অষ্টাঙ্গিক মার্গের অপর তিনটি উপাদান যথা- সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি এবং সম্যক সমাধি।

সম্যক ব্যায়াম হলো- একান্ত প্রচেষ্টা যা মানুষের সংকর্মশক্তি সম্পন্ন উদ্যমের মাধ্যমে জীবনকে নৈতিক চরিত্রের দৃঢ় ভিত্তি লাভে একমাত্র অবলম্বন হিসেবে কাজ করে। এই সম্যক প্রচেষ্টা বা ব্যায়াম হলো- আগে থেকে অভ্যস্ত মন্দ স্বভাবকে বর্জন প্রচেষ্টা, নতুন কোন বদ অভ্যাস যাতে না হয় তার জন্যে সাবধান সতর্কতা। পূর্ব থেকে অভ্যস্ত সদ স্বভাবকে সংরক্ষণ, এবং নিত্য-নতুন সদ স্বভাব গঠনে সর্বদা উদ্যমশীল থাকা।

সম্যক স্মৃতি হলো- নিজের ও পরের দেহের অনিত্য দুঃখ, স্বভাব দর্শন। আপন ও পর মনের সুখ, দুঃখ, উপেক্ষা এই তিন অনুভূতির অনিত্য দুঃখ ও পরত্ব স্বভাব দর্শন। নিজের ও পরের চিত্ত উৎপত্তির ক্ষণস্থায়ী, দুঃখময়তা এবং পরত্ব স্বভাব দর্শন। নিজের ও পরের মনোভাব সমূহের পরিবর্তনশীলতা, দুঃখময়তা এবং পরত্ব স্বভাব দর্শন। দেহ মনের এই তিনটি লক্ষণ বা বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সর্বদা সচেতনতাকে সম্যক স্মৃতি বলে।

সম্যক সমাধি কি? ইহা মানসিক শৃঙ্খলা অর্জনের তৃতীয় তথা সর্বশেষ পর্যায়। সমাধি হলো চিত্তের স্থির-শান্ত প্রশান্ত অবস্থা। ইহার ক্রমিক উৎকর্ষতার বিভিন্ন স্তর আছে; যেমন- প্রথমে আপন মনের কুরুচি পূর্ণ লালসা, আশা আকাঙ্ক্ষা, কু প্রবৃত্তি, মনের অবসন্নতা, বিষন্নতা ও অস্থিরতা বা সন্দেহ জাতীয়

স্বভাব গুলো পরিত্যাগের মাধ্যমে মনের মধ্যে প্রীতি, সুখ ও একাগ্রতা ভাব অর্জন পূর্বক চিন্তকে প্রথম ধ্যান স্তরে প্রতিষ্ঠা দান করা।

উপরোক্ত চিন্ত-ভাব অক্ষুণ্ণ রেখে মনের যাবতীয় বুদ্ধি বৃত্তিক কর্মকাণ্ড বর্জনের মাধ্যমে চিন্তের আধ্যাত্মিক সম্প্রসাদ যুক্ত একোদি ভাব, তথা যেই বিষয়কে অবলম্বন করে চিন্তের একাগ্রতা একনিবিষ্টতা অর্জিত হয়েছে, সেই একাগ্র স্বভাবকে আরো গভীরতা দানের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক পরম প্রীতি, ও সুখানুভূতিকে স্থায়িত্ব দানের প্রভাবে ধ্যানের দ্বিতীয় স্তরে উপনীত হওয়া।

ধ্যানের তৃতীয় স্তরে সংবেদনশীল আনন্দময় অনুভূতি, ও প্রশান্তির প্রতি উৎপন্ন আসক্তি ভাবকে বর্জনের মাধ্যমে আধ্যাত্মিক বিরাগ জনিত অনাবিল প্রীতি ও অনাবিল সুখে সেই চিন্ত একটি মাত্র বিষয়ে স্মৃতিশীল জাগ্রত অবস্থায় কায়িক সুখানুভূতিতে নিমজ্জিত থাকে।

ধ্যানের চতুর্থ স্তরে সকল প্রকার অনুভূতি এমনকি সুখ-দুঃখ, আনন্দ-নিরানন্দ ভাবকেও পরিহার করে কেবলমাত্র নিগূঢ় খাঁটি চিন্তের প্রশান্তি এবং সচেতনতা বিরাজ করে।

এভাবে সম্যক ব্যায়াম, সম্যক স্মৃতি ও সম্যক সমাধি অনুশীলনের মাধ্যমে চিন্ত প্রশিক্ষিত, নিয়ন্ত্রিত ও উৎকর্ষ সাধিত হয়।

অষ্টাঙ্গিক মার্গের অপর দুই উপাদান সম্যক দৃষ্টি ও সম্যক সংকল্পকে বলা হয় প্রজ্ঞা।

সেই সম্যক দৃষ্টি হলো জাগতিক-সকল বিষয়ে বস্তুনিষ্ট জ্ঞান বা ধারণা অর্জন করা, এবং চারি আর্যসত্য নামক লোকুত্তর সম্যক দৃষ্টিকে হৃদয়ঙ্গম করা। অতএব সম্যক দৃষ্টি হলো চারি আর্যসত্য জ্ঞানের মধ্যে নিজের যাবতীয় ধ্যান-ধারণাকে সীমাবদ্ধ রেখে, লোকুত্তর দৃষ্টি শক্তির প্রজ্ঞা নামক পরম বাস্তবতায় নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করা।

বৌদ্ধ ধর্ম মতে দুই প্রকারের বোধগম্যতা বা জ্ঞান রয়েছে; একটি হলো, কোন বিষয়ে প্রদত্ত তথ্যকে নিরপেক্ষ বুদ্ধি বৃত্তি দ্বারা যাচাই-বাছাইয়ের মাধ্যমে স্মৃতিপটে পুঞ্জীভূত করা। এরূপ প্রক্রিয়াকে আমরা বলি 'তথ্যানুসারে জানা' বা (অনুবোধ)। এই জানাটা কিন্তু গভীর ভাবে জানা নহে। প্রকৃত জানা হলো অন্ত দৃষ্টি (প্রতিবেদ) দিয়ে, কোন নাম-পরিচয়হীন বস্তুর সঠিক প্রকৃতিকে প্রজ্ঞা দিয়ে হৃদয়ঙ্গম করা। ধ্যানের মাধ্যমে চিন্ত সকল কলুষতা মুক্ত হলে, তখনই কেবল এই দুর্লভ অন্তদৃষ্টি ভাব অর্জন সম্ভব হয়। সেই গভীর প্রতিবেদ বা অন্তদৃষ্টি ভাব দ্বারা তখনই সম্ভব হয়, যে কোন বিষয়ের সঠিক স্বভাব প্রকৃতি অবলোকন করা।

সম্যক সংকল্প কি? সকল প্রকারের অসৎ ও অমঙ্গল চিন্তা পরিত্যাগ করে সকল জীবের প্রতি অহিংসা, মৈত্রীভাব পোষণ, এবং সৎ বা উত্তম সংকল্প পরায়ণ হওয়া। এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যে, স্ব প্রণোদিত হয়ে আপন স্বার্থ ত্যাগ

করে অহিংসা ও মৈত্রী ভাব পোষণকে, বুদ্ধের শিক্ষায় প্রজ্ঞার শ্রেণীভুক্ত করা হয়েছে। এই অর্থে সত্যিকার প্রজ্ঞা হলো মৈত্রী ও দয়াভাবযুক্ত ঐ সকল উদার নৈতিক গুণাবলীর অধিকারী হওয়া। ব্যক্তি, সমাজ, কিংবা রাজনীতি, যা-ই বলুন না কেন; জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বার্থান্বেষী চিন্তা, কু-প্রবৃত্তি, ঘৃণা, সহিংসতা-এজাতীয় সকল প্রকার কলুষতার কারণ হচ্ছে, কারো মধ্যে প্রজ্ঞার অভাব ঘটা।

আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের এই সংক্ষিপ্ত আলোচনা হতে এ বিষয়টি অনুধাবন মোটেই কষ্টকর নহে যে, বুদ্ধের শিক্ষা উপদেশ ও ধর্ম দর্শনের প্রকৃত চরিত্র ও বৈশিষ্ট্য কি। বিশ্বের অপরাপর সকল মতবাদ ও ধর্ম দর্শনের মূল চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হতে বুদ্ধের ধর্মের পার্থক্য কোথায় তা নিরূপন করতে হলে বুদ্ধ আবিষ্কৃত চারি আর্যসত্য, বিশেষ করে এই আর্য-অষ্টাঙ্গিক নামক শিক্ষা-নীতিটির সাথে অবশ্যই অকৃত্রিম পরিচয় লাভ একান্ত অপরিহার্য। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ হচ্ছে মানুষ মাত্রেরই যে কোন ব্যক্তির অনুসরণ যোগ্য, অনুশীলন যোগ্য, এবং নিজেকে যথার্থ সার্থক মানুষরূপে বিকশিত করার জীবন বিধান। আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ কি, তা সংক্ষেপে বলতে গেলে কায়, মন, ও বাক্য সংশ্লিষ্ট কর্মস্বমূহে আত্ম নিয়ন্ত্রণ, আত্মানুশয়ন এবং আত্ম শুদ্ধি। তাই এখানে বিশ্বাস, প্রার্থনা, উপাসনা, কিংবা কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতার স্থান নেই বুদ্ধের এই ধর্ম ও দর্শনে। নৈতিকতার মাধ্যমে, এবং মনের সকল প্রকার কলুষতা হতে পরিপূর্ণ মুক্তির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক অনাবিল প্রশান্তি লাভ, এবং পরম সত্য লাভ তথা বৌদ্ধিক বিশুদ্ধতা অর্জনই হলো, আর্যঅষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের দুর্লভ পুরস্কার।

একথা বুঝতে কষ্ট হয়না যে, বৌদ্ধ ধর্মের অনুশীলনে আসলেই কোন প্রকার আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন আছে। তবু ও বৌদ্ধ সম্প্রদায় সমূহে নানা উপলক্ষে প্রথাগত নিয়মে নানা উৎসব, অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিকতার আয়োজন করা হয়। বর্ণিত আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গের সত্য পথে এ সকল আনুষ্ঠানিকতার কোনই গুরুত্ব নেই। তবে যারা ধর্মে, কর্মে অনগ্রসর তাঁদের ধর্মীয় আবেগ অনুভূতিকে ধরে রেখে, সেই আর্যমার্গপথে আকৃষ্ট ও উৎসাহিত করণে এসকল উৎসব ও অনুষ্ঠানাদি সন্তোষজনক ভূমিকা পালন করে। তাই এসকল অনুষ্ঠান, আনুষ্ঠানিকতা যাতে সেই চারি আর্যসত্যের আলোকে সকলের করণীয় কর্তব্য সম্পাদনের অনুকূলে প্রবর্তিত হয়, সে দিকে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত। এই লক্ষ্যে চারি আর্যসত্য কি, তা জেনে রাখা প্রয়োজনঃ-

১) প্রথম আর্যসত্য এই আর্যসত্য হলো দুঃখ। জীবনে যত প্রকার দুঃখানুভূতি আছে সে সকল দুঃখের প্রকৃতি, এর যাতনা, ক্লেশ, উপদ্রব, বলতে আমরা যা অনুভব করি, তার অশুদ্ধতা এবং সেই অশুদ্ধতা জাত অসন্তুষ্টি এবং তৎসংশ্লিষ্ট জাত সুখ দুঃখের অনিত্যতা এবং অসম্পূর্ণতা লক্ষণ সমূহ। আমাদের কর্তব্য হলো জীবনের এই সত্যকে পরিপূর্ণ এবং পরিশুদ্ধ ভাবে হৃদঙ্গম করতে

(পরিঞেঞ্য) মনে উৎপন্ন প্রত্যেকটি অনুভূতিকে কোন্ পর্যায়ে বেননা, তা পুণঃ পুণঃ চেষ্টার মাধ্যমে চিহ্নিত করা। বৌদ্ধ পরিভাষায় এই বেননা বলতে সুখানুভূতি, দুঃখানুভূতি, এবং উপেক্ষানুভূতি এই তিন পর্যায়ে অনুভূতিকে বুঝায়।

২) দ্বিতীয় আর্ষসত্য হলো দুঃখের হেতু বা কারণ ইহা লোভ, দ্বেষ, মোহ বা অজ্ঞতাজাত প্রবল আকাঙ্ক্ষা, অনুরাগ, কলুষতা এবং অশুদ্ধতা সহযোগে পাওয়ার ইচ্ছা, ভোগের ইচ্ছা নামক তৃষ্ণার উদ্রেক করে। এটাকে শুধু বুঝতে পারলেই কর্তব্য শেষ হয় না। এক্ষেত্রে প্রধান কর্তব্য হলো সেই সেই ইচ্ছা অভিলাসের অতিমাত্রাকে পরিত্যাগ করা, বিসর্জন করা, এবং পর্যায়ক্রমে বিরাগ, অনাসক্ত ভাবদ্বারা ধ্বংস করা, এবং উচ্ছেদ করা (পহতব্ব)।

৩) তৃতীয় আর্ষসত্য হলো দুঃখের নিবৃত্তি তথা নির্বাণ ইহা পরমার্থ সত্য, অনন্য সত্য। এখানে আমাদের করণীয় হচ্ছে চিন্তে উৎপন্ন প্রতিটি অনুভূতিতে এটাকে উপলব্ধি করে করে জীবন দৃষ্টির আমূল পরিবর্তন সাধন করা (সচ্চিকাতব্ব)।

৪) চতুর্থ আর্ষসত্য হলো নির্বাণকে উপলব্ধি করার উপায় বা পন্থা নামক পূর্বে বর্ণিত সেই আর্ষ অষ্টাঙ্গিক মার্গ। এক্ষেত্রে আমাদের করণীয় হল, এটাকে যথাযথ ভাবে স্থায়ী জীবনে অনুশীলন করতে হবে এবং হৃদয়ে ধারণ করতে হবে (ভাবেতব্ব)।

সংক্ষেপে ইহাই বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা ইহাই বুদ্ধের ধর্ম। বুদ্ধ প্রেমীরা এভাবেই বুদ্ধ ও তাঁর শিক্ষাকে জানুক, এবং আপনজীবনে তা ধারণ করে সুখী হোক।

সাধু। সাধু। সাধু।

-----o-----

আমার দেখা ও জানা বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজ

শ্রদ্ধা ও ভক্তি নামে দুইটি বহুল পরিচিত শব্দ এদেশে বহুকাল ধরে গণ-মানসে বিরাজ করেছে। কিন্তু তার প্রচলন কবে থেকে শুরু এ প্রশ্নের উত্তর দেয়া কঠিন। গুরুজনকে শ্রদ্ধা কর, ভগবানকে ভক্তি করো, এই হিতোপদেশ কানে লাগা মাত্রই কোমলমতি, সরল-প্রাণটি আবেগে উদ্বেলিত হয়, তাৎক্ষণিক ভাবে। তখন শ্রদ্ধা আর ভক্তি-এ দু'য়ের মধ্যে কোন ইতর-বিশেষ থাকে না, ভাবুক হৃদয়ে। ভারত উপ-মহাদেশে বুদ্ধের আবির্ভাব খৃষ্ট পূর্ব পঞ্চমশতকে। তাঁর দার্শনিক তত্ত্বের প্রচার-প্রসারের সাথে সাথেই শ্রদ্ধা আর ভক্তি শব্দ দুয়ের অর্থ ও ব্যবহারিক পার্থক্য ব্যাপক হয়ে ওঠে। যার গুণ-গরিমা, জ্যেষ্ঠত্ব শ্রেষ্ঠত্ব সরাসরি প্রত্যক্ষ করা যায়, তাঁকে শ্রদ্ধা কর। কারণ এই শ্রদ্ধা শব্দের ভাব-গত তাৎপর্য

যুক্তি আছে, প্রত্যক্ষ প্রমাণ আছে, পাত্র-ভেদে শ্রদ্ধার তারতম্যের বিচার মীমাংসা আছে। অপরদিকে যাকে যুগ-যুগান্তর ব্যাপী কেহ দেখেনি, কেবল শ্রুতি ও শাস্ত্র পরম্পরা ভাবুক হৃদয়ে মূর্তিমান করে রাখা হয়েছে, তেমন অমূর্তের প্রতি প্রগাঢ় বিশ্বাস জাত যেই নিবেদন তার নাম 'ভক্তি'। মানুষের সাথে সম্পূর্ণ মানস নির্ভর এই 'ভক্তি'। এই 'ভক্তি' কে নিয়ে তাই কিছুতেই চলে না কোন যুক্তি, তর্ক বা প্রমাণের অস্ত্রোপচার। যা শুনেছি সরল মনে, কেবল তা-ই বিশ্বাস করো। কারণ- 'ভক্তিতে মিলিবে হরি তর্কে বহুদূর'। অতএব, শুরুতেই সাবধান তিনি কে? কোথায় থাকেন? কি ভাবে আছেন? এতসব বচলামি করতে যাবে তো, কেবল ঘোড়ার ডিমই জুটবে তোমার কপালে। ভারতীয় মৌসুমীতে গড়া নরম মানসীরা এই নরম সাবধানী দিয়েই ক্ষান্ত হন। কিন্তু মরুর কাঠিন্যের গড়া কপ্তীর কঠোর কণ্ঠে বলে দেন, এসব নিয়ে বাড়াবাড়ি করবে না; করলে হয় ঈমান যাবে, তো গর্দান যাবে। বেশ তা হলে, আর টু-শব্দটি করার জো কোথা?

হ্যাঁ বলছিলাম কি। ভক্তির স্বরূপ প্রকৃতি এমনই হয়। সম্পূর্ণ বিশ্বাস আর আবেগ নির্ভর হওয়াতে এই ভক্তি অতি সহজেই, মানব মনকে প্লাবন মুখি জোয়ারে পরিণত করতে সক্ষম। দুকূল উপচেপড়া আবেগের এই উন্মাদনায়, এই বাঁধ-ভাঙ্গা স্রোতের মুখে, যুক্তির জাল পাততে যাওয়া শুধু কঠিন নহে, জীবনের ঝুঁকি ও থাকে প্রচুর। কপিলাবস্তুর রাজপুত্র সন্ন্যাসী হয়ে, তেমন কাজটিই করতে গিয়েছিলেন সেদিন, একান্ত অকুতোভয় হয়ে। সত্যোপলব্ধি জাত তাঁর অসমান্য মনোবল, বীর দর্পে এভারেষ্টির মতো শির উচু করে, ভারতের উপনিষদীয় ব্রাহ্মণ্য ভক্তিবাদের মহাপ্লাবণে খরস্রোতের বিপরীতে তাঁকে সেদিন দাঁড় করিয়ে দিয়ে ছিল। শুধু ভারত কেন, পুরো বিশ্বের মানব সমাজেই তখন চলছিল ভক্তি-বাদের এক মহা-প্লাবণ। জৈন-সাংখ্যদের ন্যায় যুক্তিবাদী জোনাকীরা ছিলেন নিজের অস্তিত্ব নিয়েই ব্যস্ত, অনেকটা আপোষ-রফা করে করে ব্রাহ্মণদের সাথে। কারণ শ্রদ্ধাবাদী- এসকল মতবাদীরা নিজেদের মতাদর্শের সিদ্ধান্ত নিয়ে, নিজেরাই ছিলেন সন্ধিদ্ধ এবং অস্পষ্ট। কিন্তু, বুদ্ধজ্ঞানে, পরিপূর্ণ জ্ঞানের আলোয় সূর্যের ন্যায় উদ্ভাসিত যার চিত্ত, সেই সন্ন্যাসী সিদ্ধার্থ গৌতমের মনে সেদিন কোন সন্দেহ ছিলনা, অস্পষ্টতা ছিলনা, আপন প্রাপ্তি ও সিদ্ধান্তে। অতএব, সন্দেহ, জড়তা ও দ্বিধা হীন চিন্তেই তিনি সকল ভিন্ন-মতাবলম্বীদের সামনে একাই ছিলেন হিমালয়, একাই এভারেষ্ট। পরম সত্য সেই চারি আর্য়সত্য, আর প্রতীত্য সমুৎপাদ এর মতো বুদ্ধ জ্ঞানের বিশাল রাজ্যে অবগাহিত বুদ্ধ গৌতমের চিত্ত শক্তির মধ্যে অপরাজেয় বীর্য-বর্তা ছিল, পরাক্রমতা ছিল, কিন্তু অন্ধ-আবেগের উন্মাদনা ছিল না। অকুতো ভয় তাঁর চিত্ত শক্তিতে অনমনীয়তা ছিল। কিন্তু একই সাথে যুক্তি গ্রাহ্যতা, সচেতনতা, গান্ধীর্যতা এবং প্রত্যুৎপন্ন মতিত্বের প্রখরতাও ছিল তাতে। তাই ভক্তিবাদের আবেগ-উন্মাদনা, প্রতিপদে পদে এই মহাবীরের কাছে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়েছিল সে-দিন।

অতঃপর কি হতে কী হয়ে গেলো! মহাজ্ঞান, মহাপরাক্রমের এই বিশাল উৎস ভূমিতে? মূল উৎসের স্বভাব স্বরূপ এর, সম্যক্ উপলব্ধি ও ধারণ-চরম অক্ষমতা, এবং এতে করে মূল ধারার বিচ্যুতি; বুদ্ধ বাণীর ধারক বাহক ভিক্ষু-সংঘ, এবং বুদ্ধ বাণীর পৃষ্ঠ পোষক গৃহী সংঘের মধ্যে এই অক্ষমতা, এই বিচ্যুতিই কাল হয়ে দাঁড়ালো, ভারত উপ-মহাদেশে বুদ্ধের ধর্মও দর্শনের স্থায়িত্বের উপর, তার অপরায়েয়তার উপর। বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘ ও গৃহী-সংঘ, বুদ্ধ প্রণীত শ্রদ্ধাবাদকে একদল নিয়ে গেল চুলছেঁড়া যুক্তি-তর্কের প্রজ্ঞাবাদে; আর একদল নিয়ে গেল ব্রাহ্মণদের চেয়েও দ্বিগুণ অন্ধত্বের ভক্তিবাদে। তাতে করে বুদ্ধের শ্রদ্ধাবাদ প্রণীত মধ্য-পন্থায়; আর কেহ থাকলো না। বুদ্ধ-শিক্ষার এই মধ্যম-নীতি বর্জনই, ভারত থেকে বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তির প্রধানতম কারণ। বিশ্বখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক অসঙ্গ, বসুবন্ধু আর নাগার্জুনদের মতো অসংখ্য নাম জানা-অজানা দার্শনিকদের গুরু-নিরস তর্কের জালে আবদ্ধ হয়ে, বুদ্ধ-প্রাণ, বুদ্ধ শিক্ষা, যেমন সেদিন ছুটপট করেছিল ভারতের এই মাটিতে, অপর দিকে যজ্ঞির দুর্ভেদ্য প্রাচীর, আড়াল করে দিয়েছিল সেদিন বুদ্ধের দুঃখ মুক্তির করুণাঘন আহবানকে, ভারতের জন-মানস হতে। তাই সেদিনের ভিক্ষু-গৃহীরা, বাঁচার উপায় হিসেবে বুদ্ধের জ্ঞান দর্শনকে সহজ-সরলীকরণ চেয়েছিল মনে প্রাণে। বুদ্ধ আবিষ্কৃত 'শ্রদ্ধাটি' ছিল প্রজ্ঞা+বিশ্বাস, এদু'য়ে সমন্বয় সাধন পন্থা! সেই শ্রদ্ধার এক অংশ প্রজ্ঞাবাদের প্রতি, এই মানুষ গুলো যখন ত্যক্ত-বিরক্ত; তখন শ্রদ্ধার অপরাংশ বিশ্বাস নামক ভক্তিবাদ, তথা মনোবাদের প্রতি তাদের আকর্ষণ বেড়ে গেল স্বাভাবিক ভাবে। কিন্তু, সেই ভক্তিবাদের প্রথম ধাপ কাল থেকে দখলীকৃত ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদের হাতে। ফলে বৌদ্ধ সরলীকরণ বাদী ভিক্ষু, গৃহীরা স্থান করে নিল ব্রাহ্মণ্য বাদের নীচের স্তর থেকে আরো ক্রমিক নীচুতর দিকে। অর্থাৎ ভক্তিবাদের অন্ধত্বে সরলীকরণবাদীরা হলেন ব্রাহ্মণ্যদের তুলনায় আরো দ্বিগুণ, ত্রিগুণ আবেগের শিকার। তাই ব্রাহ্মণেরা মনোময় একটি মূর্তিকে আকার দিলে, বৌদ্ধগণ দিলেন দু'টি, তিনটি দেবদেবীর মূর্তিকে। অচিরেই অসংখ্য দেব-দেবীর মূর্তিতে তাই ভরে গেল বুদ্ধের আসন। জাহাজের তলায় ছিদ্রটি গুরুতে সামান্য হলেও তা বড়ো হতে বেশীক্ষণ লাগেনা। অধঃপতনের বিকৃত স্বাদ একবার পেলে, তার লবণাক্ত চাহিদার লকলকে জিহ্বার প্রসারণ কেবল হতেই থাকে। তাই অসংখ্য আশা-আকাঙ্ক্ষা জাত পোড়ামাঠিতে বা ধাতবে গড়া বৌদ্ধ দেব-দেবীর মধ্যে ক্রমেই উষ্ণ লোনা রক্ত-মাংসের আমদানী হতে বেশী দিন লাগেনি। অরহত ভিক্ষুণী গৌতমী যশোধরাদের বংশধর গণ, এবং অরহত ভিক্ষু সারিপুত্র-আনন্দদের বংশধরগণ, এখন কামনা বাসনা ক্ষয়ের মধ্যপন্থ অবলম্বনের পরিবর্তে, ভক্তিবাদী কামনা-বাসনা বৃদ্ধির সাধনাতেই নিমগ্ন হলেন। এতে করে বুদ্ধ পুত্র ভিক্ষুরা একাদশ, দ্বাদশ শতাব্দীতে এসে, হয়ে গেলেন বৌদ্ধ

নেড়া মাথার নারোপা, কাহুপা, লুঁইপা; আর বুদ্ধ কন্যা ভিক্ষুণীরা হয়ে গেলেন বজ্র-যোগিনী, জ্ঞান ডাকিনী নেড়ীর দল। ব্রাহ্মণেরা চিরকাল সমাজ বন্ধনেই আবদ্ধ ছিলেন। তাই বহু বিবাহ প্রথার মাধ্যমে একাধিক নারী ভোগ করলেও, সামাজিকতার দায়িত্ব বোধ আর ভদ্রতাকে পায়ে মাড়াতে পারেননি। বিবাহ সূত্রে নারীর দায়-দায়িত্ব গ্রহণে বাধ্য হতে হয়েছে তাঁদের। তাই স্বাভাবিক ভাবেই নারী ভোগে সংযমতা ছিল, সীমাবদ্ধতা ছিল এই ব্রাহ্মণদের। কিন্তু, সর্বত্যাগী বুদ্ধের নামে সর্ব ভোগী, একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীর এসকল নেড়া-নেড়ীদের জীবনে সামাজিকতার কোন বালাই ছিল না, সমাজের ও লোকালয়ের বাইরে প্রতিষ্ঠিত, নিজস্ব সম্পদে সমৃদ্ধ সারা ভারতব্যাপী কামরূপ-কামাক্ষ্যা মন্দিরের ন্যায় আরণ্যিক বিশাল বিশাল মঠ মন্দিরে। পাঠক! ভেবে দেখুন, এমন সুবর্ণ সুযোগ-সুবিধায় সেই নেড়া-নেড়ীর ব্রহ্মচারীর নামে অব্রহ্মচর্যের চর্চায় ভোগ-উন্মত্ততায়, কোন্ পর্যায়ে পৌছতে পারে। তাদের এসকল অনৈতিকতাকে জন সাধারণের কাছে, রাজা-মহারাজা, আর ধনী-শ্রেষ্ঠীদের কাছে গ্রহণ যোগ্য করে তোলার কিছু প্রয়োজন ছিল, আপন অস্থিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদে। তাই গুহ্য-চক্র, ভৈরবী-চক্র ইত্যাদি গোপন ও প্রকাশ্য আচার অনুষ্ঠান গুলোর মহনীয়তা প্রকাশে তারা অতিদক্ষতার সাথে কাল্পনিক দেব-দেবীর অলৌকিক শক্তিমত্তার কাহিনীকে সংযুক্ত করে দিলেন। এইলক্ষ্যে মানুষের যাবতীয় আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রার্থনা পরিপূরণকারী দেবতাদের অতিমুদ্রিয় শক্তি প্রকাশক শ্লোক এবং পুঁথি পত্র ও রচিত হলো অসংখ্য, পূজারঅর্ঘ্য নিবেদনে। তান্ত্রিকতার নামে ইন্দ্রজালিক কর্মকাণ্ড আয়ত্ত্ব করে তারা সাধারণ জনকে মোহিত-চমকিত করলেন। উদাহরণ স্বরূপ উত্তর বঙ্গের সোমপুরী বিহার বা উড়িষ্যার সোমনাথ মন্দিরের ঘটনাটি উল্লেখ করা যাক। সেই মন্দিরে ছিল শুন্যে অবস্থানকারী একটি ধাতব মূর্তি। এই মূর্তিটির এহেন আশ্চর্য ঋদ্ধিতে মুগ্ধ জনগণের যুগ যুগ ধরে প্রদত্ত সোনা-রূপা, মনিমুক্তার শ্রদ্ধার্থের বিশাল ভাণ্ডার আকর্ষণ করলো তুর্কি মুসলিম আক্রমণকারীদের। তারা তরবারির আঘাতে মূর্তিটিকে খণ্ড-বিখণ্ড করতে গিয়ে আবিষ্কার করলেন যে, এই মূর্তিটি শুন্যে অবস্থানের কারণ হচ্ছে, তার চারপাশে স্থাপিত চারিটি শক্তিশালী চম্বুকের আকর্ষণ। সেদিন সারা ভারতবাসী এসকল বৌদ্ধ দেব-দেবীর পূজা উপলক্ষে হাজারো উৎসব, অনুষ্ঠানে তাদেরকে দান-মহনীয়তার স্তব-স্তুতি প্রথা আরা চালু করলেন। এ সব নিয়ে ব্যস্ততাই ছিল এ সকল বৌদ্ধ নেড়া-নেড়ীদের মুখ্য-বিষয়; নির্বাণ সাধনা নহে। নানাভাবে, নানা উপায়ে নিকৃষ্ট ভক্তি-বাদে নিমজ্জিত করলো এই নেড়া-নেড়ীরা ভারত এবং ভারতের বাইরে মঙ্গোলিয়া, নেপাল, ভূটান, তিব্বত, চীন, কোরিয়া, জাপান এমনকি বার্মা, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকাদি, এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলকে। সেই বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বিশাল বৌদ্ধ জন-গোষ্ঠীর এই ভক্তি বাদ ছিল, সম্পূর্ণ কাল্পনিক দেব-

দেবীর কৃপানির্ভর। তাই এই সকল দেব-দেবীর কৃপা লাভের মাধ্যমে আপন ভাগ্য-উন্নতি, রোগ-বালাই মুক্তির জন্যে পূজা-অর্চনা, মানত-হিন্ত, ঝাড়-ফুকতুক-তাক, তাবিজ-টোনা; এসবই ছিল তখনকার বৌদ্ধ ধর্মের পরিচয়। গৃহীদের দান, শীল, ভাবনা; বা ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের শীল, সমাধি প্রজ্ঞার সাধনা; এসব তখন ছিল অবান্তর, অথবা অসম্ভব বিষয় মাত্র।

দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ হতে পুরো ত্রয়োদশ শতাব্দী জুড়ে এদেশের উপর প্রবাহিত হলো এক হাতে কোরাণ, আর এক হাতে তরবারি নিয়ে ইসলামের রণ হুঙ্কারের অপ্রতিরোधी ঢেউ দিল্লীর সেই খাইবার পাস দিয়ে। দিল্লী কাশ্মীর হতে আসামের ব্রহ্মপুত্র বঙ্গের নাফ নদী, দক্ষিণে কন্যাকুমারিকা পর্যন্ত নানা মতবাদে শতধা বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র বৃহৎ বৌদ্ধ রাজ্য ও জনপদ সমূহ শুধু নহে, ব্রাহ্মণ্য বাদ প্রভাবিত রাজ্য গুলোও একে একে আক্রান্ত, পদানত হলো, ইসলামের বিজয় যাত্রার মুখে। তবে রাজ্য রক্ষায় ব্রাহ্মণ্যবাদী হিন্দু রাজারা বিচ্ছিন্ন হলেও স্বশক্তিতে শত্রুগণের বিরুদ্ধে বহুবার যুদ্ধ করেছেন তাঁদের ধর্মগ্রন্থ-গীতা, রামায়ণ, মহাভারতের প্রেরণায়। কিন্তু বৌদ্ধদের ঘরে তো তখন কোন ধর্ম-গ্রন্থই ছিলনা। পুঁথি-পত্র যা ছিল, সবই নেড়া-নেড়ীদের দখলে, বিহারে মন্দিরে। আবার তা-ও ছিল নিছক দেব দেবীর পূজা-উপাসনার মন্ত্র-তন্ত্র সর্বস্ব। রাম-বারণের যুদ্ধ, বা মহাভারতের কুরু-ক্ষেত্রে ভীম-অর্জুনের বীরত্বের কাহিনীতো এসবে থাকার কথা নয়। তাই দেব-দেবীর কৃপায় একান্ত বিশ্বাসী এ সকল বৌদ্ধরা স্ব-রাজ্য আক্রান্ত হলে, রাজা প্রজা কেহই প্রতিরোধ যুদ্ধে অগ্রসর হয়নি; তারা দৌড়ে ছিলেন বিরাট বিরাট দেব-দেবীর মন্দিরে, তাদের অপার-বিশ্বাসের ভাণ্ডার অনন্ত শক্তির আধার, সেই দেব-দেবীদের অলৌকিক শক্তিতে দেশ রক্ষার প্রার্থনায়। ইসলামের খড়্গের আঘাত ও সেখানেই গিয়ে পড়লো সকলের আগে অগাধ ধন-রত্ন লুণ্ঠনের আকর্ষণে। বৌদ্ধদের চোখের সামনেই তাদের শত শত বছরের পুঞ্জীভূত বিশাল বিশ্বাসের শক্তিধর দেব-দেবীরা যখন, ইসলামের তরবারির আঘাতে আঘাতে খণ্ড-বিখণ্ড হতে শুরু করলো; অথচ সেই অলৌকিক মহাশক্তির আধার দেব-দেবীর কোন শক্তিই প্রকাশ পেলনা; তখনই বৌদ্ধ নেড়া-নেড়ীদের ঘোর মিথ্যার বেসাতি ফাঁস হয়ে গেল সকল বুদ্ধির বৌদ্ধ জন সাধারণের কাছে। প্রবল আত্ম-ধিকারের ঘৃণায়, চিরতরে তারা মুখ ফেরালেন কোন্ দিকে? স্বাভাবিক ভাবে নিরাকার পূজারী, রাজ-দণ্ড ধারী-যারা, তাদের দিকেই। ফলে, গুটিকয় মাত্র ইসলামী ধর্ম যোদ্ধারা, ভারতের বাইরে থেকে এসে পেয়ে গেলেন বিশাল সম্রাজ্য, এবং বিশাল জন-গোষ্ঠী-ইসলামের পতকাতলে, খুব-সহজেই।

‘লৌহ হতে উৎপন্ন মল, লৌহকে ধ্বংস করে; এই বাস্তব প্রবাদ বাক্যটি আবার অমোঘসত্য বলে প্রমাণ করলো ভারতীয় তাত্ত্বিক বৌদ্ধগণ। ভারতের বৌদ্ধ-ধর্ম ও সমাজের বিলুপ্তিতে, এভাবে প্রধান কারণ হয়ে দাঁড়ালো বৌদ্ধগণ নিজেরাই? ব্রাহ্মণ্যবাদের ধারক শংকরাচার্য, কুমারিল ভট্ট, রামাণুজেরা বৌদ্ধদের প্রচুর ক্ষতি করলেও, এভাবে নিশ্চিহ্ন করা সম্ভব ছিল না কিছুতেই। কেহ কেহ প্রশ্ন করেন, ইসলামের আক্রমণ তো ভারতের বুকে হিন্দু-বৌদ্ধ উভয়ের উপর সমানই ছিল কিন্তু হিন্দুরা টিকে গেল, বৌদ্ধরা বিলুপ্ত হলো কেন? আমি একে বিলুপ্তি বলবো না, বৌদ্ধদের আত্ম-বিসর্জনই বলবো। আমার এ মন্তব্যের ঐতিহাসিক সত্যতা পূর্বোক্ত বর্ণনায়, পাঠক! নিশ্চয় অনুধাবনে সক্ষম হবেন। বৌদ্ধরা নিজেরাই নিজেকে শেষ করেছে। তবে এ দোষে যারা সবচেয়ে বেশী অভিযুক্ত হওয়া উচিত, তারা হলেন মহান বুদ্ধ প্রবর্তিত উচ্চতম আদর্শের ধারক মহান ভিক্ষু-ভিক্ষুণীদের পরবর্তী নিকৃষ্টতম বংশধর পঞ্চ কামভোগী সেই নেড়া-নেড়ী এবং তন্ত্র-মন্ত্রে ভক্তিবাদের প্রবর্তকেরা। আরো যেই কয়েকটি কারণ ভারতে বৌদ্ধদের অবলুপ্তির জন্যে দায়ী, তা একটি তুলনামূলক চিত্রের মাধ্যমে তুলে ধরা যেতে পারে-

১. ব্রাহ্মণেরা স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সাধারণ সমাজেরই বাসিন্দা, বেশ ভূষায় ও তাই। কেবল যিনি পুরোহিতের দায়িত্বে নিয়োজিত, সেই ব্রাহ্মণই মন্দিরে বাস করেন। তাই হিন্দু মন্দির আক্রান্ত হলেও, মন্দির বাসী এক ব্রাহ্মণ পরিবারই আক্রান্ত বা নিহত হয়েছেন। হিন্দু ধর্ম শাস্ত্রে অভিজ্ঞ অপরাপর ব্রাহ্মণেরা বেশ-ভূষায় জনসমাজের সাথে একাকার হয়ে আত্মরক্ষা করতে পেরেছেন সহজে। কিন্তু, গ্রাম বা লোকালয়ের বাইরে বিহারবাসী, পৃথক বেশ-ভূষাধারী বৌদ্ধ ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা মুসলিমদের আক্রমণের মুখে ব্রাহ্মণদের ন্যায় আত্ম-গোপন করা সহজ ছিল না। তাই তারা নিহত হয়েছেন বেশী, পালাতে পেরেছেন খুব কম।

২. ব্রাহ্মণদের ধর্ম-গ্রন্থ গুলো মন্দিরে পুঞ্জীভূত ছিল না। ছিল ব্রাহ্মণদের কাছে ও সমাজের ঘরে ঘরে। ফলে মন্দির ধ্বংস হলেও তাদের ধর্মগ্রন্থ বেদ-বেদান্ত, রামায়ণ-মহাভারত রক্ষা পেয়েছিল। অপরদিকে বৌদ্ধদের ধর্মগ্রন্থ হিন্দুদের মতো দু’চারটি নহে, অসংখ্য। আর তা-ও ছিল সমাজের ঘরে ঘরে নহে, বিশালকার মঠ-মন্দিরের বিশালাকার পাঠাগারে। এসকল ধর্মগ্রন্থের সমস্ত বিষয় গৃহীদের মনে রাখা দূরে থাক, বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের পক্ষে পর্যন্ত দুঃসাধ্য ছিল। একারণেই তারা প্রতিটি লাইনের প্রথম অক্ষর দিয়ে, ‘ধারণী’ নামে পৃথক পুস্তক তৈরী করেছিলেন; যেমন-আ,ই,উ,ম, স্বাहा-ইত্যাদি। এগুলোকেই মন্ত্র বা তন্ত্র রূপে ঝাড়-ফুক, তাবিজ-টোনায়ে ব্যবহার করে মানুষদের বশীভূত করা হতো। ইসলামের আক্রমণ ও ধ্বংস যজ্ঞে যখন নালন্দা, বিক্রমশীলা, তক্ষশীলা সহ বিশালাকার সব বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস প্রাপ্ত হলো; তখন বৌদ্ধদের ধর্ম-গ্রন্থ রূপে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকলো না। ধারণী নামে সংক্ষিপ্ত বিষয় গুলোর অর্থ উদ্ধার ও চিরতরে অসম্ভব হয়ে পড়লো।

৩. ব্রাহ্মণেরা গৃহী এবং ধর্মগুরু উভয় দায়িত্ব পালন করেন বলে, গৃহী-সমাজের স্বভাব রুচি, পছন্দ-অপছন্দ এসব মানসিক বিষয় ও চাহিদা বুঝতে পারতেন সহজেই। এই আলোকে তাঁরা ধর্মকে সমাজের সর্বস্তরের মানুষের মনের সাথে, দৈনন্দিন আচার ব্যবহারের সাথে সম্পর্কিত করার সহজতম উপায় গুলোর ব্যবহারের দক্ষ ছিলেন। ফলে হিন্দুদের ধর্ম গ্রন্থও মন্দিরে আবদ্ধ না থেকে, প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে হিন্দু সমাজের ঘরে ঘরে, জনসাধারণের দৈনন্দিন আচারে ব্যবহারে। এতে করে ইসলামের আক্রমণে হিন্দুদের মন্দির ধ্বংস হলে, এবং হিন্দুরা রাজধানীর ক্ষমতা হারালেও; ধর্ম হতে তাদেরকে ইসলামী আক্রমণও শাসন বিচ্ছিন্ন করতে পেরেছে খুবই কম।

অপরদিকে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা সমাজ তথা লোকালয় হতে বিচ্ছিন্ন থাকার নির্দেশ তথাগত বুদ্ধ দিয়েছিলেন; ধ্যান-সমাধির মাধ্যমে আপন মনের লোভ, লালসা, আসক্তি, হিংসা, বিদ্বেষ, ঈর্ষা এ সমুদয় পাপ প্রবৃত্তির মূল উচ্ছেদের জন্যে। কিন্তু, পরবর্তীকালের ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা বুদ্ধের সেই মহান ইচ্ছার বিপরীত জীবন গ্রহণের কারণে ধ্যান-সাধনার অনুকূল লোকালয় বিচ্ছিন্ন বিহার গুলো অনুকূল হয়ে দাঁড়ালো, অবৈধ কামাচারের। শীল-সমাধি-প্রজ্ঞায় বিভূষিত চন্দ্র সূর্যের মতো উজ্জল জীবন, হাজার মাইল দূর হতেও মানুষের শ্রদ্ধা-সম্মান, গৌরব আকর্ষণে সক্ষম। সেক্ষেত্রে বৌদ্ধ নেড়া-নেড়ীরা নিজেদের কদর্য-জীবনাচারে; অশ্রদ্ধা, অগৌরব এবং ঘৃণার পাত্রই হয়ে উঠেছিলেন রুচিবান মানুষের কাছে। অধিকন্তু তারা ধর্মকে কখনো সমাজে ও মানুষের ঘরে তাদের দৈনন্দিন জীবনাচারে প্রতিষ্ঠা করার চেষ্টা করেননি। নিজেদের লাভ-সংকার বৃদ্ধির কৌশল হিসেবে ধর্মের নামে যত কিছু তারা করেছেন, সেই সবকিছু করার ব্যবস্থা করেছেন বিহারে। তাই তাদের হাতে বৌদ্ধ ধর্ম হয়ে পড়েছিল বিহার চত্বর এবং নিছক নতুন উৎসব অনুষ্ঠান নির্ভর। বৌদ্ধ ধর্মের এই গণ-বিচ্ছিন্নতা, বৌদ্ধ সমাজে ইসলামের অনুপ্রবেশে এক বিরাট সুযোগ এনে দিয়েছিল। ভারতে বৌদ্ধ সমাজের অবলুপ্তি এবং ব্রাহ্মণ্য সমাজের টিকে যাওয়ার ইহাই সবচেয়ে বড়ো কারণ।

৪. বুদ্ধের ধর্মান্তর প্রচার প্রতিষ্ঠায় রাজা-মহারাজাদের এক বিরাট ভূমিকা ছিল। তা কিন্তু, রাজশক্তিতে বল প্রয়োগের মাধ্যমে নহে; বুদ্ধে শিক্ষার উচ্চতম নীতি আদর্শে জনমনকে অনুপ্রাণিত করার মাধ্যমে। একারণেই অসম্প্রদায়িক প্রথাগত নিয়মে বিনা প্রশ্নে প্রত্যেক বৌদ্ধ রাজার মন্ত্রীপদাবৃত থাকতেন ব্রাহ্মণেরা। বুদ্ধের ধর্ম প্রচারে রাজকীয় ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ হলেও, বুদ্ধ কোন দিন রাজ বা রাজনীতি নির্ভরতা মূলক কোন কোন শিক্ষা বা আদেশ-উপদেশ, তাঁর শিষ্য-সংঘ বা অনুসারীদের দেননি। তিনি তাঁর ধর্মের প্রচার প্রসারে প্রব্রজ্যিত

সংঘ এবং গৃহী সংঘ এদু'য়ের পারস্পরিক নির্ভরশীলতার উপরে গুরুত্ব দিলেও, ধর্মের প্রাণ রক্ষায় একক গুরুত্ব প্রদান করেছেন কেবলমাত্র ভিক্ষুদের উপরেই; ভিক্ষুগীদের উপরও নহে। ভিক্ষুরা এক পর্যায়ে অপরের প্রদত্ত অনু-বস্ত্র নির্ভর ভিখারী। কিন্তু আর এক পর্যায়ে দেহ ও মনজাত জাগতিক সর্ববিধ দুঃখ-মুক্তির একক পথ-প্রদর্শক হিসেবে বিশ্বমানবের সামনে এক অতি উচ্চতম পথ-নির্দেশক, ও গুরু স্থানীয়। তাই কোন ভিক্ষু উপসম্পদা গ্রহণ কালীন উচ্চারিত আটটি প্রতিজ্ঞায় অটুট থাকলে, পৃথিবীর যে কোন স্থানে, যে কোন অবস্থায় তাঁরা মানুষের শ্রদ্ধা-গৌরব লাভে সক্ষম; এবং বুদ্ধের ধর্মাদর্শের প্রতিষ্ঠা দানেও সক্ষম। অতএব, রাজশক্তি বা রাজনির্ভরতার বস্ত্রতঃ কোন প্রয়োজনই নেই, বুদ্ধের মতাদর্শীদের জন্যে।

কিন্তু, বুদ্ধের সেই আদর্শ-ধর্মসেনারা, পরবর্তী কালে সম্পূর্ণভাবে রাজানুগ্রহ নির্ভর হয়ে, তাঁদের স্তব-স্তুতি, এবং তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী ধর্মের নামে শ্লোক রচনায় অতি-উৎসাহী হয়ে পড়েছিলেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের উত্থানে অনেক বৌদ্ধরাজ্য যখন বৌদ্ধরাজ্য গুণ্য হয়ে অবৌদ্ধ রাজার করতল গত হলো, তখন পূর্বের মতো আর সেই রাজকীয় পৃষ্ঠ-পোষকতা তাদের ভাগ্যে জুটলো না। ফলে বিশাল বিশাল বৌদ্ধ সংঘারামে বিপুলসংখ্যক আবাসিকদের অবস্থান ও দুঃসাধ্য হয়ে পড়েছিল ক্রমে ক্রমে।

৫. বিনয় মহাবর্গের ভৈষজ্য স্কন্ধে দেখা যায়, বুদ্ধ এভাবেই ভিক্ষুসংঘকে নির্দেশ দিচ্ছেন, “হে ভিক্ষুগণ! আমি বর্তমানে তোমাদের জন্যে যে সকল শিক্ষা উপদেশ নির্দেশ করছি, সে সমুদয়ের মধ্যে কোন কোন শিক্ষাপদ ভবিষ্যতে এমন ও প্রতীয়মান হতে পারে যে, তৎদ্বারা কোন কল্যাণ, কোন মঙ্গল সাধিত হচ্ছে না। তখন সকল ভিক্ষু সংঘ শিক্ষাপদটি বর্জনে এক মত পোষণ করলে, তা বর্জন করতে পারবে। আবার, হে ভিক্ষুগণ! যখন দেখা যাবে যে, আমি এমন কোন শিক্ষাপদ নির্দেশ করিনি, যা ভবিষ্যতে মঙ্গল ও কল্যাণকর প্রতীয়মান হচ্ছে। তখন সকল ভিক্ষুসংঘ একমত পোষণ করলে তেমন শিক্ষাপদ সংঘ গ্রহণ করতে পারবে।”

মহাপরিনির্বাণ শয্যায় শায়িত হয়ে, তথাগত বুদ্ধ সেবক আনন্দকে লক্ষ্য করে বল্লেন, “হে আনন্দ! আমার অবর্তমানে আমার দেশিত ধর্ম-বিনয়ই তোমাদের বুদ্ধ এবং তোমাদের পরিচালক বলে জানবে। হে আনন্দ! ভবিষ্যতে সংঘ যদি মহত্ত্বের কল্যাণে ক্ষুদ্রানু-ক্ষুদ্র শিক্ষাপদ গুলোর কোন কোনটি পরিবর্তন করতে চায়, তা করতে পারবে।”

তথাগত বুদ্ধের এসকল নির্দেশের সম্যক্ মূল্যায়ণে সক্ষম হলে বুদ্ধ পরবর্তী ভিক্ষু-সংঘের মধ্যে, এত দ্রুত, এত অসংখ্য দল-উপদল সৃষ্টির কোন সম্ভাবনাই ছিল না। প্রায় ক্ষেত্রে দেখা গেছে, বুদ্ধের বিভাজ্যবাদ-নীতি পরিত্যাগ করে ভিক্ষু-প্রধানেরা যখনই একান্তবাদী নীতি গ্রহণ করেছেন; তখনই বৌদ্ধ সংঘে অসংখ্য নিকায় ও দল উপদলের সৃষ্টি বাতাবরণ হয়েছে। সংঘের একতা শক্তি এভাবে ধ্বংস হওয়াতে, বুদ্ধের সংঘে ধর্ম-বিজয় যাত্রাই শুধু স্থিমিত হয়ে পড়েনি, সংঘে স্বৈরচারী প্রবৃত্তিও মাথাচাড়া দেয়ার সুযোগ পেয়েছে ভীষণ ভাবে। সংঘের একতায় এই বিপর্যয়ই, ভারতে বৌদ্ধ সমাজ অবলুপ্তির অন্যতম কারণ।

বর্তমান বিশ্বে বৌদ্ধ সংখ্যাগুরু ও সংখ্যালঘুদের বিপদ ও বিপদ মুক্তি:

ইতিহাসের এই নির্মম শিক্ষার আলোকে ইদানিং কালের বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজ সম্পর্কে এখন কিছু আলোচনা করা যাক। বর্তমান বিশ্বের যে সকল দেশে বৌদ্ধরা সংখ্যা গরিষ্ঠতা বজায় রাখতে পেরেছেন; আর অপরদিকে যে সকল দেশে বৌদ্ধরা সংখ্যা-লঘুর অভিশাপ মাথায় নিয়ে আপন অস্তিত্বের সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছেন; এই উভয়ের বর্তমান বিপদ কি? এবং করণীয় কর্তব্য কি? এ প্রশ্নের উত্তরে নিম্নোক্ত বিষয় সমূহ তুলে ধরা হলো, আমার প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ অভিজ্ঞতার আলোকে-

সংখ্যা গরিষ্ট বৌদ্ধ সমাজের বর্তমান বিপদ সমূহ:

বর্তমান বিশ্বে সংখ্যা গরিষ্ট বৌদ্ধ সমাজের অস্তিত্ব রয়েছে জাপান, কোরিয়া, তাইওয়ান, থাইল্যান্ড, শ্রীলংকা, বার্মা ও মঙ্গোলিয়ায়। এসকল দেশ সমূহের মধ্যে, জাপান অর্থনৈতিক দিক থেকে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকারী সমৃদ্ধশালী দেশ। জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাস হাজার বছরের মতো। বৌদ্ধ ধর্ম ভারত হতে উৎসারিত হয়ে চীন সম্রাজ্যকে প্রাবিত করে জাপানে গিয়ে পৌঁছতে দেড় হাজার বছর অতিক্রম হয়ে গেছে। এই দেড় হাজার বছরের ব্যবধানে একটি মতবাদকে নিশ্চিত ভাবে তার আদি স্বরূপে পত্তিয়া সম্ভব নহে। জাপানের বেলায় হয়েছে ও তাই। বহু পরিবর্তিত পরিবর্তিত বুদ্ধ মতকেই জাপান পেয়েছে। মহাযান শিল্প ভাস্কর্যের অবদানে গড়া বুদ্ধ মূর্তির প্রচলন যদি না হতো, তাহলে জাপানে কিছুকাল আগে প্রচলিত বুদ্ধ মতকে চিহ্নিত করা বেশ কষ্টকরই হতো। জাপানের হাতে গোনা কয়েকজন ব্যতীত, বাদ বাকী সকল ভিক্ষুই বিবাহিত এবং প্রতিটি বিহার তাঁদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি। আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার ব্যাপক-উৎকর্ষতার সাথে তাল মিলিয়ে, জাপানের অর্থনীতি যে ভাবে সমৃদ্ধি পেয়েছে; সে তুলনায় বৌদ্ধ-ধর্মের ভাগ্য সেখানে তেমন প্রসন্ন না হলেও, জাপানী অনুসন্ধিৎসার দৌলতে বর্তমান বিশ্বে বৌদ্ধ ধর্ম নিয়ে এযাবত যত অনুসন্ধান ও গবেষণা হয়ে গেছে, তার প্রায় সব কিছু জাপানী বৌদ্ধ তথ্যানুসন্ধানীরা স্ব-দেশের মাটিতে নিয়ে গেছেন। এতদ্ সত্ত্বেও জাপানী

মানসিকতায়, ধর্মের চেয়ে জাতিবাদের প্রধান্যতা খুব বেশী। তাই জাপানের বৌদ্ধরা বৌদ্ধিক চেতনায় সত্যিকারের কোন আদর্শ সমাজ গঠণে, প্রায় অক্ষম বলা চলে। নিজেদের সুপ্রাচীন ধর্মাদর্শের প্রতি জাপানী-প্রেমের এই দুর্বলতার সুযোগকে, সম্প্রসারণ বাদী খৃষ্টান মিশনারী গুলো সুকৌশলে কাজে লাগাতে এখন বেশ যে তৎপর, তা আমি দেখেছি। তাঁরা জাপানী উচ্ছল তরুণ-তরুণীকে সবিশেষ আকর্ষণ করতে চেষ্টা করছে নানা প্রকার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক আকর্ষণীয় উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন করে; দেশে বিদেশে খৃস্টীয় সাংস্কৃতিক আকর্ষণীয় উৎসব অনুষ্ঠানে যোগদানের ব্যবস্থা করে; এবং দেশে বিদেশে সমাজ সেবা ও মানব-সেবা মূলক কার্যক্রমে অংশ গ্রহণ করানোর মাধ্যমে। বিশ্বব্যাপী খৃষ্টান মিশনারী নেট-ওয়ার্কের এই ব্যাপক তৎপরতার মুখে, জাপানী বৌদ্ধ ধর্ম গুরুরা নিজেদের ধর্ম, সমাজ ও সংস্কৃতির বিকাশে বিশেষ কোন উদ্যোগ কার্যকরী ভাবে গ্রহণ করতে পারছেন বলে মনে হলো না। জাপানী বৌদ্ধ ধর্মগুরুদের হতাশ মনের এক দীর্ঘশ্বাস আমি শুনতে পেয়েছি; ১৯৯৩ খৃষ্টাব্দে আমার জাপান ভ্রমণ কালে। সেই ভিক্ষু মহোদয় বল্লেন, জাপানী সমাজে আমাদের প্রয়োজন শুধু মৃতদের জন্যেই; জীবিতদের প্রতি আমাদের করণীয় বলতে কিছুই নেই। দেখুন না, জাপানী শিশু ভূমিষ্ট হলে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় সিন্টো মন্দিরে, জাপানী যুবক-যুবতীর বিবাহ অনুষ্ঠান হয় খৃষ্টান গীর্জায়, আর তারা মৃতশয্যায় শায়িত হলে-তখনই আসে আমাদের কাছে মরদেহ সংস্কারের জন্যে। এছাড়া অন্য কোন ধর্মীয় সম্পর্ক জাপানীদের সাথে আমাদের নেই। পাঠক! জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষুর এই একটি মাত্র উজ্জ্বল উজ্জ্বলিতই বুঝে নিতে কষ্ট হবে না, জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের বর্তমান বাস্তব অবস্থা; এখন কোন্ পর্যায়ে আছে।

জাপানে বৌদ্ধ ধর্মের এই অচলায়তনের মূলকারণ হলো, জাপানে যারা বিবাহিত হয়ে যুগযুগ ধরে নিজেদেরকে ভিক্ষু বলে বিশ্বাস করে চলেছেন; তাদের এই ভ্রান্ত দৃষ্টি-ভঙ্গির মৌলিক পরিবর্তন সাধন করা। তারা যদি বলেন, আমরা মূল বৌদ্ধ ধর্মের থেরবাদী দর্শন অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম বাদকে গ্রহণ করে, বিশ্বে আমাদের অর্থনৈতিক প্রতিপত্তিকে হারাতে রাজি নই। তাহলেও আপত্তি নেই। কিন্তু জাপানে বৌদ্ধধর্মের সবচেয়ে বড়ো অন্তরায় হলো প্রব্রজ্যার মূল্য আদর্শ হতে বিচ্যুতি। বুদ্ধ তথাগত “সম্বোধো ঘর বাসে;। অব্ভকাসো পক্কজ্জা”; এই উপমা দিয়ে প্রব্রজ্যা জীবনের যেই মৌলিক দিকটিকে নির্দেশ করেছেন, জাপানী বর্তমান ভিক্ষু দাবীদারগণ বিবাহিত জীবনকে বরণ করে নিয়ে, সেই মৌলিক আদর্শ এবং তার শক্তি হতে বহু দূরে সরে গেছেন। বর্তমান জাপানী ভিক্ষুরা সংঘ বা নিকায়ের ঐক্যতার দাবী যতই করুন না কেন, আর্থিক শক্তি মত্তা যতই প্রদর্শন করুন না কেন, পারিবারিক পিছু টান মুক্ত চিন্তা শক্তির অধিকারী, তাঁরা বর্তমান জীবনাচারে কিছুতে অর্জন করতে পারবেন না। সহজ

কথায় জাপানী ভিক্ষুদের বর্তমানে ধর্ম-সেবা বলতে বালি চরের খুঁটিতে আবদ্ধ নৌকার বৈঠা টানা তুল্য। যেখানে আছেন সেখান থেকে, এক কদমও অগ্রসর হতে পারবেন না। এই সত্যটি উপলব্ধি করে, জাপানী বৌদ্ধ সংঘকে মৌলিক বুদ্ধ শিক্ষা ও আদর্শের আলোকে সম্পূর্ণ নতুন একটি ব্রহ্মচারী জীবন রীতি প্রবর্তন অবশ্যই করতে হবে। আর তাহলো, জাপানী নারী-পুরুষের সম্মিলিত একটি অনাগারিক-অনাগারিকা সংঘের জন্ম দেয়া। জাপানের বর্তমান প্রজন্মের মধ্যে সন্তান জন্ম দান এবং সাংসারিক বন্ধনের ঝামেলায় না জড়ানোর একটি পশ্চিমী যান্ত্রিক মানসিকতা দিন দিন প্রবল হয়ে উঠছে বলে, শুনা যায়। এই মানসিকতায় নারী-পুরুষ কামসেবা করবে, অথচ সন্তান নেবে না। এমন প্রবৃত্তি তখনই অনৈতিক এবং মহা অপরাধের সামিল হবে, যদি তা জীবনের কোন মহৎ লক্ষ্য সাধনের উদ্দেশ্য, প্রণোদিত অনুপ্রাণিত না হয়। অর্থাৎ আমি অল্প শ্রমের বিনিময়ে মদ, জুয়া, কামাচারেই নিজেকে অবাধে সমর্পিত করবো কিন্তু স্বামী-স্ত্রী বা সন্তানের কোন দায়-দায়িত্ব নেবো না। এমন হীন উদ্দেশ্যে, এই অনীহা প্রবৃত্তি পরিচালিত না হয়ে, আমি নিজের স্ব-জাতি ও বিশ্ব-মানব সমাজের কল্যাণে আমার জীবনকে উৎসর্গীত করতেই স্বামী-স্ত্রীর জীবনে সন্তান কামনা করছি না। রূপ মহৎ সংকল্পেই পরিচালিত করতে হবে-জাপানী তরুণ সমাজের এই অনীহা প্রবৃত্তিকে। তখন তারা আগারিক তথা সাধারণ জন-জীবনের আওতাভুক্ত হয়েও, মহাত্যাগময় বৌদ্ধিক চেতনা সমৃদ্ধ অনাগারিক অনাগারিকা জীবনের মহাশক্তিকে ধারণ করতে পারবে অতি সহজে। এই অনাগারিক-অনাগারিকা সংঘের জীবনকে সমৃদ্ধ করতে হলে, বুদ্ধ প্রণীত এই ছয়টি সংঘমশীল অবশ্যই প্রতিপালন করতে হবে, তাদেরকে; যথা- ১. আপন মনে অন্যকে ঘৃণা, প্রতিশোধ স্পৃহা, হত্যা, আঘাত, বা যে কোন কারণে দুঃখ দানের ইচ্ছাকে সম্পূর্ণ বর্জনের অভ্যাস গঠন করতে হবে।

২. পর দ্রব্যের প্রতি লোভ, অন্যায় ভাবে ধন উপার্জন বা আত্মসাতের স্পৃহা সম্পূর্ণভাবে বর্জনের অভ্যাস গঠন করতে হবে, ৩. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ব্যতীত, অন্য কোন উপায়ে কাম-সেবন প্রবৃত্তি সম্পূর্ণ ভাবে বর্জনের অভ্যাস গঠন করতে হবে। ৪. জীবনান্তে ও মিথ্যা বলা, শঠতা বা প্রতারণা মূলক আচরণ করার ইচ্ছা ত্যাগের অভ্যাস গঠন করতে হবে। ৫. জীবন ধারণের নূন্যতম প্রয়োজনে যেই আহার পানীয় ও ঔষধ জাতীয় দ্রব্যের ব্যবহার প্রয়োজন; তার বাইরে অন্য কোন আহার পানীয় বা নেশাজাতীয় দ্রব্য সেবনের ইচ্ছা সম্পূর্ণ ভাবে বর্জনের সাধনা করতে হবে। ৬. প্রমত্ততা উৎপাদক নাচ, গান, বাদ্যের মাধ্যমে আনন্দ উপভোগ ত্যাগ করে, দেহ মনে পবিত্র প্রশান্তি উৎপাদক গান ও ধ্যান-ভাবনায় আপন চিত্তকে জ্ঞানমূলক পথে পরিচালনার শক্তি অজনের সাধনা করতে হবে।

কেবল জাপানী বৌদ্ধ সমাজ জীবনে নহে, বিশ্বের সকল বৌদ্ধ সমাজে এমন একটি আদর্শ জীবন ধারা প্রবর্তন সম্ভব হলে, এই মহতো মহান জীবনের মাধ্যমে শুধু স্ব-সমাজকে নহে, সমগ্র বিশ্বে ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হবে একটি সংঘবদ্ধ বৌদ্ধিক প্রয়াস। থেরবাদ মহাযান নির্বিশেষে বৌদ্ধ সমাজ জীবনে বুদ্ধ প্রণীত অনাগারিক-অনাগারিকা জীবনের এই মডেল, কেবলমাত্র বৌদ্ধ সমাজে নহে, বর্তমান বিশ্বের শান্তিকামী সকল সমাজে বিহার আশ্রয়ী জীবনের বাইরে ও গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করতে পারে।

চীন-সম্রাজ্য হতে বৌদ্ধ ধর্ম কোরিয়ার উপর দিয়েই জাপানে প্রবেশ করেছে বলে ঐতিহাসিক রেকর্ড আছে। বর্তমানে সেই কোরিয়া দেখলাম বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির অনুশীলনে জাপানীদের চেয়ে দক্ষিণ কোরিয়ানরা উন্নত। কোরিয়ান বৌদ্ধ সমাজে ভিক্ষু-ভিক্ষুণীরা এখনো ব্রহ্মচর্য-জীবন যাপনে অভ্যস্ত। কিন্তু, তাঁরা লোকালয় হতে দূরে অবস্থিত বিহারাশ্রয়ী জীবনের কর্ম-কাণ্ডেই নিজেদেরকে সবিশেষ ব্যস্ত রাখেন। জনগণের সাথে তাদের সম্পর্ক হয় বিহারের প্রয়োজনে, এবং উৎসব-অনুষ্ঠানাদি উপলক্ষে। মানুষের প্রাত্যাহিক জীবনের কর্মকাণ্ডে ধর্ম-প্রেম জাপ্রত রাখা যায়, এমন কোন কার্যক্রম কোরিয়ান বৌদ্ধ সমাজে চালু আছে কি-না আমার জানা নেই। অধিকন্তু, বর্তমান বিশ্বে ধর্ম-ভিত্তিক সমাজ গঠণে খৃস্টান ও ইসলামী মিশনারদের তৎপরতা; ইসলামী রাষ্ট্রের প্রশাসনিক শক্তি ধর্মের প্রচার শক্তি বৃদ্ধিতে ব্যবহার, এবং বিশ্বব্যাপী শিক্ষা, স্বাস্থ্য সহ অর্থনৈতিক মানব সেবামূলক কর্মসূচির সম্প্রসারণ, শুধু কোরিয়ায় নহে পৃথিবীর যে কোন দেশের বৌদ্ধ সমাজকে তার অস্তিত্ব রক্ষায় এক বিরাট চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছে এ সকল মিশনারীরা। অথচ বিশ্ব বৌদ্ধ সমাজে তা ভীষণভাবে দুর্বল, এমন কি উপেক্ষিত ও বটে। কোরিয়ান সমাজে বৌদ্ধ সমাজের এসকল দুর্বলতার সুযোগে, সেখানকার খৃষ্টান মিশনারী গুলো নগর-পল্লীর অলিতে গলিতে গড়ে তুলেছেন অসংখ্য মিশনারী স্কুল, হাসপাতাল ও গীর্জা। জনজীবনের এসকল জরুরী প্রয়োজন মেটানোর মাধ্যমে তাঁরা ব্যাপক ভাবে খৃষ্টীয় প্রভাব। বিস্তার করে ফেলেছেন; যা আমি স্বচক্ষেই দেখে এসেছি ১৯৯২ খৃস্টাব্দে আমার কোরিয়া ভ্রমণ কালে। ফলে মাত্র কয়েক দশকের ব্যবধানে বৌদ্ধ প্রধান দক্ষিণ কোরিয়া, বর্তমানে খৃষ্টান প্রধান দেশে পরিণত হয়ে গেল!

এবারে তাইওয়ান সহ বিশাল চীন, যারা বিশ্বের সমগ্রলোক সংখ্যার প্রায় এক তৃতীয়াংশ; সেই চীনা-জাতির কথাই বলি। এককালে চীনা জাতি বলতে শুধু বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারীই বুঝাতো। অর্থাৎ চীনা জাতির একশোভাগ সকলেই ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। চীনের আদি ধর্মনীতি বা সামাজিক বিশ্বাস নামক কনফুসিয়াস মতবাদ বুদ্ধের পঞ্চশীল আদর্শের সাথে একাকার হয়ে চীনা জনগণের লোকচা্রে এক সময় হাজার বছর ধরে নবতর উদ্দীপনার জন্ম

দিয়েছিল। দুর্ভাগ্য-ক্রমে সেই বিশাল চীনা বৌদ্ধ সমাজে ইতিহাস খ্যাত চীনা পরিব্রাজক ফাহিয়ান, হিউয়েনসাং এর ন্যায় অসংখ্য চীনা জ্ঞান-বিজ্ঞান পিপাসুদের মাধ্যমে ক্রমে প্রবেশ করতে থাকে, বৌদ্ধ ভারতের অস্তিম লগ্নের বিষাক্ত, পচা দূর্গন্ধ, ঘৃণিত তান্ত্রিক ও সহজিয়া মহাযানী মতাদর্শ সমূহ। বহু শতকের আচরিত ও অভ্যস্ত বুদ্ধের মৌলিক দর্শন ভিত্তিক সমাজ জীবনটি যুগে যুগে তার অনিবার্য পরিবর্তনের মূল্যায়ণে দাবীতে তার জনগত ঐতিহ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে, এক এক সময়ে কিছু না কিছু সংযোজন-বয়োজন অবশ্যই করতে হয়; অসাধারণ দূর দৃষ্টির মাধ্যমে। ‘ভাঙবো তবু মচকাবো না’ এই একান্তবাদী প্রবাদের সাথে বন্ধুত্ব করতে গিয়েই, মহান বুদ্ধের পরিনির্বাণের মাত্র তিন মাসের মাথায় বুদ্ধের সংঘে ভিন্নমত মাথাচাড়া দিতে দেখা যায়। আর সেই একান্তবাদীতার সুযোগ, বিকৃত-রুচিবানেরা একবার পেলেই হলো; তাদের অবাধ-রুচির সহস্র বাহু বিস্তারে তারা বিন্দুমাত্রও কাল-বিলম্ব করে না। ভাগ্যিস সম্রাট অশোক সময়ের মোগলিপুত্র তিষ্য স্থবিরের ন্যায় সংঘের কিছু মহান ব্যক্তিত্বকে পরবর্তী কালে বেশ দূরদর্শীতার পরিচয় দিতে দেখা যায় বিভিন্ন সময়ে। তাঁদের সেই মহান অবদানেই বুদ্ধের দর্শন ও শিক্ষা ভারতের বুকে না হলেও বহির্বিশ্বে বহু চড়াই-উত্ৰাই বেয়ে, বহু উত্থান-পতনের আঘাত খেয়ে খেয়ে আড়াইটি হাজার বছর অতিক্রম এসেছে এ বিশ্বের বুকে।

চীনা জন সমাজে বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের প্রলম্বিত ইতিহাসের গতি ও ছিল ঠিক ভারতেরই মতো। মহাযান মতবাদ ভারত থেকে খৃস্টীয় প্রথম শতকে তার স্বর্ণ-যুগেই মহাচীনের মাটিতে অঙ্কুরিত হয়েছিল। ইহা ছিল চীনা জনগণের জন্যে আশীর্বাদ স্বরূপ। অবাধ পরিবর্তনের প্রশ্রয়বাদী মহাযানের অভিশাপে তান্ত্রিক-সহজিয়া মতাদর্শটি বাংলা বিহার উড়িষ্যা ও মধ্য প্রদেশের মাটি থেকে উৎসারিত হয়ে খৃস্টীয় ৭ম, ৮ম থেকে একাদশ শতক পর্যন্ত অভিশাপ হয়ে প্রবেশ করে মহাচীনের মর্ম মূলে। ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের এই দুর্বল মুহূর্তে ব্রাহ্মণ্যবাদের খড়্গ এবং ইসলামের তরবারীর ক্রমাগত ঝড়ো হাওয়া একাদশ, দ্বাদশ শতাব্দীতে বৌদ্ধ দুর্বল প্রদীপটিকে ভারতে যে ভাবে সহজে নিভিয়ে দিল; মহাচীনে বৌদ্ধ মতের পৃষ্ঠ পোষক প্রবল-প্রতাপী চীনা সম্রাটের বংশধরগণের একক আধিপত্যের কারণে চীনা-সমাজের বৌদ্ধ ধর্ম সে সময়ে গুণগতমানে মূলে দুর্বল হলেও টিকে থাকে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত। গাঁজা, মদ, ভাঙ এই তিন মরণাস্ত্রের নেশায় ডুবে থাকা চীনা বৌদ্ধ সমাজের লৌহ কবাট ভাঙলো, ঘোর বস্ত্র-তান্ত্রিক কমিউনিষ্ট মতবাদ, চীনের শাসন ভার গ্রহণের মধ্য দিয়ে। নতুন চীনের এই অভ্যুদয় প্রকৃত বুদ্ধ মতবাদের জন্যে কখনো কাল হয়ে দাঁড়াতে না। যদি চীনের মাটিতে বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা ও আদর্শ প্রাণবন্ত থাকতো এমন কি কমিউনিষ্ট মতাদর্শ চীনা জনগণের কাছে মোটেই গ্রহণ যোগ্য বিবেচিত হতো না

বৌদ্ধ আদর্শ সাম্যবাদের প্রভাবে। কিন্তু, বুদ্ধের নামে অবুদ্ধের আচারে নিমজ্জিত। চীনা ধর্ম-গুরুদের সহায়তায় চীন-সম্রাটের বংশধর ও তাঁদের প্রশাসন, চীনের সাধারণ মানুষের রক্তমাংস যে ভাবে নিঃশেষ করে দিয়েছিল; তার পরিণতিতে দিশেহারা চীনা জনগণ ঘোর বস্তুতান্ত্রিক বিদ্রোহের উদ্গাতা কমিউনিজমকেই আশীর্বাদ স্বরূপ গ্রহণে বাধ্য হয়েছিল।

তাই চীনা কমিউনিজমের ঘোর শত্রু হয়ে পড়েছিল চীনের প্রতিটি বৌদ্ধ-মঠ। সে সকল মঠে সুরক্ষিত ছিল হাজার হাজার বছরের মহাচীন ও ভারতের কৃষ্টি-সংস্কৃতি, ধর্ম-দর্শন, ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিশাল বিশাল পাঠাগার। আধুনিক চীনের মহান নেতা মাও সেতুং এর ক্রোধের আগুনে সেই জ্ঞান সমৃদ্ধ হাজার হাজার পাঠাগার গুলোতে বিশাল রহি উৎসব উদ্‌যাপিত হলো; সাংস্কৃতিক বিপ্লবের নামে। এদিক দিয়ে মাও সেতুং নামক চীনের এই ভাগ্য-বিধাতা; তক্ষশীলা, নালন্দা, বিক্রমশীলা ধ্বংসকারী মুসলিম সেনাপতি মুহম্মদ ঘোরী, বিন-বক্তার খিল্জী সবাইকে অতিক্রম করে গেলেন। তাই মহাচীনে বৌদ্ধ ধর্মকে এখন মিউজিয়ামে দেখেছি। ১৯৯০ খৃষ্টাব্দে চীন ও মঙ্গোলিয়া ভ্রমণ কালে।

তাইওয়ান হংকং, সিংগাপুর, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়ায় সংখ্যালঘু হিসেবে অবস্থানকারী বৌদ্ধ জনতা, বৌদ্ধ ধর্মকে কি ভাবে ধরে রেখেছেন? এই প্রশ্নের উত্তর বেশ জটিল হলেও বলা যায়, বৌদ্ধ কর্মবাদের মানবিক দিকটির পৃষ্ঠপোষক মহাযান মতবাদের প্রতি হাজার বছরের ঐতিহ্যের প্রতি মৃদুমান অনুরাগের গুণে, তাঁরা স্ব স্ব অবস্থানে অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় অন্যান্য সম্প্রদায় হতে বেশ এগিয়ে আছে। কিন্তু, সংখ্যা লঘুর অভিশাপে তারা ও কম ভোগান্তির শিকার নহেন। যেমন, মালয়েশিয়ায়, এই চীনা বৌদ্ধরা পেনাং শহরে একটি উঁচু চুড়া বিশিষ্ট বিহার নির্মাণ করতে গিয়ে, স্থানীয় মসজিদের মিনারের চুড়ার উচ্চতাকে অতিক্রম করায়, বিহার মন্দিরের চুড়া ভেঙ্গে দিতে হলো। এ জাতীয় অনেক দমন নীতি তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য সহ অন্যান্য ক্ষেত্রে ও আরোপিত হয়েছে সরকার কর্তৃক। ১৯৯০ এ আমার মালয়েশিয়া ভ্রমণকালে স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষ করে এসেছি। ১৯৮২ থেকে ৮৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত শ্রীলংকায় মহরাগমা ভিক্ষু ট্রেনিং সেন্টারে আমার অবস্থান কালে সুপাণ্ডো নামে চীনা বংশোদ্ভূত এক ইন্দোনেশিয়ান যুবক ও সেখানে ছিলেন। তারই মুখে সেখানকার বৌদ্ধদের একই দুর্দশার কথা শুনেছি। তবে ইসলামের তুলনায় বহু গুণে সহনশীল খৃস্টীয় মতবাদের কারণে তাইওয়ান, সিংগাপুর, হংকং এর বৌদ্ধদেরকে অনেক সহজ-স্বাচ্ছন্দ্যে জীবন যাপন করতে দেখেছি, ১৯৯৪ সালে এ সকল দেশ ভ্রমণকালে।

বলতে গেলে বর্তমান বিশ্বে ভীষণ ভাবে মূ্যমান থেরোবাদী বৌদ্ধ জন-গোষ্ঠীর তুলনায়, মহাযানের কর্মতৎপরতা বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী বহু গুণে তেজোদীপ্ত; অতি সামান্যতম বুদ্ধ শিক্ষার যথার্থ ব্যবহার করতে পেরে। কিন্তু, বিশ্বব্যাপী খৃস্টান ও ইসলামী মিশনারী নেট ওয়ার্কের সামনে বুদ্ধ প্রেমে দুর্বল এই বিত্তশালীদের দ্বারা বুদ্ধবাণীর প্রচার প্রসারে যা হচ্ছে তা দিবালােকে প্রদীপ শিখার ন্যায় বড়ই করুণ।

থেরোবাদ অধ্যুষিত বৌদ্ধ সংখ্যাগুরু-লঘুরা কেমন আছেন? থেরোবাদী বৌদ্ধ সংখ্যা গুরুদের অবস্থাঃ

পূর্বেই বলেছি ভারত থেকে উৎসারিত মহাযানী আচার সংস্কার প্রথম প্রতাপে এক সময় বর্তমান থেরোবাদী রাষ্ট্র শ্রীলংকা মায়ানমা, থাইল্যান্ড, কম্বোডিয়াকেও ব্যাপকভাবে আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল। নানা-দেবদেবীর মূর্তি পূজা এবং তন্ত্র-মন্ত্র, গণা-পড়া ইত্যাদি জনপ্রিয়তা তাই এখানো পর্যন্ত পুরোদমে বিদ্যমান আছে এসব দেশের বৌদ্ধ সমাজে। শ্রীলংকায় আমার অবস্থান কালে তথাকার প্রথম পুণ্যতীর্থ অনুরাধাপুরে এক প্রাচীন মন্দিরের ভগ্নস্বূপে পাওয়া গিয়েছিল বহু স্বর্ণপাতে উৎকীর্ণ মহাযানে প্রধানগ্রন্থ ‘প্রজ্ঞাপারমিতা’র সম্পূর্ণ অংশ। এসবের পরেও, থেরোবাদী বৌদ্ধ রাষ্ট্র সমূহের বৌদ্ধ জনগণের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ও সামাজিক বর্তমান অবস্থা নিম্নে তুলে ধরা হলো-

শ্রীলংকাঃ সেই শৈশব থেকেই শুনে আসছিলাম শ্রীলংকার কথা। আমার জন্মস্থান জোবরা সুগত বিহারের অধ্যক্ষ প্রয়াতঃ উপ-সংঘরাজ গুণালংকার মহাস্থবির ছিলেন সেই দক্ষিণ শ্রীলংকার পানাদুরা শহরের বিখ্যাত বিদ্যোদয় পিরিবেণে শিক্ষা লাভ করা একজন কীর্তিমান বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষু। তিনি আমার পিতামহ মৃত্যুঞ্জয় বড়ুয়ার ছোট ভাই, কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় অধীনে পালি শিক্ষায় প্রথম বিনয় বিশারদ উপাধি-প্রাপ্ত ভিক্ষু মুণিন্দ্র প্রিয়ের একমাত্র শ্রমণ শিষ্য। পরবর্তীতে চতুর্থ সংঘরাজ বরজ্ঞান মহাস্থবিরের নিকটে উপসম্পদা গ্রহণ করে তিনি ভদন্ত গুণালংকার ভিক্ষু নামে ধর্ম-বিনয়ে উচ্চ শিক্ষার্থে শ্রীলংকার এই পানাদুরা বিদ্যোদয় পিরিবেণে গমন করেন। এদেশের বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে তখন সদ্ধর্মের পুণরুত্থানে প্রবর্তিত, ১৮৬৪ খৃস্টাব্দের সমাজ-ধর্ম সংস্কার আন্দোলনের জোয়ার চলছিল। বিনয়াচার্য বংশদীপ, আর্যপুরুষ জ্ঞানীশ্বর, অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরদের সতীর্থ ছিলেন এই গুণালংকার মহাস্থবির। তাঁরা শ্রীলংকা থেকে শিক্ষা শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করে, ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের আন্দোলনে নিবেদিত হয়েছিলেন। তাঁদেরই অক্লান্ত প্রয়াসে এদেশে সর্বপ্রথম কঠিনচীবর দানানুষ্ঠানের প্রথা প্রবর্তিত হয়। এই গুণালংকার মহাস্থবিরকে দেখেছি, তিনি জন্ম-জাত গ্রাম জোবরা সুগত বিহারে অবস্থান করে সমগ্র উত্তর-পশ্চিম চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম সহ-নোয়াখালী, কুমিল্লা পর্যন্ত

অত্যন্ত সার্থক ভাবে ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের গতিবেগ সৃষ্টি করেছিলেন। তাঁর সেই সাফল্যে অত্র বিস্তীর্ণ অঞ্চলের বৌদ্ধ সমাজ থেকে শনিপূজা, লক্ষীপূজা, কার্তিক পূজা, স্বরস্বতী পূজা, ইত্যাদি অনেক অনেক হিন্দু আচার, প্রায় অপঃসৃত হয়ে গিয়েছিল। তিনি লক্ষী পূজার পরিবর্তে শ্রীলংকার পদ্ধতিতে বুদ্ধ পূজা ও অষ্টশীলাদি উপোসথ ব্রতের প্রচলন করেছিলেন; এবং কার্তিক পূজার পরিবর্তে বুদ্ধ-ভাত-নামে পাছা ভাত-রান্নার নির্দেশ দিয়েছিলেন। দেখা গেছে, যারা তাঁর নির্দেশ, অমান্য করতো, তাদের কে দণ্ড স্বরূপ বিহারে বালুটানা এবং বোধিবৃক্ষের গোড়ায়জল ঢালার দণ্ড দিতেন। এই মহাজীবনের আকর্ষণেই বুদ্ধশাসনে জন্ম-নিয়েছিলেন আলীশ্বরের বিনয়ধর পূর্ণানন্দ মহাস্থবির, জ্যোতিপাল মহাস্থবির, ত্রিপুরার ডক্টর বুদ্ধদত্ত স্থবির, উপ-সংঘরাজ ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবির, বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির প্রমুখ অনেক গুণী শিষ্য। উল্লেখ্য যে, চারশতাধিক গুণী শিষ্যের জনক সাধক কুলতিলক আর্যপুরুষ ভদন্ত সাধনানন্দ মহাস্থবির মহোদয়ের উপদ্যায় তথা উপসম্পদা গুরুও ছিলেন এই গুণালংকার মহাস্থবির।

শ্রীলংকার কথা বলতে গিয়ে কেন গুণালংকারের এতো কথা এলো? কারণ, সেই গুণালংকার এদেশের হিন্দু আচারে সংস্কারে নিমজ্জিত বৌদ্ধদের দৈনন্দিন ধর্মীয় জীবনে বৌদ্ধোচিত যেই পরিবর্তন আনায়ন করেছিলেন তা শুধু সম্ভব হয়েছিল তাঁর শ্রীলংকান শিক্ষাগুরুদের আদর্শ জীবনাচার, চিন্তন ও মননকে আপন জীবনে গভীর আন্তরিকতায় ধারণের ফলেই। ভদন্ত গুণালংকার এদঞ্চলের বৌদ্ধ ভিক্ষু গৃহীকুলের নিকট ছিলেন সত্যিকারের এক আদর্শ শিক্ষা গুরু। তাঁর পুঁত জীবনের প্রত্যক্ষ পরশ ধন্য হওয়ার ভাগ্য, আমার জীবনে হয়েছিল অতি সামান্য। তবুও জোবরা সুগত বিহারে তাঁরই সুসজ্জিত শ্রীলংকান অক্ষরের পবিত্র ত্রিপিটকের গ্রন্থাগার, এবং বিরাট ধর্মশালায় সুসজ্জিত শ্রীলংকা থেকে আনায়ন করা উইলিয়াম ফেডরিক্স এর আঁকা বুদ্ধের সমগ্রজীবন ভিত্তিক চিত্রাকর্ষক বিশাল বিশাল ছবিগুলো সেই শ্রীলংকার প্রতি দূর্গিবার এক আকর্ষণের জন্ম দিয়েছিল আমার মনে সেই শৈশবে। কৈশোর থেকে যখন যৌবনে পদার্পন করলাম তখন এগুলো সবকিছুই এক সময় মনের পর্দা থেকে মুছে গিয়েছিল। ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধ আমার জীবনে এনে দিল প্রব্রজ্যা। সেই প্রব্রজ্যাই আমার জীবনে যেন অনিবার্য করে দিল শৈশব-কৈশোরের স্বপ্নের বাস্তবায়ন। আমার শ্রামণ্য শিক্ষা গুরু এবং ভিক্ষুত্বের দীক্ষাগুরু বিদর্শনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরো মহোদয়ের ঐকান্তিক ইচ্ছায় ১৯৮২ থেকে ৮৫ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত আমাকে শ্রীলংকায় পালি ভাষা ও ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়নের লক্ষ্যে অবস্থান করতে হয়েছিল। চার বছর কাল আমার শ্রীলংকার জীবনটি অতি কাছে থেকে, শ্রীলংকার ইতিহাস ও তার চলমান পরিবেশ পরিস্থিতিকে গভীর ভাবে জানার ও বুঝার সুযোগ আমাকে এনে দিয়েছিল।

শ্রীলংকার ঐতিহাসিক পদযাত্রা শুরু হয় খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতকে, মহামতি সম্রাট অশোক তনয়-তনয়া থেরো মাহিন্দ এবং থেরী সংঘমিত্রা, এ দু'ই জনের লংকার মাটিতে পদার্পন থেকে। তাঁরাই শ্রীলংকান জন-জীবনে বুদ্ধ-ধর্মের গোড়া পত্তনকারী। তবে এই দ্বীপরাষ্ট্র সিংহলের দ্বীপবংশ নামক সুপ্রাচীন ইতিহাস গ্রন্থটি শ্রীলংকায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসকে আরো তিনশত বছর এগিয়ে নিয়ে বুদ্ধের পরিনির্বাণের ক্ষণটিকে মাইলফলকে পরিণত করেছে। এই দ্বীপবংশে বর্ণিত হয়েছে, জম্মুদ্বীপ নামক ভারতবর্ষে যে দিন বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণ লাভ হয়, সেদিনে সিংহলদ্বীপের মাটিতে বাঙ্গালী সন্তান, রাজকুমার বিজয় সিংহ সপরিষদ নৌযান হতে সিংহল দ্বীপের মাটিতে পা রাখেন। সেই বিজয় সিংহই ভারত মহাসারের বুকে এই ক্ষুদ্র ব-দ্বীপে সিংহলী জাতির জন্মদাতা। তাঁরই স্মৃতিতে দ্বীপটির নাম হয় সিংহল। বিজয় সিংহের মাতৃভূমির পরিচয় স্বরূপ সিংহলী মাতৃজাতির কর্ণে অতি আদরে ব্যবহৃত একটি অলংকারের নাম রাখা হয় 'বাঙ্গালী বালালো'। বাঙ্গালী জাতীয় জীবনে বৌদ্ধধর্মের সূচনা কাল নির্ণয়ে ঐতিহাসিকদের মধ্যে যেই বিতর্ক, তার অবসান ঘটাতে পারে লংকাদ্বীপে সিংহলী জাতির অভ্যুদয়ের এই ঘটনাটি। বিজয় সিংহের সিংহল দ্বীপে আগমনের পূর্বেই ভগবান বুদ্ধ এই দ্বীপে এসে তথাকার সর্বোচ্চ পর্বত মালা সুমন-পর্বত শৃঙ্গে তাঁর পবিত্র পদচিহ্নটি অধিষ্ঠান স্বরূপ রেখে যান এই বলে, অনাগত কালে এই দ্বীপটিই হবে আমার প্রচারিত সদ্ধর্মের প্রকৃত সংরক্ষক।

দ্বীপ বংশ-নামক গ্রন্থে ধারণকৃত ২৫৫০ বর্ষ পূর্বের এই উক্তি আশ্চর্যজনক ভাবে যে সত্যে পরিণত হয়েছিল, বিশ্ব-ব্যাপী বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসই তার সাক্ষী।

অতীতে এই শ্রীলংকা একমাত্র প্রতিবেশী তামিলদের দ্বারা বহুবার আক্রান্ত ও পর্য্যদস্থ যে হয়েছিল, তার ঐতিহাসিক ও পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন শ্রীলংকার যত্র-তত্র এখনো বিদ্যমান। মহানবুদ্ধ ও থেরো মাহিন্দ এবং থেরী সঙ্ঘমিত্রার শিক্ষা, তাঁদেরকে এই নিকট প্রতিবেশীর প্রবল আঘাত থেকে বার বার রক্ষা করে এসেছে। এই তামিলদের সৃষ্ট বর্তমান ধ্বংসজ্ঞের অবসান যে একদিন হবেই হবে, শান্তিপ্রিয় অহিংসবাদী সিংহলীদের মনে সে বিশ্বাস এখনো শেষ হয়ে যায়নি। তবুও বুদ্ধ শিক্ষার কিছু অপঃপ্রয়োগ সিংহলী জাতির বর্তমান দুঃখ-দুর্দশা সমূহের কারণ বলে, আমার একান্ত বিশ্বাস। যেমন সিংহলী বৌদ্ধ শিশু থেকে বৃদ্ধ পর্য্যন্ত প্রায় সকলেই উদাস উদাস ভাব, এবং অতি অল্পে সন্তুষ্ট থাকেন। তাদের পোষাক পরিচ্ছদ খুবই সাদাসিধে, গয়ে অলংকার বলতে কিছুই থাকেনা। খাদ্য উপকরণতো লতা-পাতা সর্বস্ব বললেই চলে। হাতে গোণা কয়েকজন বিত্তবান ব্যক্তিছাড়া, বাদ-বাকী সকলেই অবস্থান করেন, থেরো মাহিন্দা প্রদত্ত নব্বা অনুযায়ী অতি অনাড়ম্বর বসত-বাড়ীতে। তবে কি ধনী, কি

দরিদ্র সকলের বসতবাড়ী অতিশয় পরিচ্ছন্ন, যেমন এক একটি পুষ্প উদ্যান। বলহিলাম সিংহলী জাতির এই উদাস ভাব এবং অল্পে তুষ্টি মনোবৃত্তির জন্য দাতা হচ্ছে; পত্র-পত্রিকা, রেডিও, টেলিভিশন, বিহার-পিরিবেণ সহ যাবতীয় ধর্মানুষ্ঠানে ভিক্ষুদের কণ্ঠে, চব্বিশটি ঘণ্টার নিদ্রা ব্যতীত অবশিষ্ট সময়ে যা শোনা যায়, সবই সংসার বিমুখি অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মবাদী ধর্মদেশনা। কর্মোদ্যাগে, কর্মপ্রেরণা দায়ক কথা-বার্তা যা শোনা যায় তাও যেন অত্যন্ত প্রাণহীন, শুধু কথার কথা মাত্র। ধর্ম-গুরুদের স্থান-কাল-পাত্র জ্ঞানহীন এসকল ধর্ম দেশনার প্রভাব সিংহলী বৌদ্ধদেরকে 'না ঘরকা, না বাহির কা' ঠিক এমন একটি দোলায়মান মানসিকতার জন্য দিয়ে চলেছে বহুযুগ ধরে। ফলে তারা গৃহী হয়েও প্রায় বিরাগ প্রবণ মানসিকতার অধিকারী। এই মানসিকতা তাঁদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্যের মতো সৃজনশীল, ঝুঁকি পূর্ণ, দিনে-রাতে উৎকর্ষিত থাকার জীবিকায়, মোটেই অনুপ্রাণিত করে না। তাই ঝুঁকি হীন, চিন্তামুক্ত, কেবল চাকুরী ও কৃষ্টি জীবিকার প্রতিই তাঁদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশী। ফলে শ্রীলংকায় বৌদ্ধরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হয়েও, তারা সংখ্যা লঘু ব্যবসায়ী জাতি মুসলিম, তামিল, ও খৃস্টানদের অধীনে চাকুরী করেই জীবন-জীবিকা নির্বাহ করে থাকে। শ্রীলংকার রাষ্ট্রীয় অর্থনীতির চালিকা শক্তি তাই সংখ্যা গুরু দরিদ্র সিংহলী বৌদ্ধদের হাতে নহে, সংখ্যা লঘু হিন্দু তামিল, মুসলিম ও খৃস্টানদেরই হাতে। আধুনিক গণতন্ত্র সিংহলীদেরকে রাজদণ্ড হাতে পাওয়ার সুযোগ এখনো দিচ্ছে; কিন্তু আধুনিক বেনিয়া অর্থনীতিই তো রাষ্ট্র-যন্ত্রকে নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। আর সে কারণেই অর্থ-বিশ্বে, ব্যবসা-বাণিজ্যে একছত্র আধিপত্যের অধিকারী তামিলরা আজকে আকাঙ্ক্ষা করছে শ্রীলংকার বুকে সিংহলী প্রভাব মুক্ত স্বাধীন ভূমি। অপরদিকে শ্রীলংকার মুসলিমেরা উদগ্রীব হয়ে আছে, আগামী কাল তাঁদের জন্যে ও পৃথক একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠণে উদ্যোগী হওয়ার।

বুদ্ধ শিক্ষার অপ-প্রয়োগই সিংহলী সংখ্যা-গরিষ্ঠ বৌদ্ধ জন গোষ্ঠীর বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার মূল কারণ কি, না; প্রিয় পাঠক! তা এখন আরো একবার চিন্তা করতে অনুরোধ জানাই। একই দৃশ্য আমি স্বচক্ষের প্রত্যক্ষ করলাম থেরোবাদী বৌদ্ধ অধ্যুষিত দেশ থাইল্যান্ড ও মায়ানমা রাষ্ট্রে বৌদ্ধ জনমানসে।

বৃটিশ শাসনামলে সিলোনে ভারতের তামিলনাড়ু থেকে চাঁ-বাগানের কুলি রূপে আশ্রয় নেয়া হিন্দু, মুসলিম ও খৃস্টানরা ক্রমে বাড়তে বাড়তে এখন সে দেশের মোট জনসংখ্যার ৩০% ভাগ এ গিয়ে দাঁড়িয়েছে। সেই সংখ্যা লঘুদের সংখ্যা ইদানিং আরো দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে বিগত দুইদশকের মধ্যে। তার কারণ হিন্দু ও খৃস্টান তামিলদের সাথে শ্রীলংকার চলমান যুদ্ধে বহু শ্রীলংকান বৌদ্ধযুবক প্রাণ দিয়েছে, তাঁদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা ভীষণ ভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। দরিদ্র সিংহলী বৌদ্ধদের বহু সুন্দরী কন্যা ধনাঢ্য মুসলিম তামিলদের সাথে

বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ হচ্ছে ক্রমবর্ধমান হারে। অনেক দরিদ্র, অনেক সিংহলী চাকুরী, চিকিৎসাও শিক্ষা সহায়তা লাভের মাধ্যমে সপরিবারে খৃস্টান ধর্মের আশ্রয় নিচ্ছে। এসকল কারণ সমূহের সাথে যোগ হয়েছে ধর্মীয় প্রথাগত প্রব্রজ্যা সিংহলী বৌদ্ধদের সংখ্যা অতি দ্রুত কমিয়ে দিচ্ছে। নারী-পুরুষের মধ্যে ব্রহ্মচর্য প্রথাটি স্বাভাবিক নিয়মে জাতীয় জনসংখ্যার উর্ধগতি রোধ করে থাকে। বিপর্যয় মূলক কোন কারণ বৌদ্ধদেশে না থাকলেও, চিরকুমার প্রব্রজ্যা প্রথা জনসংখ্যা হ্রাস-বৃদ্ধি কোনটাই না ঘটায়, সর্বদা একটি ভারসাম্য অবস্থা, স্বাভাবিক নিয়মেই যে বজায় রাখে। তার প্রমাণ মায়ান্মা, থাইল্যান্ড ও কম্বোডিয়া রাষ্ট্র সমূহে দীর্ঘকাল ধরে জনসংখ্যার স্থিতিশীল অবস্থাটি।

বুদ্ধের শিক্ষায় ধর্মের নামে সাম্প্রদায়িকতা, বা ধর্মীয় প্রেরণায় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণের প্রথা, অথবা ধর্মের প্রচার প্রসারে রাজনীতিকে প্রভাবিত করার কোন বিষয় লক্ষ্য করা যায় না। তবু ও বুদ্ধের শিক্ষায় সর্বজীবে মৈত্রী-করুণাময় অসাম্প্রদায়িক মহনীয়তায় বিভিন্ন ধর্মীয় মতাবলম্বী দেশে বা বিভিন্ন জাতীয় জন-গোষ্ঠী অধ্যুষিত দেশে, শান্তি ও সম্প্রীতিপূর্ণ সহাবস্থানের লক্ষ্যে সম্রাট ধর্মাশোকের রাষ্ট্রনীতি, পরবর্তী কালে সম্রাট কণিষ্ক, সম্রাট হর্ষবর্ধন, এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার পাল রাজাদের ন্যায় অনেকেই রাজকীয় অনুশাসনকে বুদ্ধ শিক্ষার অনুকূলেই প্রয়োগ করেছেন। এবং বুদ্ধ শিক্ষা-উপদেশের প্রচার-প্রসারে এই রাজকীয় শক্তি যথেষ্ট সহায়তাদান করেছেন। অন্যান্য ধর্মাবলম্বী প্রজারা সেই বৌদ্ধপ্রেমী রাজা, সম্রাটদের এই পৃষ্ঠপোষকতা নিশ্চয় ভালো চোখে কোন দিন দেখেননি। এ-টাই স্বাভাবিক। তাই সময় ও সুযোগে তারা বিদ্রোহ করেছেন; এবং ক্ষমতা দখল করতে পারলে তাদের ধর্মীয় উন্মাদনা এবং সাম্প্রদায়িক রোষানলকে বৌদ্ধ কীর্তি ধ্বংসের কাজে লাগিয়েছেন। এমন কি বৌদ্ধগণ দমন-নিপীড়নের শিকার হয়ে ক্রমে নিশ্চিন্ত হয়েছে ভারত সহ বিশ্বের বিভিন্ন দেশ থেকে। এতদসত্ত্বেও বিশ্ব বুদ্ধকে সর্বজীবে মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার আদর্শবাহী, বুদ্ধ শিক্ষা আড়াই হাজার বছর ধরে কোটি কোটি অসাম্প্রদায়িক শান্তিপ্রিয় জনতার হৃদয়কে জয় করে করে এখনো টিকে আছে এবং ভবিষ্যতেও অবশ্যই থাকবে। আমার এই দৃঢ় বিশ্বাস অবশ্যই সত্য হবে, যদি বুদ্ধ অনুরাগীরা উপরোক্ত গুণাবলীকে প্রাজ্ঞতা ও দূরদর্শীতার সাথে স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী করে ব্যবহার করতে সক্ষম হন।

মায়ানমাঃ শ্রীলংকার বর্তমান দুঃখ-দুর্দশার যেই চিত্র আমি এপর্যন্ত দিলাম, ঠিক একই হুমকি বিরাজ করছে থেরোবাদী বৌদ্ধ প্রধান দেশ মায়ানমা এবং থাইল্যান্ডেও। আমি বিভিন্ন উপলক্ষে বহুবার থাইল্যান্ডে গেছি। কিন্তু মায়ানমাতে যাওয়া হয়েছে মাত্র একবার, সেই ১৯৯৫ খৃস্টাব্দে প্রয়াত অষ্টম সংঘরাজ শীলালঙ্কার মহাস্থবিরের সাথে ১৮দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে। তবে, শৈশব থেকে

আমার মা, বাবার মুখে প্রায় শূন্যতাম, তাঁদের দীর্ঘকাল বার্মাদেশে অবস্থানের অভিজ্ঞতার কথা। আমার বিশ্বাস ছিল, ভারতীয় মহাজনী সুদের ব্যবসায়ী, এবং বেণীয়া মাড়োয়ারী সহ প্রায় সব বিদেশীদের তাড়িয়ে দিয়ে মায়ানমার আর্মি-প্রশাসন নিশ্চয় সেদেশের শোষিত-দারিদ্রতা ক্লিষ্ট জনগণের ভাগ্য পরিবর্তনে সহায়ক হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তা-যে কিছুই হয়নি, ১৯৯৫ এ আমার সে দেশটি ভ্রমণ কালে স্ব চক্ষেই তা প্রত্যক্ষ করলাম। লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মুখে দিবা-রাত্র, যত্র-তত্র অনিত্য, অনিত্য ধর্মদেশনা শুনতে শুনতে কর্ম-বিমূখী বর্মী নর-নারীরা কেমন জানি এক আশ্চর্য আরামপ্রিয়, পলায়নী মনোবৃত্তির শিকার হয়ে পড়েছে। পুরুষেরা দলে দলে প্রব্রজ্যা নিয়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ভিক্ষা সর্বস্ব পরজীবিতে পরিণত হওয়া; আর মহিলারা ভোগের লালসায় সুযোগ পেলেই ধনাঢ্য ভিন্ধুধর্মালম্বীর সাথে দৈহিক সম্পর্ক স্থাপন করাটা, যেন জাতীয় চরিত্রেরই অঙ্গ। সেনা প্রশাসন বহুবিধ আইন করেও এই প্রবণতা দূর করতে পেরেছেন, এমনটি মনে হয় না। সবচেয়ে বড়ো কথা, বর্মী জনগণের দারিদ্রতার অবসানে তাদেরকে কর্মঠ জাতিতে পরিণত করাটাই ছিল জরুরী। কিন্তু বিগত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরে টিকে থাকা মায়ানমার সেনা প্রশাসন সে দায়িত্বটি পালনে ব্যর্থতো হলো-ই; অধিকন্তু তারাও এখন অসম্ভব রকমের ঠক্বাজী ও দুর্নীতির পঙ্কিল আবর্তে নিমজ্জিত। ফলে সেখানকার বৌদ্ধ জনগণ কেমন আছেন, তার কয়েকটি উদাহরণ দিলে বিষয়টি বোধগম্য হতে মোটেই কষ্ট হবে না।

১৯৯৫ খৃস্টাব্দে আমাদের একটি সংস্থাকে মায়ানমা সরকার সে দেশে ১৮ দিনের সরকারী সফরের আমন্ত্রণ জানান। আমরা মহামান্য অষ্টম সংঘরাজ ভদন্ত শীলালঙ্কার মহাস্থবির সহ ২২ সদস্যের একটি দল যথাসময়ে মায়ানমার রাজধানী য়াঙ্গুন আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে গিয়ে অবতরণ করলে, সে দেশের ধর্মমন্ত্রী সহ বহু উচ্চপদস্থ সরকারী কর্মকর্তারা বিমান বন্দরে অভ্যর্থনা জানিয়ে আমাদেরকে ৬ষ্ঠ সঙ্গায়ন অনুষ্ঠান স্থল, গাবায়ে সাসন হিতায় ইউনিভার্সিটির অতিথি ভবনে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সংঘরাজ ভান্তের সাথে আমিও হেমেন্দ্র বাবুকে একটি পৃথক ভবনে রেখে অবশিষ্ট সবাইকে অপর একটি ভবনে রাখা হয়। তাদের জন্যে ২জন মহিলা গাইড, এবং আমাদের জন্যে সাসন হিতায় ইউনিভার্সিটির রেকটর সহ একজন অফিসার স্থানীয় যুবককে সার্বক্ষণিক সেবক ও গাইড রূপে রাখা হয়। অতঃপর য়াঙ্গুনের স্যেয়েডাগণ প্যাগোডা, চুলে প্যাগোডা, কয়েকটি বড়ো বড়ো টাইক তথা ভিক্ষু নিবাস, সহ মহাসি মেডিটেশন সেন্টার, উবা কিন্ মেডিটেশন সেন্টার, সামায়ে মেডিটেশন সেন্টার, প্রজ্জালোক মহাস্থবিরের চট্ঠামী ধর্মদূত বুদ্ধ বিহার, সহ মাগালে, পাগান, মেমিও পর্যন্ত বহু প্রাচীন দর্শনীয় স্থানে নিয়ে যাওয়া হয়। যেখানেই গেলাম, প্রত্যেকটি প্রসিদ্ধ স্থানে আমাদের জন্যে সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করা হয়েছে। তবে সে সকল

সভায় ৫০ হতে ১০০ জনের উর্ধ্বে নারী পুরুষের সমাবেশ হয়েছে, মান্দালে ইউনিভার্সিটি সহ মাত্র দু'তিনটি স্থানে। আর আশ্চর্য এই যে, যাক্সুনে গাবায়ে শাসন হিতায় বিশ্ববিদ্যালয়, এবং মান্দালে বিশ্ববিদ্যায় ছাড়া আর কোন প্রাচীন তীর্থ স্থানে আবাসিক কোন ভিক্ষুর উপস্থিতি ছিল না। উপস্থিত নারী পুরুষের প্রায় সকলেই পাবলিক প্রশাসনে কর্তব্যরত আর্মি কর্মকর্তাদের পরিবারের সদস্য। এবং প্রত্যেকটি তীর্থ স্থান, আর্মি কর্মকর্তাদেরই তত্ত্বাবধানে; কোন ভিক্ষু বা ভিক্ষু সংঘের নিয়ন্ত্রণে নহে। দেশের উন্নয়ন বলতে যা চোখে পড়লো শুধুমাত্র প্রাচীন মন্দিরগুলোর সংস্কার সাধন ও সাজ-সজ্জা করণের কাজ, এবং কিছু বিশেষ বিশেষ স্থানে আন্তর্জাতিক মানের টুরিষ্ট হোটেল নির্মাণে কাজ। পথে পথে, এমন কি রেঙ্গুন, মান্দালে, মেমিওর মতো বড়ো বড়ো নগরে পর্যন্ত বাংলাদেশের মতো কোন বড়ো বা উচ্চ বহুতল আবাসিক ভবন কোথাও চোখে পড়েনি; চোখে পড়েনি পণ্য সামগ্রী পরিপূর্ণ বড়ো আকারের কোন দোকান বা সপিং কমপ্লেক্স। এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত চোখের দৃষ্টি হারিয়ে যায় এমনি আকাশ নেমে আসা বিস্তীর্ণ সমতল জনশূণ্য প্রান্তর, অনাবাদী পড়ে আছে মাইলে পর মাইল। অথচ মাটি গুলো যে খুবই উর্বর, তার প্রমাণ দিচ্ছে জংলা উদ্ভিদ গুলো।

মেমিও সফর শেষে মান্দালে বিশ্ববিদ্যালয়ে পুণঃ নিয়ে এসে প্রাচীন রাজ প্রাসাদ, শ্বেত প্রস্তরে উৎকীর্ণ ত্রিপিটকের ৫ম মহাসঙ্গায়নের স্থান, এবং অমরাপুরা মহাটাইক গুলো দর্শন করানোর পর আমাদেরকে যাক্সুনে ফিরায়ে আনতে আগের মতো সামরিক বিমানের ব্যবস্থা করলেও, সংঘরাজ ভান্তে সহ কয়েকজনকে পাঠিয়ে দিয়ে, আমরা কিছু সংখ্যক ট্রেনে ভ্রমণের আগ্রহ প্রকাশ করলাম, দু'দিকের দৃশ্যাবলী দেখে দেখে যাওয়ার ইচ্ছায়। ট্রেনের পুরো একটা ১ম শ্রেণীর বগী শুধু আমাদের জন্যেই রিজার্ভ করা হলো। প্রতি মধ্যে হঠাৎ বাঙালী চেহারার এক লুঙ্গিপরা লোক ঢুকে পড়লেন আমাদের কম্পার্টমেন্টে। বাঁধা দিলেন আমাদের গাইড। আমরা থাকতে দিলাম, ট্রেন ছেড়ে দিলে দেখে। দাঁড়িয়েই ছিলেন লোকটি। পাশে বসতে বললে, অত্যন্ত সংকোচের সাথে বসে পড়লো এই দিবা-রাত্র দীর্ঘ ট্রেন ভ্রমণে। ক্রমে আলাপ জমে উঠলো। নিজের জন্ম মায়ানমাতে হলেও পিতৃ নিবাস বাংলাদেশের কক্সবাজার এলাকায়। হৃদ্যতা আরো গভীর হলো। তিনি দুই নামে রেকর্ডভুক্ত, রাষ্ট্রীয় নাম বর্মী ভাষায়, এবং পারিবারিক নাম ইসলামী ভাষায়। একপর্যায়ে চমকে উঠলাম যখন প্রকাশ করলেন, তিনি আন্তর্জাতিক মানের জেম (হীরা) ব্যবসায়ী, রেঙ্গুন, মান্দালে, ম্যামিও সহ দেশের প্রত্যেকটি বড়ো শহরে তার শো-রুম আছে। অগাধ অর্থবিশ্বের মালিক এখানকার প্রায় মুসলিমেরা, নানা প্রকারের ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে জড়িত থেকে। উচুমানের চাকুরী ছাড়া, তারা কোন চাকুরী জীবিকা সহজে

গ্রহণ করেন না। প্রিয় পাঠক; উপরোক্ত বাস্তব চিত্রটির পাশাপাশি এবার শুনুন আমাদের ১৮ দিনের ভ্রমণে সেবক গাইডটির কাহিনী। এই ভালো ইংরেজী জানা অফিসার যুবকটি ধর্মমন্ত্রণালয়ে কর্তব্যরত। তিনি ডিগ্রী পাশ, বয়স আমার মনে হলো বড় জোর পঁচিশ। কিন্তু শীর্ণ খাটো দেহী চল্লিশ বছরের যুবকটি বল্লেন, পিতা-মাতা সহ পরিবারে তারা এক ভাই ও এক বোন মাত্র। বোনটি তার বড়ো। তাঁরা চার জনেই চাকুরী করেন। অথচ, আর্থিক কারণে বোনটিকে এখনো বিয়ে দিতে পারছেন না, নিজেও বিয়ে করতে পারছেন না। কথাটি আমার অবিশ্বাস্য ঠেকলো। তখন তিনি বল্লেন দেখুন, আমি একজন অফিসার হয়েও আমার বেতন মাত্র চার হাজার টাকা। অপরদিকে, চাল এককেরট (কেজির চেয়ে সামান্য বেশী) এর দাম ৬০ টাকা, আলু এক কেরট ৪০ টাকা। আমাদের সকলের উপার্জন পারিবারিক ব্যয়েই নিঃশেষ হয়ে যায়। যাপ্নুনে সামেয়াতা ধ্যান কেন্দ্রে যেদিন আমাদের পরিদর্শন ও মধ্যাহ্ন ভ্রমণের ব্যবস্থা হলো, সেদিন উন্নত মানের ভোজন শেষে জানালা দিয়ে হঠাৎ আমার চোখ গিয়ে পড়লো, অতি নিকটে নীচে গাছ তলায় বসে ভোজনরত নির্মাণ শ্রমিকদের দৃশ্যটি। প্রত্যেকে ছোট্ট একটি মাত্র বস্ত্রে করে ভোজন করছেন নীরবে। আশ্চর্য! এত চেষ্টা করেও আমি খুঁজে পেলাম না, তাঁরা কী দিয়ে ভাতগুলো খাচ্ছেন। ভারী অস্ত্র কাঁধে রাস্তায় পাহারারত সেনাদের দেখলাম, পোষাক ও অস্ত্র দু-ই যেন তাদের চেয়ে অনেক ভারী। যেখানেই চোখ যায়, পুষ্টি হীন নর-নারী। তাহলো আমার মা-বাবার মুখে শোনা সেই ছর-পরী সদৃশা বার্মার নারী পুরুষেরা এখন কোথায়?

থাইল্যান্ড: অতীতের শ্যামদেশ, চির স্বাধীন বলেই বর্তমানের নাম থাইল্যান্ড। নগরের মানুষ গুলোর দেহে মাংস যেন আর ধরে না। উজ্জ্বল গৌরবর্ণের মঙ্গোলীয় চেহারার এ সকল মানুষ গুলোকে থাই-রাজধানী ব্যাংককে দেখতে দেখতে, আমার এক সময় দৃঢ় বিশ্বাস জেগেছিল পুরো থাইবাসীরাই বুদ্ধি এমন সুন্দর স্বাস্থ্যবান। কিন্তু না, ব্যাংক্ক থেকে ৫০০ কিলোমিটার দূরে ওয়াট্‌ বাংলাকম্-এ একবার বেড়াতে গিয়েই গ্রামীণ জীবনের খেটে খাওয়া মলিন-বিবর্ণ মানুষ গুলো দেখতে দেখতে আমার সেই স্বপ্ন ঘোর মুহূর্তেই উঠে গেল। ব্যাংককে একদিন হঠাৎ এক থাই-মহিলা আমাকে বিদেশী দেখে হাতে তুলে দিলেন কিছু খুস্ট ধর্মের লিফ্লেট ও বই। আমি চমকে উঠলাম এজন্যেই যে, থাইমহিলা কি করে বাংলাদেশের মুসলিম ধর্ম প্রচারক তবলীগ পাটির ন্যায় দায়িত্ব পালনে বত হলো। প্রিয় পাঠক; এটাই চলছে এখন থাইল্যান্ডের দারিদ্র্য তাড়িত প্রায় প্রত্যেকটি গ্রাম-গ্রামান্তরে। নাগরিক বিত্তশালী, অত্যাধুনিক ঐশ্বর্যে ঠাসাঠাসি করা চিরস্বাধীন থাইল্যান্ডের দরিদ্র বৌদ্ধ নারীদের এক বিরাট অংশ, সামান্য দু'চারটি ইংরেজী বাক্য মুখস্থ করে দেশে বিদেশে পাঁচ তারা দশতারা,

হোটেল গুলোতে দেহ-ব্যবসায় জড়িয়ে পড়ার বিষয়টি তো বিশ্ব খ্যাতিই অর্জন করে বসলো! থাই সরকার আরো একটু গর্বের সাথে এর নাম দিল ‘সেক্স-ইণ্ডুস্ট্রি’ বলে। সেখানকার বৌদ্ধদের বিশ্বাস-বুদ্ধ সমকালীন আম্রপালীদের ন্যায় সারাতি-রাত দেহ-ব্যবসা করে, ভোরে ভিক্ষুদের পিণ্ডান করতে পারলে, সব পাপ-তাপ ধুয়ে-মুছে যায়।

থাইবাসীর বড়ো ভাগ্য এই যে, চাইনিজ বৌদ্ধ ব্যবসায়ীরা সে দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের হাল ধরেছে। অন্যথায় স্বদেশী মালয়েশিয়ান-মুসলিম, খৃস্টান এবং ভারতীয় সহ বিদেশী বেণীয়ারাই শ্রীলংকার মতো নিয়ন্ত্রণ করতো দেশের পুরো অর্থনীতি।

এশিয়ান বৌদ্ধদের সম্পর্কে পূর্বোক্ত নেতিবাচক সংক্ষিপ্ত বর্ণনার পর তাঁদের ইতিবাচক দিকগুলোর কিছু বিষয় তুলে ধরা প্রয়োজন মনে করি। থাই ও শ্রীলংকার বৌদ্ধরা ধর্মীয় যে কোন অনুষ্ঠানে অবশ্যই শ্বেতবস্ত্র পরিধান করে গমন করেন।

মায়ানমা, থাইল্যান্ড ও শ্রীলংকার প্রতিটি বিহারের সপ্তাহের ছুটির দিনে সকাল বেলায় স্কুল, কলেজগামী ছাত্র-ছাত্রীদেরকে বৌদ্ধ আচার ব্যবহার এবং ধর্মীয় শিক্ষা দেয়া হয়। ছুটির দিনে বিকেলে বয়স্ক ও যুবক-যুবতীদেরকে ধর্মদেশনার আয়োজন হয়ে থাকে। প্রতিমাসের পূর্ণিমাতে নারীপুরুষ সকলেই উপোসথ ব্রত পালন, ধ্যান অনুশীলন, ধর্মদেশনা শ্রবণ এবং সূত্রাদি আবৃত্তির বিশেষ আয়োজন করা হয়। থাইল্যান্ডে দীর্ঘ ছুটির দিনে স্কুল কলেজের ছাত্রদেরকে প্রব্রজ্যা এবং ছাত্রীদেরকে অষ্টাঙ্গ উপোসথ ব্রত পালনে দীক্ষা দিয়ে ধ্যান অনুশীলন ও বৌদ্ধ আচার নীতি শিক্ষা দানের ব্যবস্থা করা হয়। এমন ছুটিতে বয়স্করা ও প্রব্রজ্যা গ্রহণ ও উপোসথ ব্রত পালন করে থাকেন।

মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যেও কোন কোন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে, ইদানিং থেরোবাদী বৌদ্ধদের ন্যায় পূর্বোক্ত আচার প্রথার প্রবর্তন করা হচ্ছে। তবে, তাদের মধ্যে গৃহীদের সাময়িক প্রব্রজ্যা গ্রহণ ও উপোসথ ব্রতপালনের প্রথাটি নেই। অথচ, এই দুই প্রথার মাধ্যমেই ভিক্ষু ও গৃহীরা পরস্পরকে সবিশেষ অনুধাবনে সক্ষম হন, এবং অন্তরঙ্গতাও সবিশেষ বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। মহাযানীদের মধ্যে ইদানিং খৃস্টীয়ান সংস্কৃতির প্রভাব বিশেষভাবে অগ্রণী ভূমিকা পালন করছেন। তাঁদের অনেক কর্মকাণ্ডের মধ্যে তাইপে হতে ‘দি কর্পোরেট বডি অব বুড্ডিস্ট এডুকেশন’ নামক প্রতিষ্ঠানটির বিনামূল্যে বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধধর্মীয় গ্রন্থ বিতরণের উদ্যোগটি অতীব প্রশংসনীয়। জাপানী বৌদ্ধ ভিক্ষুরা ‘ওয়ার্ল্ড ভিশন’, রেডক্রস, ইত্যাদি খৃষ্টীয়ান মানবিক সাহায্যকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মাধ্যমে ত্রাণ-সামগ্রী বিশ্বের বিভিন্ন দুর্গত জনগণের কাছে পাঠিয়ে থাকেন। তবে, এই ধনী বৌদ্ধরা নিজস্ব সংস্থা-সংগঠনের মাধ্যমে এ সকল মানবিক সেবা করতে পারলে সবচেয়ে উত্তম হতো।

এশিয়ান বৌদ্ধ পরিমণ্ডলের বাইরে ইয়োরোপ, আমেরিকা ও অষ্ট্রেলিয়ায় ইদানিং কালে বৌদ্ধ ধর্মের চর্চায় সাড়া জেগেছে বলে শোনা যায়। দুইভাবে এই জাগরণ ঘটছে, বলে, আমার ধারণা হয়। থেরোবাদী এশিয়ান রাষ্ট্র সমূহ এতে প্রসারিত বিদর্শন এবং জাপানী জেন, এ এ'দু পদ্ধতির ধ্যানের প্রতি-পশ্চিমীদের ক্রমবর্ধমান আকর্ষণ। অপরদিকে নোবেল বিজয়ী তিব্বতী ধর্মগুরু দালাইলামা সহ তাইওয়ান, কোরিয়ান ও ভিয়েতনামী মহাযানী ধর্মগুরুদের দ্বারা এ সকল পশ্চিমা দেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি মানুষের আকর্ষণ যথেষ্ট বাড়ছে। তবে, এই বৃদ্ধি এখনো পর্যন্ত সত্যি কি তেমন আশা ব্যঞ্জক? যদি তা-ই হতো, তবেতো দেখতে পেতাম 'ইস্কনের' মতো বৌদ্ধধর্ম ও এই পশ্চিমা দেশ সমূহের প্রধান প্রধান ধর্ম-মতসমূহের অন্যতম বলে রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি লাভ করকো। 'ইস্কন' পশ্চিমবঙ্গের নদিয়া জেলাস্থ শ্রী গৌরাসঙ্গের প্রবর্তিত 'বৈষ্ণবীয়া=দর্শনের' প্রচার মিশন সমূহের একটি। এই মিশন অতি স্বল্পতম সময়ের মধ্যে বৈষ্ণবীয়া দর্শনকে পশ্চিমা জনসমাজে জনপ্রিয়তার তুঙ্গে নিয়ে গিয়ে রাশিয়া সহ বেশ কয়েকটি দেশের রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি অর্জন করে নিয়েছে। পশ্চিমা-ইস্কন অনুরাগীদের তুলনায় বৌদ্ধ অনুরাগীর সংখ্যা তত কম নহে। কিন্তু, এই পশ্চিমা বৌদ্ধ অনুরাগীরা সমাজ বন্ধ হওয়া, বা সংগঠিত হওয়ায়, তেমন উৎসাহী নহেন। তাঁদের বৌদ্ধ ধর্মানুরাগ তাই, নিতান্ত ব্যক্তিগত পর্যায়েই রয়ে গেছে। আর এ কারণেই পশ্চিম দেশ সমূহে বৌদ্ধধর্ম অদ্যাবধি রাষ্ট্রীয় ধর্মের স্বীকৃতি অর্জনে অক্ষম হয়ে রইলো।

ঠিক পশ্চিমাদের ন্যায় একই মনোবৃত্তির লালন চলেছে ভারতীয় বৌদ্ধ জাগরণের ক্ষেত্রেও। ভারতের সংবিধান প্রণেতা ডক্টর ভীমরাও আম্বেদকর যেই পরিকল্পিত উপায়ে লক্ষ লক্ষ অনুসারী সহ বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন; সেই পদক্ষেপ তাঁর হঠাৎ মহাপ্রয়াণে ভীষণভাবে মৃয়মান হয়ে পড়লেও, তা এখনো অব্যাহত আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে পরবর্তী পর্যায়ে যিনি বৌদ্ধ ধর্মের পুণঃজাগরণের নেতৃত্ব পেরেন, তিনি হচ্ছেন বিশ্বখ্যাত বিদর্শনাচার্য শ্রী সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কাজী। কিন্তু, তিনি ভারতের বুকে বৌদ্ধ ধর্মের পুণঃজাগরণই কেবল ঘটাচ্ছেন, পুণঃ প্রতিষ্ঠা নহে। তিনি বিশ্বের সকল ধর্ম মতালম্বীকে এই বলে আহ্বান জানাচ্ছেন; “আপনারা স্ব স্ব ধর্মবিশ্বাস কিছুদিনের জন্যে ফেলে রেখে নিরপেক্ষ মনে একটি বার বুদ্ধ ধর্মকে অনুভব করে যান। গ্রহণযোগ্য হলে, গ্রহণ করে উপকৃত হোন।” তাঁর এই সাদর আহ্বানটি, এখানেই নিজ দায়িত্ব শেষ করে দিল। গোয়েঙ্কাজী এবং তাঁর অনুসারীরা এক্ষেত্রে 'বুদ্ধের সম্পদ'কে বিতরণের দায়িত্বই কেবল নিলেন; কিন্তু সেই সম্পদ রক্ষা ও সমৃদ্ধির দায়িত্ব নিলেন না। এই রক্ষা ও সমৃদ্ধির জন্যেই ভগবান বুদ্ধ সংঘের জন্ম দিয়েছিলেন। আর সেই সংঘকে রক্ষা করতে বিনয়-বিধান প্রজ্ঞাপিত করেছিলেন। কিন্তু, গোয়েঙ্কাজী বুদ্ধের এই সংঘের প্রতি কেবল উদাসীনতাই প্রদর্শন করলেন না,

তিনি আপন অনুসারীদের নির্দেশ দিলেন, ভারতের ভেতরে ও বাইরে তাঁদের কোন প্রতিষ্ঠান যেন ভিক্ষুদ্বারা পরিচালিত না হয়। গোয়েন্ধাজীর এ সিদ্ধান্ত পূর্ণাঙ্গ না, অপূর্ণাঙ্গ?

বৌদ্ধ প্রধান নেপাল রাজ্যের ব্রাহ্মণেরা, বৌদ্ধদেরকে মহাযানী-হিন্দু বানিয়ে, রাজ্যটিকে বিশেষ বর একমাত্র হিন্দুরাষ্ট্র বলে ঘোষণা দিয়েছে। অপরদিকে ভুটান রাজ্যটি বৌদ্ধ-বজ্রযানের আশীর্বাদে ভারতের আঙ্গাবহ দাসে পরিণত হয়ে আছে। বৌদ্ধ প্রধান রাষ্ট্র সিকিম আরো একধাপ এগিয়ে ভারত সাগরেই আত্ম বিসর্জন দিল। বাংলাদেশী বৌদ্ধ, যারা অনুবীক্ষণী-সংখ্যালঘু বলে পরিচিত, তারা কেমন আছেন এই মুসলিম প্রধান দিশটিতে? সংখ্যা লঘুত্বে সার্বজনীন অভিশাপটির সাথে এখানে যুক্ত হয়েছে, বৌদ্ধদের মধ্যে পারম্পরিক মৈত্রীময় ভ্রাতৃত্ব বোধের চরম অভাব। এ কারনে, সব সময়ে ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় থাকতে হচ্ছে এদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে।

বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধদের চলমান বিপদ ও বিপর্যয় সমূহ হতে আত্মরক্ষা করতে হলে নিম্নোক্ত বিষয় গুলো বাস্তবায়িত করা একান্ত প্রয়োজন মনে করি :-

(১) সর্বপ্রথম বুদ্ধের ধর্মসেনা নামক বর্তমান তরুণ ভিক্ষু সংঘকে অবশ্যই বুদ্ধ এবং বুদ্ধ সমকালীন আদর্শ ভিক্ষুদের আচরিত জীবনের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যটি গভীরভাবে উপলব্ধি করণের প্রশিক্ষণ দিতে হবে।

(২) দ্বিতীয়ত্ব : উপসম্পদা গ্রহণকালীন সময়ে ভিক্ষুদেরকে চারিটি অনিবার্য আশ্রয় গ্রহণের জন্য যেই প্রতিজ্ঞা করানো হয়, সেই প্রতিজ্ঞা সমূহ অভ্যস্ত করতে মাঝে মাঝে সেনাবাহিনীর মতো প্রশিক্ষণের আয়োজন করতে হবে।

(৩) প্রব্রজ্যাপ্রার্থী প্রতিটি তরুণ কুলপুত্র; প্রব্রজ্যা ও ভিক্ষু উপসম্পদা গ্রহণের পূর্বে গৃহী অবস্থায় যতদূর পর্যন্ত স্কুল কলেজের ব্যবহারিক শিক্ষা গ্রহণ করা সম্ভব হয়, ততদূর পর্যন্ত সমাপ্ত করে, উপসম্পদা গ্রহণের পর প্রথম দিকে শুধুমাত্র বুদ্ধবাণী ত্রিপিটক শাস্ত্রের উপর যতদূর সম্ভব অধ্যয়ন ও গবেষণার সুযোগ দান করা প্রয়োজন। এ লক্ষ্যে পালি ভাষা সহ অতি প্রয়োজনীয় জাতীয় ও আন্তর্জাতিক কয়েকটি ভাষা আয়ত্ত্ব করানো একান্ত প্রয়োজন। কারণ একজন ভিক্ষুর জন্যে নানা ভাষার জ্ঞানই বুদ্ধের বাণীকে প্রচার প্রসারে, অনিবার্য ভাবে প্রয়োজন হয়। তবে এসকল ভাষা জ্ঞান আয়ত্ত্বের আগে তরুণ ভিক্ষুটিকে আত্মরক্ষার্থে, ধর্ম বিনয়ের উপর প্রাথমিক জ্ঞানটুকু অর্জনের পরপরই, ধ্যান বিদর্শন অনুশীলনে কমপক্ষে সাতটি বছর, অবশ্যই গভীর আত্মনিয়োগের জন্য নিজেকে অনুপ্রাণিত করতে হবে।

(৪) উপরোক্ত ভাবে একজন তরুণ ভিক্ষুর জীবন বুদ্ধ শাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত হলে, তিনি দেশে বা বিদেশে যেখানেই অবস্থান করুক না কেন, তিনি বুদ্ধের ধর্মের প্রচার প্রতিষ্ঠায়, অবশ্যই সাফল্য মন্ডিত হবেন। যে সকল দেশে ভিক্ষুণী

সংঘ, অথবা অনাগারিকা সংঘ বিদ্যমান আছেন, তাঁদেরকেও ঠিক একই নিয়মে দক্ষতা দান করলে, তারাও সমসাফল্যের স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হবেন। এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে এই ব্রহ্মচারী ভিক্ষুণীদেরকে যে কোন অবস্থায়, পুরুষের সহজ সান্নিধ্য হতে দূরে থাকার ব্যবস্থা অবশ্যই করতে হবে।

(৫) ধর্ম বিনয় এবং শীল সমাধিতে সমৃদ্ধ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, অনাগারিক, অনাগারিকাকে সমাজনীতি, অর্থনীতি, স্বাস্থ্যনীতি, ব্যবহারিক শিক্ষানীতি, বিশ্বের বিভিন্ন ধর্মদর্শন ও রাজনীতির উপরে তুলনামূলক জ্ঞান অর্জনের ব্যবস্থা করা একান্ত প্রয়োজন। ফলে তারা যেখানেই অবস্থান করবেন, সেখানেই জনসমাজের ব্যবহারিক ও আধ্যাত্মিক উন্নয়নে একজন আদর্শ শিক্ষকের ন্যায় ব্যাপক অবদান রাখতে সক্ষম হবেন।

এভাবেই বৌদ্ধ ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, অনাগারিক, অনাগারিকা নামের এই ধর্ম সেনাদের দ্বারাই জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে বুদ্ধ শিক্ষার প্রসারণ ঘটানো সম্ভব। এ আলোকে বিশ্বের যে কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের মাঝে বুদ্ধের এই ধর্মসেনারা সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের মাঝে স্ব সম্প্রদায়কে শান্তি পূর্ণ সহ অবস্থানের এবং প্রগতি শীল জীবন সমৃদ্ধিতে ধারণ করতে সক্ষম হবেন। তাই আমাদের প্রার্থনা----

হে বুদ্ধ! তোমার জ্ঞান-প্রজ্ঞা সম্যক্ ভাবে জেগে উঠুক প্রতিটি বুদ্ধানুরাগী ভিক্ষু-গৃহীর হৃদয়ে। সকলেই মঙ্গল দর্শন করুক।

সাধু! সাধু! সাধু!

[১২/৮/২০০২ ইং, রাজবন বিহার]

বাংলাদেশী বৌদ্ধদের বুদ্ধমার্গ চ্যুত করার উপায়

এতদিন বিশ্বাস করেছিলাম কারো সাথে প্রতারণা করা মহাপাপ। অধিকন্তু অতীতের কর্মফলে যে জাতিতে জন্ম, তার সাথে প্রতারণা করার পাপ যে কতো ভয়ানক, তা ভাবতে গিয়ে শিহরিত হতাম। কিন্তু এই সেদিন আমার কাছে শিক্ষা গ্রহণ করতে আসা এক ভিক্ষু বলে দিলেন, ভণ্ডে! আসলে বাস্তবতা সম্পর্কে আপনার জ্ঞান-বুদ্ধি খুবই দুর্বল। দিবাভাগের মতো স্পষ্ট এমন বিষয়টিও আপনি দেখতে পারছেন না কেন? এই বড়ুাদের পাগল করে কিছু হাতিয়ে নেয়া, অথচ কতো সহজ! বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা 'চারি আর্যসত্য জ্ঞান'- এ কথাটি সারা বিশ্ববাসী বুঝতে পারলেও, এই দেশের বৌদ্ধরা বুঝতে আরো কত যুগ পেরিয়ে যাবে বলা মুশ্কিল। তাই তাদেরকে চারি আর্যসত্য বুঝাতে যাওয়া, একদিকে যেমন পশুশ্রম, অপরদিকে বুদ্ধহীনের কাজও বটে। আপনি কি দেখতে পারছেন না- বান্দরবান, আন্দরকিল্লা, খৈয়াখালী, মানিকছড়ি, স্বর্গপুর,

ব্রহ্মপুরাদিতে কতো সহজে বাজার জমে গেল। এ কারণেই যত-তত্ন আপনার চারি আর্থসত্য দেশনাকে আমি বুদ্ধিমানের কাজ মনে করি না। চারি আর্থসত্য, নির্বাণ, সমাধি ভাবনা, এ সব কথা আপনি বলতে পারেন। কিন্তু তার নির্ভেজাল ব্যাখ্যা তো কুইনিনের মতো তেঁতো। ম্যালেরিয়া আক্রান্ত শিশুকে কুইনি খায়ানো কি সহজ? তাই এদেশী বৌদ্ধদেরকে শীল পালনের কথা, পরিশ্রমী হওয়ার কথা, মিতব্যয়ী হওয়ার কথা, অপচয় বন্ধ করার কথা, বিচার-বিবেচনাশীল হওয়ার কথা, হুজুগী না হওয়ার কথা বলাতো কুইনি খাওয়ানোর মতো। আপনার এসকল অপ্রিয় সত্য কথা হযম করার শক্তি তাদের আছে কি? আর এ কারণেই আমি তাদেরকে সীবলী পূজা, উপগুপ্ত পূজা, আটাশ বুদ্ধের পূজা, চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ পূজা, আচারিয়া পূজা, সোয়েংগ্যা পূজা, গুরু পূজা বুড়াগোয়াই পূজা, পাগলা গোয়াই পূজার কথা বলি। এই সীবলী বুদ্ধ, জলবুদ্ধ ইত্যাদিকে পূজা ও প্রার্থনা দ্বারা জীবনে সবকিছু পাওয়া যাবে, গুরুদত্ত এই পানি পড়ায় ক্যান্সার, ডায়াবেটিস মুহূর্তেই ভালো হয়ে যাবে, একথা গ্যারান্টি দিয়ে বলুন, দেখবেন কতো সহজে এদেশের বৌদ্ধদের হৃদয়াসনে আপনি পরম গুরু হয়ে, প্রবল জোয়ার সৃষ্টি করতে পারবেন। শুধু পানি পড়ায় ক্যান্সার ভালো করার জন্যে চট্টগ্রাম মহানগরীর বুদ্ধে হাজার হাজার বড়ুয়ার সমাবেশে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে যেখানে এদেশের বৌদ্ধদের পাগল করা যায়, সেক্ষেত্রে অষ্ট বিংশতি বুদ্ধ পূজা, সীবলী বুদ্ধ পূজা, জলবুদ্ধার কথাই বা কি? অনুবুদ্ধ সারিপুত্র, ধূতাস্রশ্রেষ্ঠ মহাকস্যপ, মহাসেবক আনন্দের পূজা করতে হলে জ্ঞান অর্জনের প্রয়োজন, কষ্ট-সহিষ্ণুতার প্রয়োজন, সেবা মানসিকতার প্রয়োজন। বৌদ্ধ নামের অনেক মা-বাবারা দুঃখ প্রকাশ করে বলেন, পরীক্ষার সেন্টারটা খুব কড়া ছিল, তাই আমার ছেলেটা ফেল করেছে। এমন বাবা-মাকে সারিপুত্রের মতো কষ্ট করে জ্ঞানার্জনের কথা বললে, তারা আপনাকে পছন্দ করবেন কেন? মহাকস্যপের ধূতাস্র সাধনার মতো কষ্ট সহিষ্ণু হয়ে আদর্শ জীবন গঠনের কথা, যেন-তেন প্রকারে স্বার্থ সিদ্ধিতে অভিলাসী এই বৌদ্ধদের বুঝানো সহজ হবে কি? যে সমাজে অসংখ্য মাতা-পিতা ও মহাউপকারী জনের চোখের জল ঝরায় অকৃতজ্ঞ বন্ধু-বান্ধব, পুত্র-কন্যা ও পুত্র বধূরা; সে সমাজে মহাসেবক আনন্দের অপার ত্যাগ আর সেবা মহিমা সমাদৃত হবে কিসের জন্যে?

এই দেখুন না, এই সমাজের দুঃখ-দারিদ্রতা দেখে যেই কৃপাশরণ, প্রজ্ঞালোক, বিশুদ্ধানন্দের মতো মহৎদের হৃদয় কেঁদে ছিল; জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে দেশী-বিদেশী সাহায্য-সহায়তা সংগ্রহ করে করে যারা বড়ুয়া সমাজকে ধর্মজ্ঞানে শিক্ষা-দীক্ষায় ও অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ করতে বিশাল অবদান রেখে গেলেন তাঁদের কথা এ সমাজে এখন কয়জনের মুখে শোনেন? আর যারা রং কাপড়ধারী হয়ে মন ভোলানো ঠকবাজির ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছেন, সেই ধোঁকাবাজদের

প্রশংসা কীর্তনে দেখেন তো, এই বৌদ্ধনামক মানুষগুলো কেমন উলঙ্গ নৃত্যে মেতে আছে? এককালে যেই কৃপাশরণদের অবদানে এশিয়ার প্রথম ডি.লিট বেণী মাধব বড়ুয়াদের মতো অনেক চন্দ্র সূর্যের জন্ম হলো; তাঁদের আলোতে অবহেলিত বড়ুয়ারা আজ বাবুতে পরিণত হলেন, সেই বাবুরা আজ দু'হাতে স্বীয় অর্থ-বিশ্বের অর্থ্য দিচ্ছেন পূর্ণাচার, প্রজ্জালোক, বংশদীপ, জ্ঞানীশ্বর, কৃপাশরণদের স্বপ্ন আর আদর্শ-উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে নহে; রং বস্ত্রধারী ধর্মব্যবসায়ী সেই ধূর্ত ঠকবাজদের পায়ে। সেই ঠকবাজেরা বুদ্ধজ্ঞানহীন এই বৌদ্ধদের প্রশ্রয়ে এখন উঠে পড়ে লেগেছেন সারমেধ, পূর্ণাচার, কৃপাশরণ, প্রজ্জালোক, গুণালংকার, অভয়তিষ্য, বংশদীপ জ্ঞানীশ্বর, ধর্মারত্ন ধর্মানন্দ প্রমুখ ধর্ম ও সমাজ সংস্কারকদের দ্বারা বুদ্ধ আদর্শে রচিত ধর্ম-বাগানটি, মিথ্যা-কুসংস্কারের আবর্জনায় ভরে তুলতে।

এই ঠকবাজেরা এখন বলতে শুরু করেছেন বুদ্ধশাসন দরদী অর্হৎ মহাকস্যপ, ঞ্চন্দ, উপালী বা মোগলিপুত্র তিষ্য এই ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বরা তথাকথিত সঙ্গায়নাতির মাধ্যমে ছিলেন, একথা মিথ্যা করে। এই ত্রিপিটক রক্ষা করেছেন প্রজ্জাদেবী নামক মা স্বরস্বতী। তারা বলছেন, আমরাই প্রকৃত পক্ষে এদেশের বুদ্ধ শাসনের এখন সংস্কার সাধন করছি। আমরা বুদ্ধ বন্দনার সাথে মাতা-পিতা, আচারিয়া বন্দনাকে যুক্ত করে পঞ্চগুণং অহং বন্দামি শিক্ষা দিচ্ছি, সজ্জ বন্দনার সাথে 'অট্টপুরিসপুল্ললো' শব্দটি যোগ করে নতুনত্বের চমক সৃষ্টি করছি। পাত্রপূর্ণ পিণ্ডদান না বলে, আরকানী অংচাক্স, মংচাক্সদের 'ছেবাইকপূর্ণ ছোয়াইং দান', বর্ষা সাটিক চীবর দান না বলে 'ওয়াছা চীবর দান' ইত্যাদি বলার অভ্যাস করায় বড়ুয়াদের কে এখন।

ইতিহাসের এই পশ্চাতগামীতা, উগ্র অর্থলোভী, যশ খ্যাতি লোভী ধর্মগুরুদের দৌলতে, ইদানিং যে সকল বৌদ্ধদের খুবই রুচিকর হয়ে উঠছে, তাদেরকে অচিরেই আমরা দেখতে পাবো, তারা ত্রিপিটকের বুদ্ধ শিক্ষা সেই চারি আর্হসত্যকে অবাস্তব, অপ্রয়োজনীয় আখ্যা দিয়ে বসেছেন খুব সহজেই। তারা প্রকৃত বুদ্ধমার্গ অনুসারীদেরকে, অত্যাৎসাহী মহাযানীদের মতো, হয়তো বলতে শুরু করবেন, তোমরা হীনযানী, তোমরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ, তোমরা অত্যন্ত স্বার্থপর। বুদ্ধের তৈরী পথে তোমরা খুব সহজে একাকী নির্বাণ রাজ্যে পৌছে যেতে পাগল হয়ে উঠেছ। আমরা কিন্তু কখনো তোমাদের মতো এ স্বার্থপর হতে পারবো না। বুদ্ধ এবং তাঁর প্রদর্শিত মার্গ আমাদের জন্যে মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নহে। তৎপ্রদর্শিত পথে আত্মমুক্তি সন্ধানে নিজের কৃতিত্ব কোথায়? আমরা বোধিসত্ত্বের মতোই পারমী পূর্ণ করে, বিশ্ব-ব্রাহ্মাণ্ডের সকল প্রাণীকে এক সাথে নিয়েই নির্বাণ রাজ্যে গমন করবো। যতদিন পৃথিবীর একটি প্রাণীও অবশিষ্ট থাকবে, ততদিন আমি নিজের জন্যে নির্বাণ চাই না। এবার বুঝতে

পাছ আমাদের চেতনা, আমাদের হৃদয় কতো মহৎ? এই মহৎ হৃদয়কে শক্তিশালী করার জন্যে তাই আমাদের প্রয়োজন, শীল পালনের কড়াকড়ি এবং ধর্ম-বিনয় শিক্ষা ও অনুশীলনের বাধ্য-বাধকতাকে দূরে, বহুদূরে নিক্ষেপ করা। দশশীল, পাঁচশীল, এসব বাড়াবাড়ি মাত্র। আমাদের প্রয়োজন আরো কম শীল, মাত্র তিনটি। তুমি মিথ্যা কথা বলতে পারবে, চুরি করতে পারবে, এবং প্রাণী হত্যা করতে পারবে। কিন্তু গরুর মাংস খেতে পারবে না, ব্যভিচারী করতে পারবে না, এবং মদপান করতে পারবে না। দেখতো শীল পালন কতো সহজ করে দিলাম? ধ্যান-বিদর্শনে অনিত্য, দুঃখ, অনাত্মা জ্ঞান অর্জন, বা মেস্তা-করুণা-মুদিতা-উপেক্ষার অনুশীলন এত সহজ নহে; এগুলো খুবই কঠিন; সাধনা সাপেক্ষ। আমাদের চাই যেন-তেন উপায়ে অর্থ-বিশ্বশালী হওয়া। এই লক্ষ্য অর্জনে আমাদের চাই ঝাকজমক আকর্ষণীয়ভাবে নানা দেব-দেবীর পূজা আর উৎসব অনুষ্ঠানের আয়োজন। নিত্য নতুন দেব-দেবী-ব্রহ্মা, আচারিয়াদির পূজার প্রচলন করতে হলে, তাদের জন্যে চাই অলৌকিক-কীর্তি কাহিনীর গল্প সাজানো; তাদের পূজায় রোগ-ব্যাদি, আপদ-বালাই তৎক্ষণাৎ দূর হওয়ার গ্যারান্টি দেয়া। শুধু তাই নহে, আমাদের আরো দরকার হবে- গ্রহদোষ, গ্রহশান্তি, গাবন্ধ ইত্যাদির তাবিজ, জলপরা, সুতোপরা, সর্বশরীরের সর্বত্র ফোঁড় দেওয়া। ইত্যাদিকে আকর্ষণীয় আর কার্যকরী করতে বিদেশী উন্নত মানের ডাক্তারী ঔষধের সাথে দেশজ লতা-পাতার রস, শেকড় ইত্যাদি মেশায়ে বড়ি তৈরী করে দেব-দেবী, গুরু ইত্যাদির গুণ মহিমা বাড়াতে মন্ত্রপূত করা। আবার এই মন্ত্রকে আরো চমকপ্রদ, আরো বিশ্বাসযোগ্য করতে আমাদের প্রয়োজন হবে, রাতে বা দিনে দেবতা-ব্রহ্মার সাথে অদৃশ্যস্থানে অথবা জনতার সমাবেশে দু'হাত উপরে তুলে চক্ষু আকাশে নিবন্ধ করে কথা বলা, পরামর্শ করা।

হে বৌদ্ধ পরিচয়ধারীগণ! আপনারা পুত্র-কন্যাদেরকে বুদ্ধের শিক্ষা ও বুদ্ধপ্রেমী না করে সহসা, বিনাশ্রমে সর্ব আশা সর্ব প্রার্থনা পূরণকারী এসকল ভণ্ড-গুরুদের পদতলে সহসা দীক্ষিত করুন। দেখবেন ভোর হওয়ার বহু পূর্বেই তারা এক একজন অল্পদিনের চেরাগ হাতে পেয়ে গেছে। এ বিশ্বের এক ধনী দেশের সাংবাদিক বাংলাদেশে এসে, যত্র-তত্র মসজিদ, মাদ্রাসা, দূর্নীতি আর অনিয়মের ছড়াছড়ি দেখে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গেলেন। তিনি বললেন, বাংলাদেশে আর কিছু না থাকলেও, এখানে সত্যিই আল্লা আছেন। তা না হলে এদেশ চলে কি করে? হ্যাঁ আমরা বৌদ্ধগণ বুদ্ধের শিক্ষা-আদর্শ কি তা কোন দিন জানতে আগ্রহী না হলেও, জেনে ও বুঝে তা না মানলেও, অবশ্যই চিরদিন বৌদ্ধই থেকে যাবো। কারণ আমরা সৌভাগ্যক্রমে সেই আল্লার দেশেরই বৌদ্ধ।

জীবন-জীবিকায় বড়ুয়া মানসিকতা

প্রসঙ্গ : আছাদগঞ্জের বড়ুয়া ব্যবসায়ী সমাজ

খুব সম্ভব ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগেই এদেশের বাঙ্গালী বৌদ্ধ সমাজ উন্নয়নে দু'টি প্রধান উৎসের জন্ম হয়। তন্মধ্যে একটি হচ্ছে বড়ুয়াদের কিছু লোক বৃটিশ উপনিবেশিক আমলে বৃটিশ আমলাদের বাংলাতে বাবুর্চির কাজে যোগ দিয়ে, প্রচুর অর্থ রোজগার দ্বারা; এবং অপরটি হচ্ছে চট্টগ্রাম শহরের আশুরাস্তা তথা আছাদগঞ্জকে ভিত্তি করে শুটকি ব্যবসায় আড়তদারী পেশায় নিয়োজিত হয়ে, প্রচুর অর্থ রোজগার দ্বারা। দেখা যায়, ঐ দুই পেশার আর্থিক সঙ্গতিকে ভিত্তি করেই পরবর্তী কালে বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে আধুনিক শিক্ষা উন্নয়ন এবং ধর্ম ও সমাজ সংস্কার আন্দোলন এক বিশেষ গতি লাভ করে। বাবুর্চি পেশায় নিয়োজিত বড়ুয়া বৌদ্ধরা বৃটিশ সরকারের বড় লাঠ থেকে ডিসি'র বাসায় পর্যন্ত নিয়োগ লাভ করতেন বাবুর্চি হিসাবে। অপরদিকে বেসরকারী পর্যায়ে বৃটিশদের অনেক বড়ো বড়ো ধনী-ব্যবসায়ী ও প্রখ্যাত ব্যক্তিদের মধ্যেও বড়ুয়া বাবুর্চির সমাদর ছিল খুবই উঁচু মাত্রায়। ভারত উপমহাদেশের একান্ত প্রত্যন্ত অঞ্চলবাসী শিক্ষাদীক্ষাহীন এই চট্টগ্রামী বড়ুয়া বাবুর্চিরা তাঁদের ভদ্রতা, বিনয়-নম্রতা, দায়িত্বে বিশ্বাস যোগ্যতা, সর্বোপরি রন্ধন নৈপুণ্যতায়, বৃটিশদের পারিবারিক ও সামাজিক জীবনে এমন এক অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রভাব বিস্তারে সক্ষম হয়েছিলেন যে, বিশ্বখ্যাত গ্রন্থ উইপুপমডটবফরধ ডভ ইংরঃধরহরশধ-তে এই বড়ুয়া ইধৎধ শব্দের পরিচয় দান করতে গিয়ে তাঁরা উল্লেখ করেন-“ইধৎধ রং ধ পড়ড়শবৎ পড়সসঁহরঃ ডভ ঈয়রঃধমডহম, ডভ উধৎঃবৎহ ওহফরধ.....।”

একটি জনগোষ্ঠীর গুটি কয়েক মানুষ, একটি পেশায় কী পরিমাণ দক্ষতা ও প্রতিপত্তি অর্জন করলে, তাঁদের জন্মজাত পুরো জনগোষ্ঠীর পরিচায়ক হয়ে উঠতে পারেন, তা ইতিহাস উদাসীন আজকের বড়ুয়ারা ভাববেন কি? এই বাবুর্চি বড়ুয়াদের মাধ্যমেই এককালে শিক্ষাদীক্ষায় অত্যন্ত পশ্চাৎপদ এই বড়ুয়া জাতি আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষার মুখ দেখেছিল। রন্ধন শিল্প বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়ে ও অধ্যয়নের একটি বিষয়বস্তু রূপে স্থান পেয়েছে। অথচ অক্ষর-জ্ঞানহীন চট্টগ্রামী বড়ুয়া সন্তানেরা আপন মেধা ও আন্তরিক অধ্যবসায় গুণে, রন্ধন শালায় অন্যের দেখা দেখি এমন একটি বিদ্যাকে কেবল আয়ত্ত্বই করেনি, আপন সৃজন শীল মেধার উদ্ভাবনী শক্তি দিয়ে, তাঁরা রসনা তৃপ্তিকর নতুন খাদ্য সামগ্রী ভোজন-বিলাসী বৃটিশ জাতিকে উপহার দিয়ে ছিলেন যুগ যুগ ধরে। চট্টগ্রামী বড়ুয়া সন্তানদের সেই মেধাও কৃতিত্বের প্রভাব-প্রতিপত্তির প্রতাপ, এখনো যে একেবারে শেষ হয়ে গেছে তা নহে। ভারতের প্রধান মন্ত্রীর বাসভবন, রাষ্ট্রপতির বাসভবন, রাজ্যপালের বাসভবন থেকে শুরু করে ইউরোপীয় রাষ্ট্রসমূহের প্রয়াস

সকল রাষ্ট্রদূতের বাসভবনে আপনি এখনোদেখতে পাবেন বড়ুয়া সন্তানেরাই প্রায় সময় হেড কুক এর দায়িত্ব পালন করে চলেছেন। কিন্তু আশ্চর্য এই যে, শতাব্দীর অধিককাল বড়ুয়ারা চিরন্তন সম্ভাবনাময়ী, প্রাণীহত্যা বিহীন থাকার সুযোগ সম্পন্ন এমন এক পেশায় নিয়োজিত থেকেও, তাঁরা কি একক, কি যৌথ কোন ভাবেই খাদ্য শিল্প জাতীয় বড়োমাপের স্বাধীন কোন ব্যবসা সংস্থা, বৃটেনের সিলেটি বাবুর্চিদের মতো, অদ্যাবধি গড়ে তুলতে পারেন নি। কারণ কি? স্বাধীন জীবিকার প্রতি দারুণ অনীহা এবং দাসবৃত্তি নামক চাকুরীর প্রতি মজ্জাগত ঐকান্তিক আগ্রহীতাই এ জন্যে দায়ী। তারপরও একথা বললে কিন্তু, তথ্যটি অসম্পূর্ণই থেকে যাবে। বড়ুয়াদের সবচেয়ে বড়ো রোগ হচ্ছে, যে পেশাকে ভিত্তি করে তাঁরা জীবনে কিঞ্চিত হলেও দাঁড়ানোর ভিত্তি গড়ে থাকেন, সেই ভিত্তিকেই তাঁরা পরক্ষণে অস্বীকার করতে শুরু করেন। তাঁরা নিন্দা করেন, অবজ্ঞা করেন, তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যতা প্রদর্শন করেন, আপন ভিত্তি রচনায় অর্জিত সমস্ত অভিজ্ঞতাকে। দিল্লীতে অবস্থানকারী প্রধানমন্ত্রীর হেড কুক চট্টগ্রামের হোয়ারাপাড়া জাত আমাদের বড়ুয়া সন্তানটিকে, তাঁর দিল্লীস্থ বাসভবনে বসে একদিন প্রশ্ন করলাম, আপনার অধীনে এতলোক কাজ করছেন; অথচ আপনার একটি সন্তানকে এ রক্ষন পেশায় নিয়োজিত করলেন না কেন? আমার এ প্রশ্নের উত্তরে তিনি খুবই তাচ্ছিল্যের সাথে বললেন; এটা কি একটা কাজ নাকি, ভাঙে? একাজের কি কোন সামাজিক মর্যাদা আছে? আমাদের বড়ুয়ারা তো বাবুর্চিকে ‘মউগের মউগ’ বলে থাকেন। অভিযোগটি একান্তই সত্য। এই ‘মউগের মউগ’ অর্থাৎ বাবুর্চি মানে বউ এর বউ, এমন বাক্যকে বড়ুয়ারা খুবই অহংকারী অবজ্ঞা সূচক মনোবৃত্তি দিয়েই উচ্চারণ করে থাকেন। যেই রক্ষন শিল্প আজ বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি পাঠ্য বিষয়, বড়ুয়ারা তাকে শত বছর জীবন-জীবিকার অবলম্বন করেও, তার সঠিক মূল্যায়নে এই যে অক্ষমতা, এটা কোন মানসিকতা জাত বলতে পারেন? অকৃতজ্ঞতা, চরম অকৃতজ্ঞ মানসিকতাজাত এ আচরণ। কোন ব্যক্তি বা জাতি চরম অকৃতজ্ঞ রক্তের ধারক হলেই, এমন হীন মনোবৃত্তিকে যুগ যুগ ধরে লালন করতে পারে। ১৯৪৩ সনে মহাদুর্ভিক্ষের দিনে জীবন হাতে নিয়ে কপর্দকহীন এক বড়ুয়া সন্তান একদিন উপস্থিত হয়েছিলেন, আসাম রাজ্যের শৈল-নিবাস শিলং শহরে। আশ্রয় নিলেন স্বগ্রামী এক বড়ুয়া মোটর মেকানিকের কাছে। সেই আশ্রয়ে থেকে তিনি দক্ষতার সাথে আয়ত্ব করলেন সেই কারীগরী বিদ্যা। এক সময় জন্মস্থানে ফিরে এসে তিনি প্রথমে চাকুরী নিলেন ব্যক্তি মালিকানাধীন এক যানবাহন কোম্পানীর কাছে। ক্রমে চাকুরীর পাশাপাশি গড়ে তুললেন নিজস্ব একটি মেকানিকেল ওয়ার্কশপ। অচিরেই তিনি স্বগ্রামে ধন-ধান্যে, বিত্ত সম্পদে পরিণত হলেন এক গণমান্য বাবুতে। সেই ব্যক্তিকে একদিন আমি প্রশ্ন করলাম, কেন একজন পুত্রকেও আপনার পেশায়

নিয়োগ কেন করছেন না? তিনি বললেন, ভক্ত; এটা কি কোন জীবিকা? সারাদিন পোড়ামবিলে লেপটে থাকতে হয়। কেমন বিশ্রী লাগে আমার উচ্চ শিক্ষিত জ্ঞাতী-স্বজনদের সামনে! ভদ্রলোক মহোদয় এই মানসিকতার তাগিদে, সারা বছর গৃহ শিক্ষক নিয়োজিত রাখতেন আপন ছেলে-মেয়েকে উচ্চ শিক্ষিত করে তোলার প্রবল আগ্রহে। অতি আশা যে নিষ্ফল হয় এ প্রবাদটি আমরা অনেকেই স্বীকার করতে নারাজ। ফলতঃ দেখা গেল, তাঁর কোন সন্তানকেই তিনি উচ্চ শিক্ষায় উপযুক্ত করতে পারলেন না। জীবনের এই দারুণ ব্যর্থতায়, ক্ষোভে দুঃখে একসময় হার্টফেল করে অকালেই তিনি জীবনের অবসান ঘটালেন।

সুধী পাঠক; আমার উপরোক্ত বয়ানের হাজারো প্রমাণ মিলবে এদেশের ক্ষুদ্র বড়ুয়া সমাজে। তাই বড়ুয়াদের কোন বিত্ত-সম্পদ, বা ব্যবসা দুই এক পুরুষের বেশী-গড়াতে চায় না। পিতার অর্জিত সম্পদ হয়তো পিতার শেষ জীবনেই নিঃশেষ হয়ে যায়, নতুবা পুত্রের হাতেই শেষ হয়; প্রায়-নিশ্চিত ভাবে। তিন চার পুরুষ গড়ায় এমন বিত্ত-সম্পদের অস্তিত্ব বড়ুয়া সমাজে বড়ো বিরল ঘটনা। অথচ, অনুরক্ত বংবানিজ নামে আমার এক থাইবন্ধু, তাঁর ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানে একদিন আমাকে নিয়ে গিয়ে দেখালেন, তাঁদের বিশাল ব্যবসার সমৃদ্ধি। বললেন, এ ব্যবসার গত কয়দিন আগে উদ্‌যাপিত শতবার্ষিকীর ইতিহাস। কপর্দকহীন অবস্থায় চীন থেকে আগত তাঁর পূর্বপুরুষটি কিভাবে জন্ম দিয়েছিলেন এক ক্ষুদ্র ব্যসার। তা আজ ‘বংবানিজ গ্রন্থপ এণ্ড কোম্পানিজ’ নামে এক মহামহীর্নহ। এ ব্যবসার যিনি প্রধান, তিনি এখন ভিক্ষু জীবনে অবসর যাপন করছেন। কেমন সুশৃঙ্খল এদের জীবন। যে জাতির ভিত্তি যত অগভীর হয়, সেজাতির মানুষ গুলোর স্বভাব-চরিত্র এমনই হয় যে, ডালিম পাকিবার আগেই যেন ফেটে যায়। তারা অল্প বিত্ত-সম্পদের অধিকারী হয়ে, খুব সহজেই আবেগতাড়িত হতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন; মান প্রতিপত্তির প্রশ্নে ভীষণ চঞ্চল হয়ে ওঠেন। এ সমাজের সামান্য কয়েক লক্ষ বা কোটি টাকার মানুষগুলো, একারণেই দীর্ঘ-মেয়াদী কল্যাণ ময় গঠন মূলক কোন কাজে তাদের রুচি-আগ্রহ জন্মাতে অক্ষম। উপস্থিত ধন্য-ধন্য জয় ধ্বনি, আর অল্প সময়ে ভীষণ যশঃ খ্যাতি অর্জনের প্রতি তাদের ঝোঁক, তাই এতোবেশী। প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় বিচার বোধ, এমন মানসিকতায় হ্রাস পেতে বাধ্য। মানবের মনস্তাত্ত্বিক এই স্নায়ুবিদ্যিক দুর্বলতার সুযোগ সন্ধানীরা, তখন তাঁদের চারপাশে ভিড় জমায় বসন্তের কোকিলের মতো। ফলে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনে অপচয়ের মহোৎসব চলে কিছু কাল ধরে। এতে ক্রমান্বয়ে ধস্নানামে ব্যক্তি ও জাতীয় জীবনের সর্বক্ষেত্রে। সামাজিক ও পারিবারিক অস্থিরতা, হিংসা-বিদ্বেষ, পরনিন্দা, পরশ্রী কাতরতা, এ সকল দুরভাগ্যের শিকার হয়ে যাওয়া এমন ব্যক্তি বা জাতীর বংশধরগণ-ই

মানসিক ও আর্থিক অবনতির এক পর্যায়ে গিয়ে, দাস্য মনোবৃত্তিকে চিরন্তন আশীর্বাদ বলে বিশ্বাস করতে শুরু করেন। ক্ষমতাবান, শক্তি মানের পদলেহন, তেলেসমাতি, তোষামুদি প্রবৃত্তিই হয়, তখন এদের জীবনের অলংকার! প্রিয় পাঠক; ব্যক্তি ও সমাজ জীবনের এই অভিশাপ হতে আত্ম রক্ষার আকুল প্রার্থনায় আমরা বার বার আমাদের মন-প্রাণকে নিবেদিত করতে কি পারি না? চলুন না, প্রাণ খুলে হৃদয় উজাড় করে, এই মহান প্রার্থনা ব্রতে আমরা একটিবার নিজেকে সমর্পিত করি?

এবারে আসা যাক চট্টগ্রাম মহানগরীর আছদগঞ্জের বড়ুয়া বৌদ্ধ ব্যবসায়ীদের কথায়। পাকিস্তান আমল পর্যন্ত এই আছদগঞ্জের নাম ছিল আশু রাস্তা। ইসলামী নামাকরণের অসহিষ্ণু নেশা, চট্টগ্রাম মহানগরীর নন্দন কাননস্থ অনাথ বন্ধু বাজারকে করে নিল এনায়েত বাজার, রাউজানের মহাদেব পুরকে করে নিল মহম্মদপুর, দক্ষিণ ফটিকছড়ির কালাচন্দ্রের হাটকে করে নিল “কালাচান মিঞার হাট”। এমনি অসংখ্য উদাহরণ জর্জরিত ইতিহাস বিকৃতিতে সিদ্ধ হস্তের এই দেশে, পরমত অসহিষ্ণুতার এই দেশে, কেমন আছেন শত বছরের ঐতিহ্যের অধিকারী আশু রাস্তার বড়ুয়া ব্যবসায়ীরা? সংক্ষেপে বলতে গেলে ভালো-মন্দের কড়িও কোমলেই চলছে তাঁদের দিনগুলো।

১৯৮৯ হতে ৯৬ পর্যন্ত চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে উপাধ্যক্ষ থাকা কালে, এই আছদগঞ্জের বড়ুয়া ব্যবসায়ীদের অধিকাংশের সাথে গড়ে উঠেছিল আমার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। ফলে তাঁদের ব্যবসায়ী জীবনের সুখ দুঃখের ঘটনা থেকে পারিবারিক নানাবিধ বিষয়াশয় পর্যন্ত ছিল, আমার কাছে জানা। “বাণিজ্যে বসতে লক্ষী” এই প্রবাদটি কোন কালেই অস্বীকার করার নহে। যদি কেহ আর্থিক বদান্যতায় ধন্য-মান্য হতে চাহেন, তাঁকে অবশ্যই ক্ষুদ্র হোক, বৃহৎ হোক যে কোন একটি ব্যবসায় অবশ্যই পারদর্শী হতে হবে। “বিদ্যান সর্বত্র পূজ্যতে” এই সংস্কৃত প্রবাদটির আকর্ষণে আপনি বিদ্যান হওয়ার সাধনায় গেলে আপনাকে বাকপটু, লেখনি পটু, না হয়ে উপায় নেই। অতএব আছদগঞ্জের গদিতে বসে কাব্য চর্চা করতে যাওয়া, নানা সভা-সমাবেশে বক্তৃতা দিয়ে, হাততালি পাওয়ার অভিলাষ, কোন ধর্মদর্শন গুরুর মোহে, নিজেও গুরুগিরির আশ্বাদ লাভের চেষ্টা, মনে হয় স্ব ধর্ম বিচ্যুতির দিকেই ঠেলে দেবে আপনাকে।

আপনি বুদ্ধ যুগের ব্যবসায়ী ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী, মেভক শ্রেষ্ঠী, অনাথপিণ্ডিকদের মতো ব্যবসায়ী কোটিপতিদের দৃষ্টান্তটুকু সামনে রাখতে দোষ কি? তাঁরা দৃষ্টান্ত বিরল বুদ্ধপ্রেমী ছিলেন। মহান বুদ্ধের ধর্মাদর্শ প্রচারে নিবেদিত ছিলেন; একান্ত তদ্রূপ, নিরহংকারী দীন সেবকের মতো ছিলেন বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যদের প্রতি। তাঁরা অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম ভাবনার আশ্বাদ নিতেন ভ্রমরের মতো; মাছি, পিপড়ার মতো চিঠাগুড়ে আঁটকে মরার মতো নহে। তাই তাঁদের কাছে কেবল

অনুবুদ্ধ সারিপুত্র বা লাভী শ্রেষ্ঠী সীবলীই একান্ত প্রিয়জন ছিলেন না, ছোট শ্রমণটি থেকে শুরু করে শীলবান, ধ্যানবান যে কোঁন গুণবান, গুণান্বেষী ভিক্ষু শ্রমণ, সমান ভাবেই সমাদর পেতেন এ সকল নিরহংকারী বুদ্ধ প্রেমী, শাসন কল্যাণকামীদের কাছে। তাঁরা বুদ্ধ বা গুরু প্রেমে বাউল হয়ে যেতেন না। স্ত্রী-পুত্র পরিবার জ্ঞাতী স্বজনের ভরণ পোষণ, দান ধর্ম কুশল কর্ম সম্পাদনে যেমন, ঠিক একই ভাবে ব্যবসা বাণিজ্য নামক জীবন জীবিকার প্রতিও থাকতেন সবিশেষ উদ্যোগী অনুরাগীকে। কোন বিষয়ে উদ্যোগী হতে গেলে বিষয়টির প্রতি অনুরাগকে বন্ধু হিসেবে সাথে রাখতেই হবে। অনুরাগ, প্রেম না থাকলে যে কোন কর্মে বাঁধার পর বাঁধা ডিঙানোর শক্তি অচিরেই ফুরিয়ে যায়। ফলে ব্যর্থতার অভিশাপ তার জীবনে হয়ে উঠে অনিবার্য। বিষয়টি যত কঠিন হোক, সমস্যা যতই হোক পর্বত প্রমাণ; উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের প্রতি আপনার প্রেম অনুরাগকে উজ্জীবিত রাখতে পারলে, জয়ের মালা নিশ্চিত ভাবে আপনার গলাতেই যাবে। জীবনে যে কোন উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য অর্জন, রাজা হতে রাজপুত্রের সিংহাসন লাভের মতো সহজ নহে। তাই বিকল্প উপায়কে অবশ্যই আপনার সাথে রাখতে হবে; ধৈর্য্য ও সাহসকে বন্ধুর ন্যায় আপন করে নিয়ে। প্রবল বাঁধা অতিক্রমে, প্রয়োজনে এক পা পেছনে চলে এসে, দুইপা সামনে এগুনোর শক্তি সঞ্চয়ে অবকাশ নিতে হবে। পূর্বের পরিচিত পথে এগুতে না পারলে, বিকল্প উপায়; যেমন, যুগ যুগ ধরে যেই গুটকীকে শুধু কাঁচামাল হিসেবে পণ্য করে রেখেছেন; থাই-ব্যবসায়ীদের মতো তাদেরকে টিনজাত বা পেকেট পণ্যে পরিণত করলে, স্বদেশে ও বিদেশে বেকারী পণ্যের ন্যায় বিরাট বাজার লাভের সম্ভাবনা নাই কি? একার পক্ষে সম্ভব না হলে, যৌথভাবে এই প্রক্রিয়া শুরু করুন। আপনাদের সন্তান, বংশধরগণকে ইঞ্জিনিয়ার, অধ্যাপক, অফিসার বানানো চেয়ে এই জীবিকাকে অত্যাধুনিক বানিজ্যে পরিণত করতে তাদেরকে গবেষক ব্যবসায়ীতে পরিণত করুন। আগাখান, টাটা, বিড়লা, মড়োয়ারীদের বংশ ইতিহাস জানতে, বুঝতে, তাদের উদ্বুদ্ধ করুন। বংশধরগণকে চাকুরী পেশার প্রতি অনীহা জন্মানোয়, এবং যে কোন ব্যবসার প্রতি রুচি উৎপাদনের সাধনা করুন। মনে রাখবেন, যে কোন একটি জীবিকাকে ধ্যান-গবেষণার বিষয় করে নিতে হবে, জীবনের যে কোন মহৎ লক্ষ্য অর্জন করতে হলে। এতে সময় লাগতে পারে, বিলম্ব হতে পারে, কিন্তু অবিরাম প্রয়াসে জয় আপনার অনিবার্য, এটা জেনে রাখবেন।

আহুদগঞ্জের বড়ুয়া ব্যবসায়ীদের মাঝে আমার উপরোক্ত কথা গুলোর সম্যক মূল্যায়ন হওয়া একান্ত প্রয়োজন; যদি তাঁরা পূর্ব-পুরুষগণের আশীর্বাদ স্বরূপ প্রদত্ত এই ঐতিহ্যবাহী আড়তদারী কে টিকিয়ে রাখতে চান। কেহ কেহ বলেন, বাবুর্চি গিরি এবং মাছের আড়তদারী তো বুদ্ধ নিষিদ্ধ বানিজ্য। কারণ, এ দুইটি

প্রাণী হত্যার সাথে সংশ্লিষ্ট। বুদ্ধের নিষেধাজ্ঞা সম্পর্কে বড়ুয়া সমাজের এই ধারণা অত্যন্ত অগভীর। প্রাণী হত্যার বিষয়টি বৌদ্ধধর্মে সম্পূর্ণ মানসিক পর্যায়ে ভুক্ত। মহাকারুনিক বুদ্ধ এই কথাটি বুঝাইতেই স্রোতাপন্থা ব্যাধপত্নী কর্তৃক, স্বামীর শিকার কর্মের জন্যে তীরে শানদেয়া, এবং তীরের ফলায় বিষ প্রয়োগ ঘটনায়; ব্যাধপত্নীর অপ্রমেয় মৈত্রীচিহ্নটি সবার সমক্ষে তুলে ধরেছিলেন। সকলের বুদ্ধ জ্ঞান উদয় হোক। সকলের মঙ্গল হোক!

[পশ্চিম বিনাজুরী রত্নাকুর বিহারে পরিনির্বাণ বুদ্ধ মূর্তি উৎসর্গ স্মরণিকা ২০০৬]

-----o-----

ভিক্ষু বিহার ও দায়ক-দায়িকা

ভিক্ষু বিহার ও দায়ক এ তিনটি শব্দ বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনে বহুল আলোচিত বিষয়। খৃষ্টপূর্ব ৬ষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতের হিমালয়ের পাদদেশের শাক্য রাজা শুদ্ধোধন তনয়, সিদ্ধার্থ গৌতম কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত এক আদর্শ সাংঘিক জীবনের সভ্যগণকে সাধারণতঃ ভিক্ষু বলা হয়। সেই ভিক্ষুগণের নিরাপদ অবস্থান স্থলকে বলা হয় বিহার। উক্ত বিহার নিঃস্বার্থভাবে ভিক্ষু সংঘকে দান করে, তথায় আবাসিক রূপে অবস্থানকারী ভিক্ষুগণকে, অনু, বস্ত্র, ঔষধ দানকারী উপাসক-উপাসিকাদেরকে বলা হয়, চারি প্রত্যয় দানকারী দাতা বা দায়ক-দায়িকা।

ভগবান বুদ্ধের সময়ে দেখা যায়, তিনি নিজেই তাঁর প্রব্রজ্যিত জীবননের প্রথম ছয়টি বছর (১) কৃচ্ছ ব্রত গ্রহণের পূর্বে ও পরে কোন বিহারে অবস্থান করেননি; বৃক্ষমূলে, খোলা আকাশের নীচেই দিবা-রাত্র অবস্থান করেছিলেন। (২) তিনি ভিক্ষান্ন নির্ভর ছিলেন, কোন ব্যক্তি বিশেষের আমন্ত্রণাদির অনু-ব্যঞ্জনের উপর নির্ভরশীল ছিলেন না। (৩) তিনি দেহাচ্ছাদনের বস্ত্র নিজেই তৈরী করতেন, শাশানের মৃতদেহ হতে অথবা আবর্জনা স্ত্রুপে ফেলে দেয়া বস্ত্রখন্ড দিয়ে। বহু শত ধনী, শ্রেষ্ঠী তাঁর ভক্ত অনুরক্ত থাকা সত্ত্বেও সজ্জ ও বিহারাদি প্রতিষ্ঠান গড়ে না উঠা পর্যন্ত তাদের কোন উত্তম দান তিনি গ্রহণ করতেন না। (৪) অসুস্থতায় তিনি উপস্থিত হতেন না কোন চিকিৎসকের কাছে। পশু, পাখীরা স্বমল-মূত্র পদ্ধতি দ্বারা স্বচিকিৎসার যেই পদ্ধতি সেই পদ্ধতির মাধ্যমেই তিনি নিজের রোগ নিরাময় করতেন।

পরবর্তীকালে দেখা গেছে বুদ্ধের শিষ্য সংঘের মধ্যে অতি শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্যিত হয়েও, কোন কোন ভিক্ষু এত কঠোরতা অবলম্বনের জন্যে শারীরিকভাবে অক্ষম ছিলেন। অনেকে মার্গফলাদি লাভের হেতু সম্পন্ন হয়ে এত কঠোরতায় ছিলেন নবাগতেরা মানসিকভাবে অক্ষম সেই হেতু তাঁরা প্রব্রজ্যা ত্যাগ করে, পুনঃ গৃহবাসে ফিরে যাচ্ছেন। ভগবান তাদের প্রতি অনুকম্প প্রদর্শন করে পরবর্তী কালে নির্দেশ দিলেন, হে ভিক্ষুগণ! যদিও পূর্বোক্ত চারিটি বিধি প্রতিপালনে, প্রব্রজ্যিত মাত্রেরই আজীবন উৎসাহিত থাকতে হবে, তবুও বিশেষ কোন পরিস্থিতিতে প্রব্রজ্যিতগণ (১) গৃহীদের শ্রদ্ধা প্রদত্ত বিহার, অর্ধযোগ, হর্ম্য, গুহা ইত্যাদি আবাসে অবস্থান করতে পারবে। (২) গৃহীদের শ্রদ্ধা প্রদত্ত নিমন্ত্রণ, পরলোকগতের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত অনু-ব্যঞ্জনাদি ভোজন করতে পারবে। (৩) গৃহীদের শ্রদ্ধা প্রদত্ত সুতী, কার্পাস, রেশম, লোমাদি দ্বারা তৈরী বস্ত্র, ব্যবহার করতে পারবে এবং (৪) গৃহীদের শ্রদ্ধা প্রদত্ত ঔষধ, তৈল, মধু, গুড়, ঘৃত, মাখন এসকল দ্রব্য, রোগের পথ্য হিসেবে ব্যবহার করতে পারবে। (মহাবগ্গো/মহাঙ্কজ উপসম্পদা বিধি, মহাবর্গ পরিক্রমা পৃঃ ৯৩)

পরবর্তীকালে ভগবান তথাগত পূর্বোক্ত চারিটি বিধানের মধ্যে আবাস ও চিকিৎসা বিধিটির আরো সম্প্রসারণ করে বিনয় মহাবর্গে 'ভৈষজ্য স্কন্ধ' কঠিন চীবর স্কন্ধ বিনয় চূলবর্গে 'শয়নাসন স্কন্ধ (পৃঃ ৩৮৪) নামে তিনটি পৃথক বিভাগ সৃষ্টি করেছেন। ভগবান বুদ্ধের এই সংশোধন সংযোজনের লক্ষ্য হলো স্থান, কাল, পাত্র-এই ত্রিপর্যায়িক বিচার বিবেচনাকে উর্ধ্বে স্থান দান করা। তবে এক্ষেত্রে প্রব্রজ্যার মূল লক্ষ্য সেই দুঃখমুক্তি নির্বাণ সাধনার পথ হতে ভোগ-বাহুল্যতা বা আরাম-আয়াসের মোহে কোন প্রকার বিচ্যুতিকে, তিনি মোটেই স্বীকার করে নেননি। সর্ব দুঃখহীন নির্বাণ নামক আদর্শ উদ্দেশ্যকে অক্ষুণ্ণ রেখে, মূল লক্ষ্যে পৌছানোর গতিতে সর্বকালে গতিশীল প্রাণবন্ত রাখা উদ্দেশ্যেই মহাচার্য তথাগত বুদ্ধ তাঁর শিক্ষাদর্শের অনুসারী ভিক্ষুগণকে চারি পারাজিকা হতে যে কোন মূল্যে আত্মরক্ষা এবং স্থান, কাল, পাত্রের প্রতি সর্বদা সজাগ; সতর্কতা এবং ধর্ম-বিনয়ের প্রতি সর্বদা শ্রদ্ধাশীল থাকতে বলেছেন। এ যেন পোষাক পরিবর্তন করে, দেহ-মনকে রক্ষা করে চলা।

বর্তমান মূখ্য আলোচ্য বিষয় এদেশের ভিক্ষু, বিহার ও দায়ক সমাজ নিয়ে। 'ভিক্ষু' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো 'সংসার বট্ঠদুঃখতো ভয়ট্ঠেনতীতি ভিক্ষু'- অর্থাৎ স্ত্রী-পুত্র-কন্যাতির অসংখ্য দায় ভারে নিত্য উপদ্রবিত জীবন হতে মুক্তি। সর্বোপরি স্বদেহ ধারণে নিত্য ক্ষুধা-তৃষ্ণার উপদ্রব, প্রিয়-বিচ্ছেদ, অপ্রিয়-সংযোগের যন্ত্রণাদি হতে চির অব্যাহতি কামনায়, গৃহী জীবন ত্যাগ করে মুক্ত পাখী তুল্য যেই জীবন; সেই প্রব্রজ্যার শরণাপন্ন ব্যক্তিকে ভিক্ষু বলা হয়। তাই একজন ভিক্ষুকে তাঁর ভিক্ষু জীবনের গঠন, সংরক্ষণ ও পরিচালনার উদ্দেশ্যে,

ভগবান বুদ্ধ প্রণীত বিনয় বিধান সম্পর্কে অবশ্যই সামগ্রিক ধারণা, ও আচরণ অভিজ্ঞতা থাকা একান্ত প্রয়োজন। ভিক্ষু জীবনের 'প্রাণ' নামক বিনয় পিটক সম্পর্কে অনভিজ্ঞ, এবং সেই বিনয় নীতি প্রতিপালনে অনাগ্রহী ব্যক্তি, মস্তক মুন্ডন করে কাষায় বসন ধারণ পূর্বক, ভিক্ষাপাত্র হাতে নিয়ে নিয়ত ভিক্ষা করে খেলেও, তিনি মোটেই ভিক্ষু নহেন। এমন ছদ্মবেশী ভিক্ষুকে যারা জেনে শুনে দান, সেবা, সম্মান-সংকারদি প্রদান করেন; তারা ঐ দুঃশীল ভিক্ষুর পাপীষ্ঠ জীবনাচারের সহায়ক হয়ে, নিজেরাও নরক গমনের পথ প্রশস্ত করে থাকেন। ধর্ম-বিনয় সম্পর্কে অনভিজ্ঞ ভিক্ষু স্বজীবনের প্রকৃত করণীয় কর্তব্য শীল, সমাধি ও ধ্যান বিদর্শন সাধনাকে বিসর্জন দিয়ে, গৃহীযোগ্য নানা শিক্ষাও নানা কাজে ব্যস্ততায় এবং ধ্যান সাধনার নামে লাভ-যশ ও ভোগ বিলাসীতার প্রত্যাশী ভিক্ষুকে, যে সকল দায়ক-দায়িকারা অনু, বস্ত্র, বাসস্থান ও ঔষধ-পথ্য দান করে থাকেন; সে সকল দাতারা মূলতঃ বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘের প্রকৃতঃ আদর্শ, উদ্দেশ্য এবং ধর্মতাকে বিনষ্ট করার সহায়ক হয়ে নিজেদের নরক গমনের পথই প্রশস্ত করেন মাত্র। তাই বুদ্ধের নির্বাণ ধর্মের প্রকৃত শিক্ষা সম্পর্কে অনভিজ্ঞ দায়ক-দায়িকা ও উপাসক-উপাসিকারা, বিহার নির্মাণ করে তথায় দুঃশীল, দুরাচারী, ধর্ম-বিনয়ে মূর্থ, অথচ গৃহীদেরকে নানা উপায়ে মুঞ্চকারী, সন্তোষ উৎপাদনকারী ভিক্ষুকে রেখে তাকে অনু, বস্ত্র, খাদ্য-পানীয় দান করতে গিয়ে তারা প্রকৃতপক্ষে বুদ্ধ শাসনকে ধ্বংসের কাজই করে থাকেন। বাংলাদেশে বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় সম্পর্কে জ্ঞানহীন, বৌদ্ধ নামধারী দায়ক-দায়িকা এবং ভিক্ষুদের, বর্তমান এই আত্মঘাতী পরিস্থিতি সবিশেষ অনুধাবন করেই মহাপুরুষ আর্য শ্রাবক বনভন্তে কিছু উপদেশ উপস্থিত সবাইকে বার বার দিয়ে থাকেন যেমন, ১) দুষ্ট গরু থেকে শূন্য গোয়াল যেমন ভালো, তেমনি দুঃশীল ভিক্ষুকে বিহারে না রেখে, কেবল মাত্র একটি বুদ্ধমূর্তি রেখে ফুল-প্রদীপ ও সুগন্ধি দ্বারা সকাল-বিকাল বন্দনা করা বহুগুণে উত্তম ও নিরাপদ। কারণ, এতে পূজা দানকারীর হৃদয়ে নিকলুষ, পবিত্র, অনাবিল শ্রদ্ধা চিত্ত ও কুশল সংস্কার বলবৎ হবে। তাতেই সে একদিন সর্বদুঃখ হতে মুক্তি লাভ করতে পারবে। দুঃশীল, দুরাচারী ভিক্ষুকে সেবা-পূজা করলে দাআকেও নরকে যেতে হয়।

২) হিন্দু ব্রাহ্মণ প্রভাবিত এদেশের বৌদ্ধ সমাজে এক সময়ে যেমন প্রয়োজন ছিল পুরোহিত ব্রাহ্মণ ঠাকুরের ন্যায় পুরোহিত ভিক্ষুত্ব প্রথা; লক্ষ্মীপূজার পরিবর্তে সীবলী পূজার প্রথা। ঠিক একইভাবে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান মনস্ক অহংকারী গৃহীদের প্রভাবিত করতেও এক সময় প্রয়োজন ছিল ভিক্ষু-শ্রমণদের জন্যে গৃহী জনোচিত কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী এবং অনাথাশ্রমাদি সমাজ ও মানব সেবামূলক কর্মকাণ্ড। কিন্তু এখন প্রয়োজন হয়ে পড়েছে বুদ্ধের প্রকৃত ধর্ম দর্শন ভিত্তিক বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জীবনাচারে পরিবর্তন সাধন। বাংলাদেশের বর্তমান

মেধাবী ভিক্ষুদের এখন জরুরী কর্তব্য হচ্ছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ে গৃহীত জীবিকার উপযোগী যেই অধ্যয়ন, অধ্যাপনার ডিগ্রী আছে, তার পেছনে ধাবিত না হয়ে, অনাথাশ্রম, তাঁতকল ইত্যাদি খৃষ্টান মিশনারী গৃহীত উপযোগী স্কুল মানব সেবায় জড়িত না হয়ে; আপন মেধা, বুদ্ধি ও ধীশক্তিকে ত্রিপিটক শাস্ত্র অধ্যয়ন, ধ্যানমূলক গবেষণা, এবং শীল-বিনয় অনুশীলনে গভীর শ্রদ্ধার সাথে আত্মনিয়োগ করা। বুদ্ধবাণীর যুগোপযোগী ব্যাখ্যা ও উপস্থাপনার জন্যে, তারপরেই প্রয়োজন অন্যান্য ধর্ম-দর্শন নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণা ভিক্ষু হয়ে বুদ্ধের শিষ্য বলে পরিচয় দিয়ে, যদি বুদ্ধ বাণীকে জানা ও বুঝার দায়িত্ব ভিক্ষুদের দ্বারা গ্রহণ করা না হয়; তাহলে এদেশে দায়িত্ব নেবে কে? বুদ্ধ বাণীর বিশাল সংগ্রহ এই ত্রিপিটক, তার ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণযুক্ত অর্থকথা-গ্রন্থ সমূহ, বিশদভাবে অধ্যয়ন ও গবেষণা সমাপ্ত করে; অন্যান্য ধর্ম দর্শনের উপর ও একজন ভিক্ষুর তুলনামূলক অধ্যয়ন গবেষণা থাকা একান্ত প্রয়োজন। শীল, সমাধি ও ধ্যান-বিদর্শনের অনুশীলনকারী ত্রিপিটকসহ বহুভাষাভিজ্ঞ সম্পন্ন ভিক্ষুর পক্ষেই শুধু সম্ভব বর্তমান যুগে আত্ম-পর কল্যাণে অবিস্মরণীয় অবদান রাখা। তাই বাংলাদেশী বৌদ্ধ যুবকদের উচিত রং বস্ত্র নিয়ে স্কুল, কলেজে, বি,এ এবং এম,এ অধ্যয়ন নহে; গৃহীত জীবনে এম,এ; বি,এ অধ্যয়ন শেষ করে, তারপরেই ভিক্ষু হওয়া। তাতে তারা ইংরেজী ভাষায় ত্রিপিটকের যে সকল গ্রন্থ অনুবাদিত হয়েছে সেগুলো পড়তে পারবে, বুঝতে পারবে, অধিগত করতে পারবে, এবং প্রচার করতে পারবে সম্যকভাবে। অন্যথায় উচ্চতর নৈতিক শীলে প্রতীক গৈরিক বসনগায়ে নিয়ে, নিম্নতর পঞ্চশীল ও নেই এমন গৃহীত শিক্ষক-শিক্ষিকাদের নিকটে পড়তে গেলে; বুদ্ধের জ্ঞানকে, তাঁর নৈতিক উন্নত জীবনাদর্শকে; হেয়, নিকৃষ্ট, অপূর্ণ বলে প্রমাণ করা হয়। কারণ বুদ্ধের শিক্ষাদর্শে, জ্ঞানে-ধ্যানে হীন-উৎকৃষ্ট, বিচার করা হয় শীলাচারণে তারতম্যতার মাপ-কাঠিতে, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী, সংস্থা সংগঠনের পদবী বা ধন ও জনের ক্ষমতায় নহে। এ কারণেই পঞ্চশীল পর্যায্যভূক্ত গৃহীত মাতা-পিতা বা সেই তৎস্থানীয় হলেও দশশীলধারী একজন ছোট শ্রমণকে শীলগুণে নিজের চেয়ে উন্নত শ্রেষ্ঠ জ্ঞানে বন্দনা করতে হয়, সম্মান-গৌরব করতে হয়।

এদেশের ভিক্ষু ও গৃহীদের সম্পর্কে শ্রদ্ধেয় বনভন্তের এই ধারণা ও এই উপলব্ধি একান্তই সম্যক ও সঠিক। অতিশয় সংখ্যালঘু এদেশের বৌদ্ধ সমাজ আজ বড়ুয়া, চাকমা, মারমা- এই তিন ভাগে বিভক্ত হয়ে; ধর্মানুভূতি, ধর্মপ্রেমের দুর্বলতার কারণে পরস্পর হতে বহু দূরেই অবস্থান করছে। অপরদিকে দলগত বিভক্তি, সংগঠনগত বিভক্তি, গুরু-শিষ্যগত বিভক্তি সহ, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিহার সমূহে বিচ্ছিন্নভাবে একক অবস্থানের কারণে এদেশীয় বর্তমান ভিক্ষুরা নিজেদের জীবনে, মননে সত্যিকার সাংঘিক চিন্তা-চেতনা ও সাংঘিক শক্তির বহিঃ প্রকাশ

ঘটাতে পারছেন না। ফলে এদেশের বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক জীবনের সমুদয় অগ্রগতি এবং মৌলিক পরিবর্তনের সকল দরজা একে একে রুদ্ধ হয়ে আসছে। ভিক্ষু-গৃহী উভয়ক্ষেত্রে যৎসামান্য বিত্ত, ও ডিগ্রী ও প্রভাব প্রতিপত্তির অহমিকাজাত বাড়াবাড়ি চলছে আজ সমাজের সর্বত্র। তাই একই আদর্শ, উদ্দেশ্য ও লক্ষ্যের ঘোষণা সকলের মুখে উচ্চারিত হলেও, বস্তুতঃ খৃষ্টান ও ইসলামী সমাজের ন্যায় কেহই একক কোন ধর্ম নেতৃত্ব, বা সমাজ নেতৃত্ব স্বীকার করতে রাজি নহেন।

এদেশের বৌদ্ধ সমাজ এখন অতীতের ব্যবহারিক আধুনিক শিক্ষাগত পশ্চাতপদতা অনেক খানি কাটিয়ে উঠেছে। একইভাবে অর্থনৈতিক দুর্বলতাও কাটিয়ে উঠেছে বহুগুণে। জাতীয়-আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিতি ও অবস্থানকেও তারা এখন অনেকদূর এগিয়ে নিয়ে এসেছে। এমন একটি উত্তোরণমুখি সমাজে ভিক্ষু ও গৃহী নেতৃত্বে তাই অতীব জরুরী হয়ে পড়েছে মধ্যযুগীয় তোষণনীতির অভ্যাস, ধ্যান ধারণা ও আশা-আকাঙ্ক্ষার পরিবর্তন ঘটানো। পূর্ব পশ্চিমা উন্নত বিশ্বের মানুষ যেখানে বিনা আত্মানে আপনার ঘরে এসে মানবিক সেবায় নিয়োজিত হচ্ছে; সে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ এবং যেখানে বুদ্ধের মৌলিক শিক্ষাদর্শ 'চারি আর্য়সত্য, প্রতীত্যসমুৎপাদনীতি' কে আধুনিক বস্তু বিজ্ঞান, ও তৎপ্রভাবিত সভ্যতার পূর্ণতার জন্য অত্যন্ত জরুরী বলে মূল্যায়ণ শুরু করেছেন; সেক্ষেত্রে আমরা প্রাচীন বৌদ্ধ জন-গোষ্ঠীর চিন্তন-আচরণ ও স্বভাব রুচিকে শুধুমাত্র আমবস্যা-পূর্ণিমা, পূজা ও তিথি, শ্রাদ্ধ নামক কতগুলো অনুষ্ঠান সর্বস্ব আবদ্ধ রেখে মধ্যযুগীয় পশ্চাত মুখিতার পরিচয় দিচ্ছি কেন? বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজের ভিক্ষুদের মধ্যে মেধা ও মননশীল যারা তাঁদের পক্ষে এখন উচিত পালি, ইংরেজী, হিন্দি সহ শিল্পোন্নত জাতীসমূহের ভাষাগুলো আয়ত্ত্ব করে থেরবাদী ও মহাযানী সমস্ত বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ সমূহ অধ্যয়ন এবং গবেষণা করা; এবং স্থান-কাল-পাত্র উপযোগী শীল-বিনয় নীতি ধ্যান-বিদর্শন সমূহ গভীর শ্রদ্ধা-গারবতার সাথে শিক্ষা ও অনুশীলন করে নিজেকে দক্ষ, উৎকৃষ্ট ধর্ম প্রচারক ভিক্ষুরূপে গঠন করতে, সর্বশক্তি নিয়োগ করা। এমন দক্ষতা অর্জনকারী ভিক্ষুর মাধ্যমেই দেশে বিদেশে এই ধর্ম, সমাজ ও জাতি সুসভ্য আদর্শ জাতি হিসেবে সম্মান ও গৌরবণীয় আসন লাভে সক্ষম হবে। ভিক্ষু জীবন ও মৌলিক বুদ্ধ শিক্ষা ব্যতীত বর্তমান বিশ্বে অন্যকোন মত, পথ, বা শক্তিতে আমাদের প্রতিষ্ঠা অর্জনের সে সুযোগ আজ আর নেই। তাই এমন দক্ষ ভিক্ষু গড়ে তোলার স্বার্থে বড়ুয়া গৃহীদের উচিত প্রতিটি বিহারে প্রবীণ ভিক্ষুদের জন্যে পালার ছোয়াইং প্রথাকে অক্ষুন্ন রেখে, আরো অধিক সংখ্যক ভিক্ষু-শ্রমণ প্রটিটি বিহারে অবস্থান করানোর প্রয়োজনে ভিক্ষান্ন তথা পিণ্ডচারণ প্রথা প্রবর্তন করানো। বিহারে শুধু একজন ভিক্ষুর অবস্থান হলে স্বাভাবিকভাবেই তিনি সাংঘিক

জীবনের মন-মানসিকতা হারিয়ে ফেলেন। ফলে তার মধ্যে স্বেচ্ছাচারী আত্মসর্বস্ব স্বভাব প্রকট হয়ে উঠে। বিহারে একাধিক ভিক্ষু-শ্রমণের অবস্থান হলে, তথায় সাংঘিক নির্ভরতা এবং নিয়ম-শৃঙ্খলার শিক্ষা ও অনুশীলন স্বাভাবিকভাবেই জন্মলাভ করে থাকে। এমন সাংঘিক বিহারে ভিক্ষু-শ্রমণ ও সেবকগণের নৈতিক চরিত্র গঠন, ধর্ম-বিনয় শিক্ষা অধ্যয়ন, ও ধ্যান-সাধনা অনুশীলনের পরিবেশ গড়ে তুলতে দায়িত্বশীল থাকতে হবে আচার্য স্থানীয় স্থবির-মহাস্থবিরগণকে। ইংরেজী, বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা ও ধর্ম-দর্শন শিক্ষা-গবেষণায় বিহারবাসী ভিক্ষু শ্রামণদের সুদক্ষ করণে দায়িত্ব পালন করতে হবে সমাজের শিক্ষিত প্রবীণ অথচ শীলবান ধর্মপ্রাণ গৃহীজনকে এই পরিবেশ গড়ে তোলার প্রাথমিক পর্বে। ভিক্ষুরা যখন এই শিক্ষায় দক্ষ হয়ে উঠবেন, তখন শিক্ষার সমস্ত দায়িত্ব তারাই নিয়ে নিতে পারবেন। অপরদিকে বিহারের সকল আবাসিকগণের যাবতীয় শিক্ষা উপকরণ, বস্ত্র-বাসস্থান, চিকিৎসা ও যাতায়াত ব্যয় নির্বাহে গৃহী দায়কদের কর্তব্য হবে প্রতিটি বিহার ভিত্তিক বুদ্ধ সাসন সেবা ফান্ড গঠন করা।

এদেশের বৌদ্ধ সমাজের বর্তমান অবস্থার আলোকে আরো বলা প্রয়োজন যে, গৃহীরা কোন সভা-সমাবেশে ভিক্ষুদেরকে কর্মবীর, ডক্টর, অধ্যাপক, প্রধান শিক্ষক, এম,এ ইত্যাদি অভিধায় সম্মান প্রদর্শনের অভ্যাসকে পরিবর্তন করে; পালি ভাষাভিজ্ঞ, ত্রিপিটক গবেষক, বিনয় শীলগারবী, শমথ-বিদর্শন সাধক, সুত্রাচার্য, বিনয়াচার্য, অভিধর্মচার্য, ধর্মধর, বিনয়ধর, বিনয়ভাণক, ধর্মভাণক, ধর্মদেশক, ধর্মপ্রচারক, সংঘরক্ষক, অন্তেবাসী বা ধর্ম বিনয় শিক্ষার্থী শিষ্যরক্ষক, সংঘনায়ক ইত্যাদি জাতীয় বৌদ্ধ সংস্কৃতি দ্যোতক অভিধায় সম্মানিত করা উচিত। এভাবে সম্মানিত করা হলে ভিক্ষুদের মধ্যে তেমন তরো গুণবান ভিক্ষুর জন্মকে সমুৎসাহিত করার মতো মহাপুণ্যের অধিকারী হয়ে থাকেন, ঘোষণাকারী বা সম্বোধনকারী ব্যক্তি। এতদ্বারা গুরুত্বপূর্ণ শাসন সেবামূলক দায়িত্ব ও পালন করা হয়ে থাকে।

অপরদিকে বৌদ্ধ গৃহীগণকে লায়ন, রোটোরিয়ান এসব না বলে; বিশিষ্ট শিল্পপতি, অমুক দাতা, শাসন-সেবক, বিহার-দায়ক, ভিক্ষু-শ্রমণ সেবক, শ্রমণপুত্র দাতা মাতা-পিতা, ভিক্ষু-পুত্র দাতা মাতা-পিতা, সমবেত উপাসনাকারী, ধ্যানকারী, পঞ্চশীল রক্ষাকারী, উপোসথিক, ইত্যাদি বৌদ্ধ শিক্ষা সংস্কৃতি অনুকূল অভিধায় প্রশংসা করা একান্তই কর্তব্য। শ্রীলংকার বৌদ্ধ সমাজে আমি দেখেছি, ভিক্ষু-শ্রমণের মাতা-পিতাকে যে কোন সভা-সমাবেশে সর্বাত্মে সম্মান প্রদর্শন করা হয়। মনে হয় এ কারণেই, সেই ক্ষুদ্র দ্বীপে বিগত আড়াই হাজার বছর ধরে গুণবান, মেধাবী ভিক্ষু-শ্রমণের কোনদিন অভাব পরিলক্ষিত হয়নি। আমাদের সমাজে এই সুরীতির অনুশীলন না থাকতে আজ মেধাবী ভিক্ষু সংকট দেখা দিয়েছে এবং কোন শিক্ষিত সম্ভ্রান্ত সন্তান স্থায়ী প্রব্রজ্যা গ্রহণে আগ্রহ দেখাচ্ছেন না।

এদেশের বৌদ্ধ সমাজের ভিক্ষু ও দায়ক সম্পর্কে আরো অনেক কিছু বলার থাকলেও, লেখার পরিসর বৃদ্ধির ভয়ে নিরস্ত হলাম। তবুও বড়ুয়াদের বিহার নিয়ে এখানে কিছু বলা প্রয়োজন। বড়ুয়াদের প্রায় সকল বিহার গৃহীদের ধর্ম-কর্ম রক্ষার স্বার্থে স্থানীয় গৃহীদের উদ্যোগেই তৈরী হয়। বিহার নির্মাণে এ সমাজের ভিক্ষুরা গৃহীদের সহায়ক ভূমিকাই সচরাচর পালন করেন। বিহার নির্মাণ শেষে প্রথাগত নিয়মে পালি ভাষায় বিহারকে 'ইমং বিহারং আগত-অনাগত ভিক্ষু সঙ্ঘস্স দানং দেম পূজেমা'- বাক্যটি বলে গৃহীরা জল ঢেলে বিহার উৎসর্গ করলেও; এই বিহারের কর্তৃত্ব নেতৃত্ব সর্বকালে সেই নির্মাতা গৃহীদের হাতেই থেকে যায়। আর ধর্ম-বিনয় জ্ঞানের অভাবে এই গৃহীরা, আধুনিক ক্লাব-সমিতির সংবিধানের আলোকেই বিহার পরিচালনা কমিটি গঠণ করেন, এবং বিহারের ও ভিক্ষু শ্রামণদের রক্ষণাবেক্ষণ দায়িত্ব পালন করে থাকেন। এতে করেন বিহারবাসী ভিক্ষু-শ্রামণদের স্বাধীন জীবন চেতনা, এখানে ভীষণভাবে ব্যাহত হয়ে, এ সমাজের ভিক্ষুরা আজীবন ভাসমান শেওলার মতো ভিত্তিহীন অসহায়ত্বে ভোগতে থাকেন। কোন বৌদ্ধ প্রধান দেশে এমন অমানবিক রীতিটি বিদ্যমান নেই। এমন কি আমাদের প্রতিবেশী মারমা সমাজেও তা নেই। বড়ুয়া সমাজের বিহারকে কেন্দ্র করে আরো দুঃখ ও লজ্জাজনক বিষয় হলো, বিহার পরিচালনা কমিটির অধিকাংশ সদস্য মনোনীত হন, যাদের অন্তরে ধর্মবোধ, ধর্মপ্রেম অতিশয় দুর্বল, অথচ সামাজিক দাপট আছে এমন ব্যক্তিরাই। ফলে এ জাতীয় লোকের সান্নিধ্যে ভিক্ষু-শ্রামণদের ধর্মীয় গুরু-গারতা রক্ষা করা দুঃসাধ্য হয়ে দাঁড়ায়; এবং বিহার হয়ে উঠে এ সকল অধার্মিক ব্যক্তিদের মূর্থ দান্তিকতার অস্থালনক্ষেত্র। অপরদিকে লংকা, মায়ানমার, থাইল্যান্ড ইত্যাদি বৌদ্ধ প্রধান দেশে বিহার নির্মিত হয়, ভিক্ষুর প্রয়োজনে; অথচ গৃহীদের সার্বিক দানের উপর ভিত্তি করে। যেমন ধরুন, কোন একজন ভিক্ষু তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাশীল কোন একজন দায়ককে ইচ্ছা প্রকাশ করলেন যে, তিনি বর্তমানে যেই সঙ্ঘারামে অবস্থান করছেন, সেখানে থাকতে আর ইচ্ছুক নছেন। তাঁর একটি পৃথক বিহার প্রয়োজন। ভিক্ষুর এরূপ মনোভাব জ্ঞাত হয়ে সেই দায়ক তার বন্ধু-বান্ধব মহলকে উদ্বুদ্ধ করার চেষ্টা শুরু করেন। দেখা যায় এই প্রয়াসে শুধু বন্ধুমহল নছেন, যিনি এই পরিকল্পনা জানতে পারেন, তিনিই শক্তি প্রমাণে এগিয়ে আসেন আর্থিক, কায়িক ও বাচনিক দানের অকৃত্রিম পুণ্য চেতনা নিয়ে। জেনে রাখা দরকার যে, বিহার নির্মাণ বা যে কোন ধর্মীয় কাজে, এসব দেশের বৌদ্ধরা সর্বক্ষেত্রে দান শব্দটিই সবসময় ব্যবহার করে থাকেন। সাহায্য, সহযোগীতা এসকল শব্দ মোটেই মুখে আনেন না। তাদের এই যে স্বার্থশূন্য চেতনা, সেই চেতনায় গড়া বিহার নামক বিশাল বিশাল প্রতিষ্ঠানগুলো উদ্বোধনী দিনে গৃহীরা তা কোন ভিক্ষুকে ব্যক্তিগত ভাবে অথবা সঙ্ঘগতভাবে দান করে দেন। সেই যে

একবার দান করা হলো; তারপর থেকে আমরণকাল, এমনকি বংশ পরম্পরা ও কেহই কোন দিন দাবীর সুরে বলেন না যে, এই বিহার ভূমি, এই বিহার বিল্ডিং আমার বা আমাদের। অথচ, সে সব বিহারের যত্র-তত্র আপনি দেখবেন স্মৃতিফলকে ভরা। এসকল স্মৃতিফল দানে কারো আপত্তি দূরে থাক, অধিকন্তু অনেকেই উৎসাহিত হন, নিজেদের ও তেমন একটি পুণ্য স্মৃতি এই পুণ্যক্ষেত্রে স্থাপন করতে।

এসব দেশের মানুষেরা মনে হয়, বিহার ও ভিক্ষুকে নিয়ে এমন নির্মল চিত্তের কারণেই তথায় হাজার হাজার বছর ধরে ভিক্ষুরা নিরাপদ, মুক্ত মনের বিকাশ সাধনে সক্ষম হয়েছেন, ও অদ্যাবধি হচ্ছেন। ফলে তাঁদের মধ্যে প্রধান ভিক্ষুর চিন্তা, পরিকল্পনা ও আদর্শ অনুযায়ী শিষ্য সংঘ গড়ে তোলা, আদর্শ সাংঘিক পরিবেশ সৃষ্টি করার চেষ্টা, কোনদিন বাঁধার সম্মুখীন হয়নি। এ কারণেই, সে সব দেশে শীলবান, গুণবান, ধ্যানপরায়ণ, ত্রিপিটক-গবেষক ভিক্ষুদের অভাব কোন দিন হয়নি।

যখনই দেখা যায় কোন সজ্জারামের কোন ভিক্ষু শীল-বিনয় বিরোধী, ধর্ম বিরোধী আচরণ করছেন। গৃহীদের চোখে এমন আচরণ দৃষ্ট হওয়া মাত্রই, তাঁরা নিজেদের পবিত্র ধর্মীয় দায়িত্ব জ্ঞানে, এই ভিক্ষুর বিষয়ে সেই সজ্জারামের প্রধান ভিক্ষুকে বা অন্যান্য ভিক্ষুগণকে বার বার জানাবেন। এতে কোন ফলোদয় না হলে, তারা সেই ভিক্ষু শুধু নহে, এমনকি উক্ত বিহারের সাথে পর্যন্ত সম্পর্ক ত্যাগ করেন। এতে সেই উপাসককে সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়। ভিক্ষু দুঃশীল হলেও তাকে অবশ্যই চারি প্রত্যয় দান করতে হবে; যেহেতু তুমি এ বিহারের দায়ক। এমন সামাজিক বাধ্যবাধকতা ভিক্ষুর জবিনাদর্শের বিপরীত বিধায়, দায়কেরা সে সবদেশে বিহারের ক্ষেত্রে প্রয়োগ করেন না।

বৌদ্ধ প্রধান দেশ সমূহে ভিক্ষু, বিহার ও দায়কগণের মধ্যে এই পারস্পরিক স্বাধীনতা ও দায়িত্ববোধের সম্যক চর্চার আশীর্বাদেই মনে হয়, হাজার হাজার বছর ধরে এ সকল দেশ, বৌদ্ধ প্রধান দেশ; এবং বৌদ্ধ প্রধান জাতি হিসেবে তারা আজো উন্নত শিরে বিশ্ব বুকে টিকে আছে। আর আমরা এই আদর্শ বিচ্যুতির কারণেই, বুদ্ধের আবির্ভাব দেশের বাসিন্দা হয়েও, হাজার বছর ধরে বৌদ্ধ প্রধান জাতি হিসেবে রাজ্য শাসন; এবং ধর্মের প্রচার প্রসারের দায়িত্ব পালন করেও, আজ কিন্তু সব কিছু হারিয়ে কোথায় দাঁড়িয়ে আছি, হে সমাজ! একটু ভেবে দেখবেন কি?

সকলের সম্যক দৃষ্টি উৎপন্ন হোক

ভবতু সর্ব মঙ্গলম।

মেধার বিকাশ হীনতায় বড়ুয়া ভিক্ষু সমাজ

বড়ুয়া ভিক্ষু সমাজ মেধার বিকাশ হীনতায় ভুগছে। অতীতের খ্যাতিমান মহাস্থবিরদের অনেকেই নিজের উপযুক্ত কোন শিষ্য বা শিষ্যসংঘ সমাজকে দিয়ে যেতে পারলেন না। এ সকল প্রাতঃস্মরণীয় ভিক্ষুদের জীবনের অন্তিম অবস্থায় একজন ভিক্ষু শিষ্য দ্বারা সেবিত হয়ে কালান্তিম পাওয়ার সৌভাগ্যও অনেকেরই নেই।

দ্বিতীয়তঃ বড়ুয়া ভিক্ষুরা সাংঘিক চেতনা বলতে যা বুঝায় তা প্রায় ভুলতে বসেছেন। সংঘ বলতে যত আলোচনা, গবেষণা হচ্ছে তা সম্পূর্ণ সংঘদান নির্ভর এবং নিকায় নির্ভর হয়ে পড়েছে।

তৃতীয়তঃ পালি ভাষা শিক্ষা, ত্রিপিটক অধ্যয়ন, পিটকীয় গ্রন্থের অনুবাদ, বিনয় প্রতিপালন এবং ধ্যানকর্ম অনুশীলন বর্তমান ভিক্ষু সংঘে একান্ত গৌনকর্ম। মুখ্যকর্ম হয়ে পড়েছে বুদ্ধ জ্ঞান নহে অর্থকরী ডিগ্রী লাভ এবং অর্থকরী সমাজ সেবা আঞ্চলিক নেতৃত্ব এবং পালার ছোয়াইং নির্ভর দায়কের মনতোষনগিরি।

এই তিনটি মহাক্ষত বড়ুয়া ভিক্ষুদের প্রব্রজ্যিত জীবনের সমস্ত ত্যাগ-তিতিক্ষা, বুদ্ধি, মেধা ও ব্যক্তিত্বকে কিভাবে খুঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে তা পর্যায়ক্রমে উপস্থাপিত করার লক্ষ্যেই কলম ধরলাম ২৪শে ডিসেম্বর ৯৫ ইংরেজীর রাত ৩ টায়।

সংসারে দু' চোখে যা দেখি, দু কানে যা শুনি সবকিছুর উপর আপন হৃদয়ানুভূতির তাগিদে অবশ্যই কিছু লিখার ইচ্ছা জাগে প্রবলভাবে। কিন্তু অনভিপ্রেত এবং অনিচ্ছাকৃত কতগুলো কাজের দায়-দায়িত্ব আমার সমস্ত সময় ও শক্তিকে এমনভাবে গ্রাস করে নিচ্ছে যে, মাঝে মাঝে মনে হয় আমি এক এক সময় এক এক অজগরের নিঃশ্বাসের মধ্যে দারুণ অসহায় ভাবে জীবন যাপন করছি।

প্রথমতঃ দেখা যাক আমাদের অতীত যশস্বী ভিক্ষুরা কেমন ছিলেন। সেই যশস্বী প্রাতঃস্মরণীয়দের মধ্যে বলতে গেলে সকলেই ছিলেন মূল বৌদ্ধ ধর্মের বাহক পালি ভাষা সম্পর্কে অভিজ্ঞ ও পারদর্শী। ত্রিপিটক মূল গ্রন্থের অনুবাদ কম-বেশী সকলেই তাঁরা করেছেন। কেবলমাত্র ব্যতিক্রমধর্মী ছিলেন শতাব্দীকালের দু'প্রান্তে দু' জন মাত্র ব্যক্তিত্ব কর্মবীর কৃপাশরণ এবং কর্মবীর বিশুদ্ধানন্দ। এ দুই যুগ পুরুষ পালি ভাষা ও শাস্ত্রজ্ঞানে অনগ্রসর হলেও পালি ভাষা শিক্ষা ও চর্চায় উৎসাহদানের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান ও উৎসাহ যোগানোর উদাহরণ অবিস্মরণীয়। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক পালিভাষা চর্চার এবং প্রচার প্রসার ঘটানোর জন্যে উপাচার্য আশুতোষ মুখার্জী কর্তৃক যে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয় তা মূলতঃ কৃপাশরণেরই প্রেরণায়। তাঁর মহাসদিচ্ছার ফসল আচার্য

পূর্ণানন্দ স্বামী, এবং ডক্টর বেনী মাধব বড়ুয়ার অমূল্য অবদানে ভারত উপমহাদেশে পালি ভাষার প্রাণ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বলা চলে। কিন্তু সাংঘিক জীবনে এই প্রতিষ্ঠিত প্রাণকে সঞ্চারিত করার জন্যে বাঙালী তথা বড়ুয়া ভিক্ষু সংঘের উপর যে দায়িত্ব সেদিন অর্পিত হয়েছিল তা তৎকালীন সংঘ সম্যক উপলব্ধি করতে পারেন নি। না পারার ফলে শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড বা বার্মার ন্যায় শক্তি প্রমানের মধ্যে কোন পালি ও ধর্ম-বিনয় শিক্ষার পিরিবেন (ধর্ম-বিনয়-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠা ও তার ধারাবাহিকতা রক্ষার উদ্যোগ ব্যক্তি বা সমষ্টিগত কোন ভাবেই সাফল্যের মুখ দেখেনি। বংশদ্বীপ মহাথেরো কলিকাতা ধর্মাক্ষুরের চত্বরে নালন্দা বিদ্যাভবনের মাধ্যমে কাজটি শুরু করেছিলেন। কিন্তু বেঙ্গল বুডিস্ট এসোসিয়েশনের অসহযোগীতার কারণে তিনি ধর্মাক্ষুর ত্যাগে বাধ্য হলেন। পণ্ডিত ধর্মাদার মহাস্থবির পরবর্তীকালে প্রয়াসটি ধরে রাখার চেষ্টা করলেও একই কারণে তা কেবল মাত্র কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ থেকে গেল। অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্জালোক চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে ঘুরে কোথাও পিরিবেন প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে আনুকূল্যতা পেলেন না। অবশেষে রেঙ্গুন চলে গেলেন। ভেবেছিলেন বর্মী সমাজের ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্যে সেখানকার প্রবাসী বড়ুয়ারা নিশ্চয়ই মন মানসিকতায় উদার হবেন। হায় ভাগ্য! সকলই গরল ভেল। রেঙ্গুনে ধর্মদূত বৌদ্ধ বিহার প্রতিষ্ঠা করে যদি ক্ষান্ত হতেন, তবে তিনি কিছুটা সফল হতেন। চট্টল বৌদ্ধ সমিতি গঠন করতে গিয়েই তার দীর্ঘ দিনের লালিত স্বপ্ন ধুলায় লুপ্ত হয়ে গেল। বিশাল কর্ম প্রতিভার প্রজ্জালোক, অসাধারণ মেধা শক্তির প্রজ্জালোক স্ব প্রতিষ্ঠিত চট্টল বৌদ্ধ সমিতির যাতনায় অন্তিম জীবনে উন্মাদ প্রায় হয়ে গেলেন। আচার্য প্রজ্জালোকের চেতনায় উদ্দীপ্ত শিষ্য সংঘের মধ্যে কেবলমাত্র বিনয়চার্য জিনবংশ মহাথের মহামুনি মহানন্দ সংঘরাজ বিহারে স্থায়ী আচার্যের ধারাটি অক্ষুন্ন রাখার প্রয়াস চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু দায়কদের সচেতন আনুকূল্যতার অভাবে শেষমেষ পৌরহিত্য জীবন যাপনই সার হলো। বিনয় আচার্য জ্ঞানীশ্বর শ্রীলংকার শিক্ষা সমাপ্তির পর উনাইনপুরার লংকারামে বিশেষ উৎসাহে উদ্যোগটি গ্রহণ করলেন। কিন্তু, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. জিনানন্দ প্রমুখ কয়েকজন শিষ্যের বিপর্যয়ে এমন ভেঙ্গে পড়লেন যে তিনি আত্ম বিমুক্তি প্রয়াসেই বাকী জীবন কাটিয়ে দিলেন।

সপ্তম সংঘরাজ অভয়তিষ্য মহাস্থবির সাতবাড়িয়ার দেওয়ানজী পাড়ার দায়কদের নিকট থেকে খাদ্য ভোজ্যের অনুকূলতা পেলেন। কিন্তু ধর্মতঃ আনুকূল্যতার অভাব এবং স্থায়ী ভিন্ন দৃষ্টির কারণে পিরিবেন (ধর্ম-বিনয়-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) প্রতিষ্ঠার পরিবর্তে সাধারণ শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব দিলেন সমাধিক। তাঁর সুদীর্ঘ নায়কত্ব জীবনে এই দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি এমনই হলো যে, প্রকৃত বুদ্ধমত প্রতিষ্ঠার যে আদর্শ ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সংঘরাজ নিকায়ের জন্ম, কালে

তা ভিন্ন খাতে প্রবাহিত হল। অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাথের চট্টগ্রাম কলেজে শিক্ষকতা করেই জীবন কাটালেন। সাংঘিক পিরিবেন সৃষ্টির প্রতি দিকপাতও করলেন না। অতীতের এই প্রাতঃস্মরণীয় ভিক্ষুদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে ভারতীয় সংঘরাজ পণ্ডিত ধর্মাধারই একমাত্র ব্যক্তিত্ব যিনি স্থায়ী গুরু পণ্ডিত ও দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ মহাথের-এর নিকট উত্তমরূপে পালি ও সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করে শ্রীলংকা হতে উচ্চতর শাস্ত্রীয় শিক্ষা লাভ করেছিলেন। সেই ধর্মাধার পাহাড়তলী মহামুনি গ্রামে ধর্মাভিজ্ঞ শাসন হিতৈষী বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দির ন্যায় উপযুক্ত দায়কদের সান্নিধ্যে সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডলের প্রত্যক্ষ সহযোগীতায় প্রথম সাংঘিক পিরিবেন চালু করলেন। কিন্তু প্রয়োজনীয় আর্থিক সহযোগীতা, ভিত রচনায় অদূরদর্শিতা এবং তেতাল্লিশের মহাদুর্ভিক্ষের করাল গ্রাসে পড়ে সেই সাংঘিক উদ্যোগও ভেঙে গেল। আচার্য ধর্মাধারের পর ভারত বাংলায় বড় যা সমাজে পিরিবেন প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ বহুকাল ধরে গোচরীভূত হয়নি। যদিও বা আচার্য ধর্মাধারের আদর্শে অনুপ্রানিত পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল মহাথের কর্তৃক বড়ইগাঁও পালি পিরিবেন অথবা ঢাকার ধর্মরাজিক, চট্টগ্রামে পটিয়ার মুকুট নাইট, হোয়ারা পাড়া, রাউজানের কদলপুর, হাটহাজারীর জোবরায় বেশ কিছু সংখ্যক ভিক্ষু শ্রমণদেরকে আবাসিক হিসেবে লালন-পালন করা হচ্ছে। মূলতঃ এই গুলো অনাথ আশ্র সেবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অর্থকরী সাধারণ বিদ্যা লাভের চর্চাতে সীমাবদ্ধ। কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কৃপাশরণ, ঈশান চন্দ্র ঘোষ, ড. আশুতোষ মুখার্জী ও পূর্ণানন্দ স্বামী প্রমুখদের অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালী সমাজ ও বড়ুয়া সমাজে পালি ভাষা সাহিত্য চর্চার যে সূত্রপাত হয় তা ছিল মূলতঃ সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা নির্ভর। পরবর্তী সরকারী অনুদারতার কারণে তা শুধু অপুষ্টিজনিত রোগে আক্রান্ত হয়নি, সাথে সাথে কাগজ কলম সর্বস্ব পালিটোলও পালি কলেজগুলো বহু প্রতিভাবান ভিক্ষুর নৈতিক জীবনকেও ধ্বংস করে দিয়েছে। বড়ুয়া ভিক্ষুদের মেধার বিকাশ হীনতা প্রসঙ্গে পালি ভাষা ও ধর্ম বিনয় পরিস্থিতি নিয়ে আমার উপরোক্ত দীর্ঘ খতিয়ান তুলে ধরার একমাত্র উদ্দেশ্য হলো পালি ভাষা ও শাস্ত্র চর্চায় বর্তমান ভিক্ষুদের অনীহার ঐতিহাসিক কারণ অনুসন্ধান করা। মেধাবী পাঠক আমার উপরোক্ত প্রয়াস হতে নিশ্চয় অনুধাবন করবেন, কেন বড়ুয়া সমাজের তরুণ ভিক্ষুরা আজ ধর্ম-বিনয়-শিক্ষা ও আচরণে এত উদাসীন। পালি ভাষা ও শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত ভিক্ষু বর্তমান তরুণ প্রজন্মের মধ্যে নেই বললেই চলে। শাস্ত্রজ্ঞ ও বিনয়ী না হলে শাসনের অস্তিত্ব যে বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা সমধিক তার প্রমাণ বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজে এখন বিরল নয়। শ্রীলংকা, থাইল্যান্ড ও বার্মার মতো শত, শত, নহে; কেবল একটি, দুইটি মাত্র পিরিবেণ (ধর্ম বিনয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান) ও যদি বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে থাকতো তা হলে আজ বড়ুয়া ভিক্ষুদের প্রব্রজ্যা জীবনে এতবড়ো বিপর্যয় সৃষ্টি হতো না।

পিরিবেন জাতীয় সংঘরাম থাকলে সেখানে ধর্ম বিনয় শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ভিক্ষু শিক্ষক থাকতেন। অভিজ্ঞ ও আদর্শ শিক্ষকদের সান্নিধ্যে ধর্ম বিনয় নিয়ে অভিজ্ঞ ও শীলাচরণে নিষ্ঠাবান ছাত্র সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ থাকতো। একই গুরু এবং একই পরিবেশে শিক্ষা গ্রহণের ফলে আদর্শ সাংঘিক মনোবৃত্তির ভিক্ষু প্রজন্ম গড়ে উঠতো। শিক্ষা সমাপ্তির পর যে যেখানে দায়িত্ব পালন করুন না কেন, তাদের মধ্যে চিরদিন একই শিক্ষা গুরু বা নায়কের প্রতি আনুগত্য ভাব অক্ষুণ্ণ থাকতো। আর সতীর্থদের মধ্যে থাকতো গভীর মৈত্রী বন্ধন। আমার এসব ধারণা কাল্পনিক নহে। তার বাস্তব প্রমাণ পেয়েছি-পণ্ডিত ধর্মাধার ভন্তের নিকট মহামুনি পালিটোলে শিক্ষাপ্রাপ্ত আলিঙ্ঘরের পূর্ণানন্দ, বেপারী পাড়ার ধর্মরক্ষিত, ঘাটচেকের সুগতবংশ, চট্টগ্রাম বিহারের শীলাচার শাস্ত্রী, মির্জাপুরের শান্তপদ, বিশ্বশান্তি প্যাগোডার পণ্ডিত জ্যোতিঃপাল প্রভৃতি মহাথেরগণের মধ্যে। তাঁরা অনেক ক্ষেত্রে পরস্পর ভিন্নমত পোষণ করলেও গুরুভাই হিসেবে যে গভীর মৈত্রীবন্ধন দেখেছি, গুরুর প্রতি যে শ্রদ্ধা ও আনুগত্য দেখেছি, তা অনন্য। একইভাবে উল্লেখ করা যায় আচার্য প্রজ্জালোক ও তাঁর শিষ্য সংঘের কথা।

বড়ুয়া বৌদ্ধ সমাজে ভিক্ষু সংঘ বলতে এখন বুঝায় চার জনের অধিক ভিক্ষু কোন সংঘদান উপলক্ষে একস্থানে সমবেত হওয়া। আর সংঘের প্রয়োজন বলতে বুঝায় গৃহীদের আয়োজিত দানানুষ্ঠানের সেই চারজনদের অধিক ভিক্ষু লাভ করতে পারা। উক্ত ভিক্ষুরা যেন হিন্দু ব্রাহ্মণ ও খৃস্টান পাদ্রীদের মতো এমন একটি মাধ্যম যাদের খাওয়ালে দাতার প্রয়াত মাতা-পিতারা খাবার পাবেন। যাদের দান দিলে পরলোকগতরা স্বর্গারোহণ করতে সক্ষম হবেন। গৃহী সাধারণের পক্ষ হতে সাংঘিক চেতনার এই সীমাবদ্ধতার কারণে বড়ুয়া ভিক্ষুরাও এই বিশ্বাসটি বদ্ধমূল করে নিয়েছেন যে, ভুল হউক শুদ্ধ হউক কয়েকটি সূত্র পাঠ করতে পারা, অষ্টশীল দেওয়া এবং পুণ্য উৎসর্গ পদ্ধতিটি আয়ত্ত্ব করে নিতে পারলেই যথেষ্ট। এই মূলধনে পালার ছোয়াইং ও জুটবে, পুরোহিতগিরিও চলবে, উপরন্তু সংঘদানাদির মাধ্যমে বাড়তিলাভ সংকারও হবে। বুদ্ধিমান ভিক্ষুরা জানেন যে ক্ষমতাবান ও প্রতিবাদী দায়কদের বশীভূত রাখতে পারলে একই বিহারে দিব্যি আরামে আজীবন কাটিয়ে দেয়াও যাবে। আর কি চাই!

মেধার বিকাশহীনতা এভাবে বড়ুয়া ভিক্ষুদের আজ এমনভাবে আড়ষ্ট করে ফেলেছে। আচার্য গুরুজনদের নেই কোন শাসন দরদী হৃদয়। কনিষ্ঠদের প্রতি নেই কোন বৈরাগ্য বা ত্যাগ চেতনা বর্ধনকারী উপদেশ। ত্রিপিটক শাস্ত্রজ্ঞান অর্জনে উৎসাহিত করা হচ্ছেনা কোন তরুণ ভিক্ষুকে। তেমন কোন প্রক্রিয়াও বিদ্যমান নেই যে, কোন তরুণ ভিক্ষু আত্মোপলব্ধি করতে পারবে-কোন মহৎ উদ্দেশ্যে আমি ভিক্ষুত্ব বরণ করলাম। বড়ুয়া সমাজের কল্যাণে আমার প্রকৃত করণীয় কি! এ সমাজ পরিমণ্ডলের বাইরে গিয়ে বুদ্ধবাণীর প্রচার প্রতিষ্ঠায় আমি

কিছু করতে পারি কিনা বা এই মহৎ দায়িত্ব গ্রহণে নিজেকে উপযুক্ত করবো কিভাবে। কিছুই নেই। কোন ভিক্ষু জীবনের কোন ভিত্তিই খুঁজে পাওয়া যাচ্ছেনা বড়ুয়া সমাজে। আশ্চর্য, প্রতিটা ভিক্ষু উপসম্পদা গ্রহণের সাথে সাথেই পুরোহিতের বেড়া জালে এত ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়েছে যে, চারদিকে দ্রুতধাবমান পৃথিবীর প্রতি একটু সচেতন দৃষ্টিতে তাকানো দূরের কথা, এমনকি নিজের দিকেও তাকাতে পারছেন না। তিথি, শ্রাদ্ধ, নানা অনুষ্ঠান আনুষ্ঠানিকতায় ভরা ইদানিং কালের বড়ুয়া সমাজে ভিক্ষুরা বলতে গেলে মেল খাওয়া মাছ সদৃশঃ। স্রোতের অনুকূলে গা ভাসিয়ে চলার এই পরিনতি কি? ভিক্ষুরা নিজেরা ধর্মজ্ঞানে দুর্বল হলে গৃহীরা সবল হবে কি করে? তাই বড়ুয়া গৃহীরা এখন জাপানী বৌদ্ধ সমাজের ন্যায় আচরণ শুরু করেছে। তারা বড়ুয়া ভিক্ষুদের প্রয়োজন বোধ করেছে কেবলমাত্র তিথি শ্রাদ্ধের জন্যে। আর নিজেদের পুঞ্জিভূত প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি, বিশ্বাস, অর্থ-বিশ্ব অকুণ্ঠচিত্তে উজার করে দিচ্ছে ভিন্ন দেবতার পদমূলে। এই উজার করে দেয়াতে সম্যক দৃষ্টি না মিথ্যাদৃষ্টি, সেই বিচারের ক্ষমতা যে তাদের নেই, তার জন্যে দায়ী কিন্তু মেধাহীন বড়ুয়া ভিক্ষুরা। বড়ুয়া ভিক্ষুদের এই অযোগ্যতায় মনে হচ্ছে আমরা আবার ১৮৬৪ সালে ফেলে আসা সেই তান্ত্রিক রাউলী পুরোহিতদের রাজত্বই ফিরে যাচ্ছি।

ভবতু সব মঙ্গলম্!

জ্ঞাতীর ছায়া সুশীতল

বড়ুয়া, চাকমা ও মারমা মানসিকতা

‘জ্ঞাতীর ছায়া সুশীতল’ এই প্রবাদ বাক্যটি স্বয়ং মহামানব বুদ্ধ মুখেই উচ্চারিত। বিশ্বের বৌদ্ধ সমাজে এক কালে এই বাক্যটি এত জনপ্রিয় ছিল যে, বুদ্ধ বাণী যেখানে যেখানে প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সেখানে বাক্যটি প্রবাদে পরিণত প্রবাদে পরিণত হয়ে মানুষের মর্মমূলে স্থান করে নিয়েছে। তবে, প্রবাদ না হলেও প্রাণী-প্রবৃত্তির স্বাভাবিক তাগিদে প্রত্যেকটি প্রাণী-প্রজাতি অত্যন্ত স্বাভাবিক নিয়মেই আপন শ্রেণী-গোত্রকে অবশ্যই নিজের নিরাপদ আশ্রয় বিবেচনা করে থাকে। যেমন, মাছি-মাছির বংশকে, মশক মশকের বংশকে, ময়না ময়নার বংশকে, ইংরেজ ইংরেজের বংশকে, মুসলিম মুসলিম বংশকে, আপন নিরাপদ আশ্রয় ভাবতে পারে অতি সহজেই। মনোচেতনার এই ভাবনাই তাদের উদ্ধুদ্ধ করে দল বদ্ধ হয়ে চলাফেরা করতে এবং এক স্থানে বসবাস করতে।

ভগবান বুদ্ধের প্রতিষ্ঠিত ধর্মরাজ্য তখন বেশ সমৃদ্ধ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত। সংঘ নামে বিশাল শিষ্য সংঘে তখন স্থান করে নিয়েছেন জাতি-বর্ণ নির্বিশেষে লক্ষ লক্ষ নর-নারী ভিক্ষু সংঘ, ভিক্ষুণী সংঘ, উপাসক সংঘ ও উপাসিকা সংঘ এই চারি সাংঘিক নিয়ম-শৃঙ্খলা ও আচার-প্রতিপদার আওতাধীনে। বুদ্ধ-কালীন সদ্ধর্মের এই মধ্যাহ্নে খ্রিস্টপূর্ব ৫ শতকের মগধে অবস্থিত সকল রাজ্যে ও জনপদে দেখা দিয়েছিল প্রজ্ঞা, শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধির এক অপূর্ব সমাবেশ। রাজায় রাজায় না ছিল কোন ঈর্ষা দ্বন্ধের উন্মাদনা; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রের মধ্যে না ছিল বর্ণ বিভেদের বাড়াবাড়ি। মহান বুদ্ধ ও তাঁর অনুরাগীদের প্রজ্ঞা বিমণ্ডিত অপ্রমেয় মৈত্রীর শান্ত-স্নিগ্ধ প্রভাবে বুদ্ধ মতাদর্শের অনুরাগী নহেন এমন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষ গুলো পর্যন্ত একাকার হয়ে উঠেছিলেন তাদের দৈনন্দিন জীবনচাারে শান্তি ও মৈত্রীময় মনন আচরণে। বুদ্ধকালীন সমাজ ও রাষ্ট্রীয় সুষম পরিবেশটির প্রতি গভীর ভাবে লক্ষ্য করলে দেখা যাবে- বুদ্ধের শিক্ষাদর্শ তখন এত প্রভাবশালী হয়েও তাঁর ধর্মাদর্শ ভিত্তিক বৌদ্ধ জাতি মানসিকতার নামধারী কোন একটি সম্প্রদায় বিশেষের জন্ম হয়নি। দেখা যায়, রাজা বুদ্ধ অনুরাগী হলেও তাঁর পাত্র-মিত্র মন্ত্রী বর্ণ এমনকি খোদ রাণী-মহারাণীটি পর্যন্ত বুদ্ধমত, বুদ্ধ শিক্ষার অনুসারী ছিলেন না। যেমন রাজা বিম্বিসার বুদ্ধ ভক্ত হলেও তার প্রধান রাণী বিদেহীকে বুদ্ধ-ভক্ত রূপে দেখা যায় না, এমনকি অপূর্ব রূপসী রাণী ক্ষেমা দেবী ও প্রথমে বুদ্ধ বিরোধি ছিলেন। একই ভাবে গৃহপতি অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠী বুদ্ধ তদ্রূপ হলেও তাঁর পরিবারের অনেক সদস্যকে বুদ্ধের প্রতি আকৃষ্ট দেখা যায় না। সাধারণ জনগণের মধ্যেও এর ব্যতিক্রম ছিল না। আপন রুচি-অভিরুচির এমন উদার ব্যক্তি স্বাধীন পরিবেশেই পরম সহিষ্ণুতা নামক শান্তি ও সমৃদ্ধির পূর্ব শর্তটির জন্ম হয়ে থাকে। আর এই উদার নৈতিক পরিবেশে স্যার ডাডউইম এর আগুবাক্য 'Survivable the Fittest' টির তাৎপর্য যথার্থ প্রতিভাত হয়। সে কারণেই আপন যোগ্যতা বলে মহান বুদ্ধের শিক্ষা ও মতাদর্শের শ্রেয়তা ও উৎকৃষ্টতা তখন প্রচলিত অন্যান্য ধর্মীয় মতাদর্শের মাঝে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ট জনতার মনোমন্দিরে স্থান করে নিতে বাহুবল, অস্ত্রবল, রাজবল এমনটি সামান্যতম কুটকৌশলের আশ্রয় পর্যন্ত নিতে হয়নি। আজ আড়াই হাজার বছর ধরে বুদ্ধ মতবাদের এই মহনীয়তা তাই ধর্মযুদ্ধ নামক জেহাদ বা ক্রুসেড জাতীয় কোন অভিশাপ মানব সভ্যতাকে উপহার দেয়নি। ইতিহাসের এই শিক্ষার আলোকেই আপন কৃষ্টি-সংস্কৃতি ও অস্তিত্বের সুরক্ষায় বাংলা-ভারতের নিরঙ্কুশ সংখ্যা লঘু বৌদ্ধ জন-গোষ্ঠীকে আপন মনন ও আচরণকে গঠন করার আয়াসসাধ্য শপথ গ্রহণ করতে হবে। বুদ্ধ শিক্ষার প্রজ্ঞা, মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা নামক পাঁচটি উৎকৃষ্ট মানবীয় গুণ অর্জনের মধ্য। অন্যথায় প্রবল সাম্প্রদায়িক প্রতিকূল স্রোতে খড়-খুঁটোর ন্যায় ভেসে যেতে হবে, অথবা ফেনপিণ্ডের ন্যায় বিলীন হয়ে যেতে হবে।

বুদ্ধকালীন প্রজ্ঞা, শান্তি ও মৈত্রীর এই দুর্লভ পরিবেশটিতে ক্রমে কালো মেঘ জমতে দেখা যায় বুদ্ধ জীবনের অন্তিম পর্বে। বুদ্ধ রাজা প্রসেনজিত কৌশল এবং বুদ্ধ তদ্রূপ রাজা বিম্বিসার উভয়েই সিংহাসন চ্যুত হলেন আপন ঔরষজাত সন্তানের দ্বারা।

মগধরাজ বিম্বিসার আমরণ কারারুদ্ধ হলেন পুত্র অজাতশত্রুর দ্বারা। কুশলরাজ প্রসেনজিত পুত্র বিড়ুঢ়ব দ্বারা রাজ্য ত্যাগে বাধ্য হয়ে অকাল মৃত্যুর শিকার হলেন। বিম্বিসার পুত্র রাজা অজাতশত্রু আক্রমণ করে ধ্বংস করলেন বৈশালীর বৃজি জাতিকে, আর প্রসেনজিত কোশলপুত্র রাজা বিড়ুঢ়ব আক্রমণ করে ধ্বংস করলেন কপিলাবস্তুর শাক্য জাতিকে। এই দুই ঘটনা বুদ্ধের অন্তিম নিঃশ্বাসের মাত্র কয়েক মাস ব্যবধানে সংঘটিত হয়। সঠিক অবস্থা বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বুদ্ধের অনুগত ভিক্ষু ও গৃহী সংঘে হীন স্বার্থের মোহ যেই মাত্র বুদ্ধের নীতি আদর্শ ও শিক্ষা উপদেশ হতে তাদেরকে বিচ্যুত করেছে তখনই বৌদ্ধ সমাজ গগণে দুর্ভাগ্যের কালো মেঘ জাত ঝঞ্ঝা প্রলয় শুরু হয়ে গেছে। অপরদিকে দুঃখের সংবেগে আত্মসম্বিং যখন পুনঃ জাগ্রত হয়েছে, তখনই প্রজ্ঞাময় মৈত্রী-প্রেমের প্রবল প্রবাহে সেই অশুভ কালো মেঘ অন্তর্হিত হয়েছে, ঝঞ্ঝাবাত থেমে গেছে; শান্তি, সম্প্রীতি ও সমৃদ্ধি পুনঃ প্রতিষ্ঠা পেয়েছে। বুদ্ধ শাসনের আড়াই হাজার বছরের ইতিহাসে এই চিরন্তন সত্যটিই বার বার স্বপ্রমাণিত হয়েছে।

‘জ্ঞাতীর ছায়া সুশীতল’ এ বাক্যটি বুদ্ধ মুখে উচ্চারিত হয়েছিল কোশলরাজ বিড়ুঢ়ব শাক্য জাতিকে আক্রমণের মুখে। মহাকাব্যিক বুদ্ধ সেদিন শাক্যরাজ্যের সীমান্তে রাজা বিড়ুঢ়বের আক্রমণ পথে খাঁ খাঁ রোদে একাকী এমন এক বৃক্ষতলে বসে রইলেন যার না ছিল সবুজ পত্র পল্লব না ছিল কোন ঢাল-পালা। এমন ছায়াশূণ্য বৃক্ষটির অদূরেই ছিল ঘন পত্র পল্লব সমাচ্ছন্ন বিশাল মহীরুহ। কিন্তু তা ছিল শাক্যদের নহে, কোশলদের অধীনে। কোশলরা লৌকিয় ভাবে অজ্ঞাতী বলেই শাক্যদের সংহার করতে উদ্যত হচ্ছে। শাক্যরা লৌকিক সম্পর্কে তথাগতের জ্ঞাতী বলে বুদ্ধ তথাগত শাক্যদের প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শনের প্রতীক হিসেবে এই বৃক্ষতলে একাকী আশ্রয় নিয়েছেন। তিনি অজ্ঞাতীর প্রচুর ছায়া সম্পন্ন বৃক্ষকে ত্যাগ করে জ্ঞাতীকুলের ছায়াশূণ্য বৃক্ষতলকেও সুশীতল বলার মধ্য দিয়ে দেহধারীর জীবনে একান্ত আপনত্বের ভাব দ্বারা প্রভাবিত নিরাপত্তা বোধের প্রতি বিড়ুঢ়বের দৃষ্টি আকর্ষণের সাথে সাথে এটুকুও বোঝাতে চেয়েছেন আজ তথাগতের অজ্ঞাতী প্রভূত পাশবিক শক্তির অধিকারী রাজা বিড়ুঢ়ব এর মহা পরাক্রমের মুখে বুদ্ধের অহিংসা মন্ত্রে দীক্ষিত নিরস্ত্র শাক্যরা ঠিক ছায়া শূন্য বৃক্ষের মতোই একান্ত দুর্বল- একান্ত অসহায়।

ব্যবহারিক তথা জাগতিক জীবনে এই যে জ্ঞাতী, অজ্ঞাতীর প্রশ্ন, তা তো একান্তই স্থূল বিষয়। সাধারণ মানুষ যারা শুধু জাগতিক বিষয়-আশয় নিয়ে মত্ত, ব্যস্ত; তারাই এভাবে জ্ঞাতী-অজ্ঞাতীর ভেদ রেখা টানতে পারেন; কিন্তু বুদ্ধ তথাগতের মতো ব্যক্তিত্ব যার হৃদয় রাজ্য উদার উন্মুক্ত আকাশের মতো পরিব্যপ্ত, তিনি কি করে এমন সংকীর্ণতার পরিচয় দিতে পারেন? বুদ্ধ তথাগত আবিষ্কৃত লোকোত্তর পারমার্থিক সত্যের রাজ্যে তো সত্ত্ব, জীব, আত্মা বলতে কোন ব্যক্তি বা প্রাণীর অস্তিত্ব পর্যন্ত নেই। আর সেই পরম সত্যে ভাবিত বুদ্ধ চিন্তে কি করে জাগতিক জ্ঞাতী-অজ্ঞাতীর বিভেদ টানার মতো তুচ্ছ বিষয়ের অবতারণা হতে পারে? তা হলে কোনটি প্রকৃত সত্য লৌকিক না লোকোত্তর? এমন একটি দ্বন্দ্বিক প্রশ্ন স্বভাবতই উঠতে পারে আমাদের মনে।

বাস্তবিকই, লৌকিক এবং লোকোত্তর সত্যের এই দ্বন্দ্বিক অবস্থানটা খুবই জটিল। কারণ দেহধারী মায়েই জন্মগত ভাবে স্বাভাবিক জীবন যাত্রায় লৌকিক সত্যের অধীনে সম্পূর্ণ ভাবে নিয়ন্ত্রিত। এই আমি, এটি আমার দেহ, আমার প্রাণ এই দেহের মধ্যে অবস্থিত, আমার এই দেহ, এই মনকে নিয়েই আমার সমগ্র জীবনের অস্তিত্ব; তাই দেহ মনকে সার্বিক সুরক্ষা ও সুখ-শান্তি বিধান করতে পারাটাই হলো আমার সমগ্র প্রচেষ্টার প্রধান কর্তব্য। প্রিয় পাঠক, এভাবেই এবং এই পরম ও চরম বিশ্বাসের উপর একান্ত নির্ভরশীল হয়েই তো চলছে এ বিশ্ব সংসারের সমগ্র প্রাণীজগত। এমন একটি গভীর বিশ্বাসের একান্ত বিপরীতে দাঁড় করালেন বুদ্ধ তথাগত তাঁর আবিষ্কৃত ‘লোকোত্তর সত্য’ নামক মতাদর্শকে। লোকোত্তর সত্য-দর্শনে জাগতিক উপরোক্ত আমি ও আমার সংশ্লিষ্ট যাবতীয় দাবীকে শুধু অস্বীকার করা হয়েছে এক অকাট্য বাস্তব যুক্তি ও নিখুঁত বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে; মহাপ্রাজ্ঞ তথাগত বুদ্ধের অসাধারণ মেধার সুগভীর উপলব্ধি দিয়ে। জাগতিক জীবনে অতৃপ্ত সুখাকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি হতাশা, নিরাশা ও আশাভঙ্গের যে বিশাল আগ্রাসন মানব জীবনকে বার বার যেভাবে পর্যুদস্ত করে দিচ্ছে; তার আর্তি, কাতর ক্রন্দনের জ্বালাটি চিরতরে বিনাশের উপায় উদ্ভাবন করতে গিয়েই মহাপ্রাজ্ঞ বুদ্ধ তথাগত কর্তৃক এই পরম লোকোত্তর সত্যটির আবিষ্কার। এ প্রসঙ্গটি বিস্তারিত তুলে ধরা আমার বর্তমান নিবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। তাই নিবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি হতে বিরত হলাম। আমার বর্তমান নিবন্ধ ‘জ্ঞাতী-অজ্ঞাতী’ প্রশ্নে বুদ্ধ জীবনের ঘটনাবলীর আলোকে এই মাটিতে অবস্থিত বড়ুয়া, চাকমা ও মারমা নামক তিনটি সুপ্রাচীন জনগোষ্ঠীর অতীত ও বর্তমান মানসিক দিকটি খতিয়ে দেখার চেষ্টা করা। মহান ত্রিপিটকের ‘বিনয় পিটকের’ অন্তর্গত ‘মহাবর্গ’ নামক গ্রন্থের উপসম্পদা ও প্রব্রজ্যার যোগ্যতা যাচাই পর্বে বুদ্ধ তথাগত কর্তৃক ভিক্ষু সংঘকে এরূপ একটি প্রজ্ঞাপ্তি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

“ভিক্ষুগণ যদি শাক্যজাতীয় কোন ‘পূর্ব তীর্থিক’ বুদ্ধের সংঘ ভুক্ত হতে প্রার্থনা করে; তাহলে আসা মাত্রই তাকে উপসম্পদা প্রদান করবে। তাকে ‘পরিবাস’ দেবে না।

বুদ্ধের এই নির্দেশে ‘শাক্যজাতীয়’ ‘পূর্বতীর্থিক’ ও ‘পরিবাস’ নামে তিনটি বিষয় আছে। পূর্বতীর্থিক হলো পূর্বে যারা বুদ্ধ মতাদর্শের অনুগত হয়ে বুদ্ধের সংঘ ভুক্ত হতে চাইবে তাকে ‘পরিবাস ব্রত’ নামক এক কঠিন পরীক্ষা নিরীক্ষার সম্মুখীন করার বিধান। কিন্তু বুদ্ধ তথাগত আপন জ্ঞাতীকুল হতে আগত পূর্বে ভিন্নমত পোষণকারী এমন ব্যক্তিকে সেই কঠিন পরীক্ষা হতে অব্যাহতি দানের বিধান প্রজ্ঞাপিত করলেন। ‘স্বজন প্রীতি’ মূলক এই নির্দেশকে বুদ্ধ বললেন ‘জ্ঞাতি পরিযায়’ অর্থাৎ কুলগত পরিহার তথা কুলগত পরিত্যাগ সুযোগ নির্দেশটিতে বুদ্ধ চিন্তকে বিচার বিশ্লেষণ করলেও জাগতিক সত্যটিই স্বপ্রমাণিত হয়। লোকোত্তর সত্যের উদ্যোক্তা বিভাজ্যবাদী বুদ্ধ লৌকিক তথা জাগতিক সত্যকেও স্বীকার করলেন, মেনে নিলেন। ইহাই বুদ্ধ তথাগতের শিক্ষা ও মতাদর্শের মূল চরিত্র। কোন বিষয়েই একান্তবাদীতা নহে, স্থান-কাল-পাত্রকে প্রজ্ঞাময় দূরদর্শীতার সাথে বিচার বিশ্লেষণ করে সঠিক ও যথাযোগ্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জীবনযাত্রাকে নিরাপদ, শান্তিপূর্ণ, সুখী ও সমৃদ্ধিশালী করে তোলায় তৎপর হওয়া। এই প্রচেষ্টা ও সাধনার অপর নাম ‘মজ্জিম পটিপদা’ বা মধ্যম পন্থা নীতি। এই মধ্যম পন্থা নীতির, লৌকিকটিকে গুরুত্ব দিতে গিয়ে বুদ্ধ রক্ত সম্পর্কের জ্ঞাতী কুল স্বীকার করলেন এবং তাদের প্রতি জাগতিক দায়িত্ব কর্তব্য পালনকে লোকোত্তর জীবনে বিচরণকারীর জন্যে ও অপরিহার্য কর্তব্য বলে শিক্ষা দিয়ে গেলেন। বিষয়টির স্বরূপ এভাবেই পরিষ্কার হয়- জনগণ কথায় কথায় বুদ্ধ তথাগতকে ‘শাক্য পুত্রীয় শ্রমণ গৌতম’ বলে উল্লেখ করতেন। এটা স্বাভাবিক যে জাগতিক জীবনে জন্মগত এই পরিচয় কিছুতেই তাই অস্বীকার করা যায় না। এই পরিচয়ের সূত্র ধরেই শাক্যকুলের সুনাম-দূর্নাম, সুখ-দুঃখ উন্নতি অবনতি খুব সহজেই বুদ্ধের মতো ব্যক্তিত্বের ভাবমূর্তিকে ও জনসমাজ দ্বারা স্পষ্ট করানো অত্যন্ত স্বাভাবিক। লাভ-অলাভ, যশ-অযশ, নিন্দা-প্রশংসা, সুখ-দুঃখ, এই অষ্টবিধ লোক ধর্ম লোকোত্তর সত্য অধিগত নির্বাণ সুখে নিমজ্জিত অরহত চিন্তকে বিক্ষুব্ধ চঞ্চল করে তুলতে না পারলেও ব্যবহারিক জগতে তা প্রচুর অন্ত রায় সৃষ্টি করতে পারে, ক্ষতি সাধন করতে পারে। প্রাজ্ঞ দূরদর্শী বুদ্ধ তথাগত জাগতিক জীবনের এই অপ্রিয় সত্যটি সম্পর্কে সদা জাগ্রত ছিলেন বলেই তিনি তার ধর্মরাজ্যের মূল ভিত্তি রচনায় পরের মন্তব্য, হিতৈষীদের পরামর্শ, জনগণের অভিমতকে সব সময় গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করে প্রত্যেকটি বিনয় বিধান প্রজ্ঞাপিত করেছেন। এমনকি বিনয় পিটকের মহাবর্গে ভৈষজ্য-স্বল্পে এমন নির্দেশও ভিক্ষু সংঘকে দিয়েছেন-ভবিষ্যতে যদি দেখা যায় এমন কোন নির্দেশ

বুদ্ধ দিয়েছেন যা কার্যকরী বা কল্যাণজনক বলে প্রতীয়মান হচ্ছে না- তা রদ করা যাবে। অন্যপক্ষে বুদ্ধের বিনয় বিধানে এমন কিছু নির্দেশ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না, যা চলমান যুগ-জীবনে পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষাপটে কল্যাণজনক এবং অতিশয় জরুরী প্রতীয়মান হচ্ছে তা স্বাচ্ছন্দে বিনয় বিধান তথা গঠনতন্ত্রে 'নতুন বিধিমালার' আওতাভুক্ত করা যাবে। তবে এই বিয়োজন সংযোজনে কখনো একক ও অংশগত সিদ্ধান্তকে প্রশ্ন দিতে সম্পূর্ণ নিষেধ করা হয়েছে, এমনকি নিরঙ্কুশ সংখ্যা-গরিষ্ঠতাকে ও নহে। বিনয় মহাবর্গে দৃষ্ট এমন একান্ত বাদী অভিব্যক্তিও বুদ্ধের বিভাজ্যবাদী শিক্ষায় একান্ত স্থান-কাল-পাত্র বিবেচনার দাবীদার। তাই দেখা যায় একই গ্রন্থে 'বর্ষাব্রত স্কন্ধে বলা হয়েছে' -

“ভিক্ষুগণ! আমি অনুজ্ঞা করছি, যে দিকে গ্রামবাসীর সংখ্যা অধিক সেদিকে গমন করবে। তাতে বর্ষাবাস ভঙ্গের অপরাধ হবে না।”

এই অনুজ্ঞার প্রেক্ষিতে যখন প্রশ্ন দেখা দিল সংখ্যা গরিষ্ঠ গ্রামবাসীরা শ্রদ্ধায় দুর্বল এবং ভিক্ষু সংঘের প্রতি আসন্ন। এই অবস্থার প্রেক্ষিতে বুদ্ধের নির্দেশ হলো -

“মহান বুদ্ধের এই বিভাজ্যবাদী বাস্তব সচেতন শিক্ষার আশ্রয়ী এদেশের বৌদ্ধ সমাজটি আজ কোন্ পথে? কেমন তাদের মন মানসিকতা? কেমন তাদের আচার আচরণ? এসব প্রশ্ন গুলোর উত্তর সন্ধানে গেলে দেখা যাবে চাকমা, মারমা, বড়ুয়া নামক এই তিন জনগোষ্ঠী মিলে বাংলার মাটিতে তারা যেই বৌদ্ধ-সমাজ পরিবেশ সৃষ্টি করেছে তা আদৌ বৌদ্ধ সমাজ কিনা সন্দেহ। কারণ জনগত ভাবে বৌদ্ধত্বের দাবীদার এই তিন জনগোষ্ঠী বুদ্ধের শিক্ষা ও মতাদর্শের সাথে পরিচয় সম্পর্ক মোটেই গড়ে তোলেনি এবং গড়ে তোলার মন মানসিকতা ও তেমন সবল স্বতঃস্ফূর্ত বলে ধারণা করা কঠিন। হাজার বছর ধরে ভারত উপমহাদেশের বিশাল বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর লালিত পালিত শুভ্র নির্মল বুদ্ধের শিক্ষা ও মতাদর্শ খৃস্টীয় সপ্তম শতাব্দী হতে সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পর্যায়ের বিশাল বৌদ্ধ ভারত সম্পূর্ণ বৌদ্ধশূন্য অবৌদ্ধ ভারতে পরিণত হয়ে গেল। কোন্ ভাগ্যে আরকানী বৌদ্ধ সম্রাজ্যে আশ্রয় নেয়া সেই বৌদ্ধ ভারতের মুষ্টিমেয় বুদ্ধ অনুরাগী, বর্তমানের বড়ুয়া, চাকমা, মারমাগণ আরকান সম্রাজ্যের পতনের পর মুসলিম অধিকার ভুক্ত হয়ে চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের মাটিতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বুদ্ধের শিক্ষা ও মতাদর্শ তথা ধর্মের নামে যা ধারণ করে রেখেছিল তাকে মনগড়া কিছু বিষয় ছাড়া বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা ও মতাদর্শ বলতে কিছুই ছিল না। গ্যাংগুলি মঘা খম্মোজা, গোজেন লামা, আগর তারা, দুবাই ইত্যাদি পুঁথিও রাউলী বা লুরি পুরোহিতদের যাবতীয় শিক্ষা ও আচার পদ্ধতির ও ইতিহাসের সাথে বুদ্ধের শিক্ষা ও ধর্মাদর্শ ও বৌদ্ধ ইতিহাসের কোন সম্পর্ক নেই। আপন ধর্মের এই দুর্গতির সাথে 'মরার উপর খরার ঘা' স্বরূপ এদেশের বৌদ্ধ ধর্ম

সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনে আত্মাসন হয়ে চেপে বসেছিল ব্রাহ্মণ আধিপত্যবাদ। তারই রামায়ণ, মহাভারতই হয়ে উঠেছিল বাংলা ভাষাভাষী বড়ুয়া, চাকমাদের ধর্মগ্রন্থ এবং মা লক্ষ্মী পূজা, স্বরস্বতি পূজা, শনি পূজা, কালী পূজা- এগুলো হয়ে উঠেছিল মারমা, চাকমা, বড়ুয়াদের ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক পরিচয়।

বৃটিশ শাসনের ব্যাপকতা ধর্মনিপেক্ষতার আশীর্বাদে এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান পিপাসু জনগোষ্ঠীর ব্যাপক অনুসন্ধান ও পল্লতত্ত্ব আবিষ্কার গবেষণার সুবাদে ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী জাতীয় জাগরণের পাশাপাশি এদেশের ক্ষীণকায় বৌদ্ধ সমাজ জীবনের কিছুটা আত্মজাগরণের এই ঢেউ দুদিক থেকে উপস্থিত হয় চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ও বৌদ্ধ সমাজ বক্ষে; একদিকে কলিকাতা হয়ে শ্রীলংকা-থাইল্যান্ড হতে, অপরদিকে বার্মা হতে আকিয়াব হয়ে। অবস্থানগত সুবিধে তথা উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার কারণে চট্টগ্রাম অঞ্চলের সমতল এলাকায় বসবাসকারী বড়ুয়া সমাজে সর্বপ্রথম এই জাগরণটি শুরু হয় ১৮৪৯ হতে ১৮৬৪ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। এ সময়ে পটিয়ার উনাইনপুরা গ্রাম জাত সন্তান চন্দ্রমোহন পরবর্তী কালে যিনি বার্মা, শ্রীলংকায় দীক্ষা ও শিক্ষা গ্রহণ করে আচারিয়া ভদন্ত পূর্ণাচার নামে চিরস্মরণীয় হলেন তিনি এবং পরম বুদ্ধ শাসন আরকান সংঘরাজ ভদন্ত সারমেধ এই দুইজনের উদ্যোগে মহামুণির পাহাড়তলী গ্রামে বুদ্ধের প্রকৃত শিক্ষা ও মতাদর্শের পুনঃ প্রবর্তনে শুভ উদ্বোধন হলো। পরবর্তী সময়ে রাঙ্গুণীয়ার রাজানগরস্থ চাকমা রাণী কালিন্দী দেবী যিনি হিন্দু ধর্মের শক্ত মতবাদের বিশ্বাসী ছিলেন তার সেই বিশ্বাস অপনোদন করে বুদ্ধের মূল শিক্ষা ও আদর্শে উদ্বুদ্ধ করার পর রাজানগরে ভিক্ষু উপসম্পদা অনুষ্ঠানের জন্যে প্রথম ‘স্থল সীমা’ প্রতিষ্ঠা করা হয়। আরকান সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবিরের নায়কত্বে এই সীমা প্রতিষ্ঠা ও উপসম্পদা অনুষ্ঠান সম্পাদিত হয়েছিল। উল্লেখ্য যে ইতিপূর্বে মহামুণি গ্রামে যেই উপসম্পদা অনুষ্ঠান হয়েছিল তা অনুষ্ঠিত হয় হাঞ্চর ঘোনা নামক স্থানের এক পাহাড়ী ছড়ার জলাশয়ে প্রাকৃতিক বা উদক সীমার মধ্যে। লক্ষ্যণীয় যে, মহামুণি এবং রাজা নগরে অনুষ্ঠিত দুই উপসম্পদা অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়েছিল। এ দুই অনুষ্ঠানের ভেতর দিয়ে বড়ুয়া রাউলী সম্প্রদায়ের মধ্যে পূর্বের ভ্রান্ত মত ও পথ পরিবর্তনের ব্যাপক আন্দোলন ও জোয়ার শুরু হয় ভিক্ষু-গৃহীর যৌথ উদ্যোগে। অপরদিকে চিৎমরম ভিত্তিক আরকান সংঘরাজের আরকানী শিষ্য সংঘের মাধ্যমে পার্বত্য অঞ্চলেও একই অভিযান শুরু হয়। তারা বান্দরবান হতে ত্রিপুরা পর্যন্ত বিস্তৃত চাকমা ও মারমা সমাজে বুদ্ধ শিক্ষা বিরোধী আচার বিশ্বাসের অপনোদনের উদ্যোগ-প্রচেষ্টায় বড়ুয়া সমাজের ন্যায় বিশেষ সাফল্য অর্জন করতে পারেননি। বিশেষ করে চাকমা সমাজে তেমন কোন প্রভাব ফেলতে পারেননি বিধায় লুরি ও ব্রাহ্মণ্য প্রভাব এই সমাজে বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত প্রবল ছিল। চাকমা

সমাজে বড়ুয়া ভিক্ষু ভদন্ত জ্ঞানশ্রী স্থবির এবং অল্প সময়ের ব্যবধানে পরবর্তীকালে তৎপুত্র্য ভিক্ষু রাজগুরু ভদন্ত অগ্রবংশ মহাস্থবির এ দুজনের উপস্থিতিতে সর্বপ্রথম চাকমা ভিক্ষু সংঘের জন্ম হয় পার্বত্য চট্টগ্রামে। পরবর্তীকালে রাঙ্গামাটিতে অবস্থানরত পটিয়ার নাইখাইন নিবাসী ডাক্তার গজেন্দ্র লাল বড়ুয়ার প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ রথীন্দ্র বিজয় নামে কাণ্ডাই বাঁধ এলাকার মোরঘোনা গ্রামের এক চাকমা যুবক ২৯ বছর বয়সে ১৯৪৯ খৃস্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরের নন্দন কানন বিহারাধ্যক্ষ ভদন্ত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সাধনানন্দ নামে পরিচিত হন। ১৯৬১ খৃস্টাব্দের ২৭ শে জুনে ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাস্থবিরের গুরু উপসংঘরাজ ভদন্ত গুণালঙ্কার মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে দিঘীনালায় মাইনীতে তিনি উপসম্পদা গ্রহণ করেন। উল্লেখ্য যে, চাকমা সমাজে প্রচলিত রীতি ও বিশ্বাস বিরুদ্ধ একটি কাজ। সেই ভদন্ত সাধনানন্দ তাঁর সাধন জীবনে এখন লঙ্ঘনপ্রতিষ্ঠ এক সাংঘিক ব্যক্তিত্ব। জাতি-ধর্ম নির্বিশেষে তার জনপ্রিয়তা এখন দেশের গণ্ডি ছাড়িয়ে বিদেশেও পরিব্যাপ্ত। শতাধিক শিষ্য ভিক্ষুর তিনি এখন একক উপাধ্যায়। চাকমা সমাজে তিনি এখন ধর্মীয় ও জাতীয় সুরক্ষার একমাত্র আচ্ছাদন ও আশ্রয়। চাকমা, বড়ুয়া ও মারমা সমাজে তাঁর ভক্ত অনুরাগীর সংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে অবিরাম গতিতে। অকৃত্রিম বুদ্ধপ্রেমী, বুদ্ধের শিষ্য ও আদর্শের অকৃত্রিম ধারক এই মহাপ্রাণের ধর্ম-বিজয় যাত্রা অব্যাহত থাকুক; প্রবল থেকে প্রবলতর হউক এই প্রার্থনা করি মনে প্রাণে, বাংলাদেশের বৌদ্ধ সমাজের ভিক্ষু ও গৃহী সংঘের বর্তমান অস্থির, নাজুক পরিস্থিতিতে। **কেমন আছে এদেশের বর্তমান বৌদ্ধ সমাজ?** কেমন আছে এদেশের বড়ুয়া, চাকমা ও মারমা মানসিকতা? হাজার হাজার বছর ধরে লালিত তাদের প্রিয় সন্ধর্ম ও ঐতিহ্যিক আচার সংস্কৃতির হাল-হহিকত এখন কেমন চলছে?

একথা সত্য যে, যে জাতি, যেই সমাজ মন-মানসিকতায় যত অনুদার, যতই সীমাবদ্ধ, সেই জাতি বা সমাজ ততই দরিদ্র; আড়ষ্ট ও নির্জীব; তাদের জীবনের সর্বক্ষেত্রে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যাক ইংরেজ জাতির কথা। বৃটিশ নামক এই জনগোষ্ঠী সংখ্যায় তেমন কোন বড়ো মাপের নহে। কিন্তু, তাদের সমাজ জীবনে হৃদয়ের দুয়ারকে এমন ভাবে প্রসারিত করতে পেরেছেন যে, সারা বিশ্বের মানব সমাজের যেথায় যেখানে কোন জ্ঞান গুণের, উন্নত কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সভ্যতার সন্ধান তারা পেয়েছেন সেখানেই ছুটে গেছেন, বিনা দ্বিধায় আহরণ করেছেন আপন জ্ঞান গুণ; কৃষ্টি সংস্কৃতি ও সভ্যতার ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করতে। শুধু তাই নহে বিশ্বের কোন জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ও প্রচলিত ভাষায় পর্যন্ত নতুন কোন শব্দের সন্ধান পেলে তাও তারা আপন ভাষার শব্দকোষে গ্রহণ করে নিয়েছেন অনায়াসে। ইংরেজ জাতির হাজার বছরের লালিত এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য

বিশ্বজোড়া ভৌগলিক সাম্রাজ্য ভাষার সাম্রাজ্য, সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার মতো বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী করেছে। এক সময় 'বৃটিশ সাম্রাজ্যে সূর্য অস্ত যায় না' বলে বাস্তব প্রবাদ প্রচলিত ছিল। কিন্তু বৃটিশের অতি লোভী শোষণ নীতিতে সেই বিশ্ব সাম্রাজ্য হারাতে হয়েছে ক্রমান্বয়ে। কিন্তু, বৃটিশদের ভাষা ও সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্য এত সমৃদ্ধ ও সুদৃঢ় ভিতের উপর প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছে যে, এই দুই সাম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যাবে না।

বৃটিশ জাতি বিশ্বের প্রায় সব জন গোষ্ঠীর থেকে জ্ঞান, গুণ, সভ্যতা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও ভাষার শব্দকে গ্রহণ করেছেন বলে আপন বৈশিষ্ট্যকে কি বিলীন করে দিয়েছেন? না, তাঁরা নিজের সকল উন্নত মার্জিত জ্ঞান গুণ ও কৃষ্টি সংস্কৃতিকে উর্ধ্বে রেখেই আপন স্বকীয়তাকে আরো সুন্দর, আরো রমণীয় অনুপম করে তুলেছেন বৃটিশ জাতীর সমৃদ্ধিকে। আমেরিকা ধন বলে, অস্ত্র বলে, জন বলে বলীয়ান যে হয়েছে তার সিংহভাগ বৃটিশ জাতিরই অবদান- একথা আমেরিকার সমগ্র জনতা এবং তাদের ইতিহাস স্বীকার করে অকুণ্ঠ চিন্তে। বিশ্বের যে কোন সমাজ বৃটিশ জাতীর এই দূরদর্শী উদার নৈতিকতার আদর্শ গ্রহণ করা যে মঙ্গলকর তাতে কোন সন্দেহ নেই।

বৃটিশ জাতির এই মহৎ গুণাবলী এদেশের ক্ষুদ্রকায় তিন বৌদ্ধ জন গোষ্ঠীর মধ্যে একান্তই অনুপস্থিত। বড়ুয়ারা এই গুণের অভাবে এক সময় সব কিছু হারাতে হারাতে বিলীন হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। তাঁদের পূর্ব পুরুষ বৃজি জাতি প্রবল প্রতাপী মগধ রাজশক্তির সম্মুখে নিজেদের অতিদাস্তিকতা প্রদর্শন করতে গিয়ে জন্মভূমি হতে বিতাড়িত হয়ে ছিলেন। মগধরাজ অজাতশত্রুর হাতে সেই যে রাজ্য হারালো; আড়াই হাজার বছরে বিগত ইতিহাসে তারা আর কোন দিন রাজ্যের অধিকারী হতে পারলেন না। অহোম জাতির রাজ্য আসাম। সেই আসামে বৃজিরা আশ্রিত হয়ে অহোমের ইতিহাসে ও অভিধানে (অসম রুরুঞ্জী) তাদের স্থান শুধু মাত্র সেনাপতি পদে। এমনকি, বংশ পরম্পরা এই জীবিকাকে গ্রহণ করায় 'বড়ুয়া' শব্দের পরিচয় ও অর্থ হয়ে দাঁড়ালো সেনাপতির একটি পদবীগত উপাধি বিশেষ। বৃজি রক্তের এই দুর্ভাগ্যের ধারাবাহিকতা চলে আসে বৃটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে পর্যন্ত। বৃটিশেরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে চট্টগ্রামী বড়ুয়াদের নিয়ে বৃটিশ সেনাবাহিনীতে 'বড়ুয়া প্লাটুন' নামে পৃথক একটি বাহিনী গঠন করেন বড়ুয়াদের ক্ষাত্র-বীর্যের পরিচয় পেয়ে। কিন্তু, সেই ক্ষাত্রবীর্য শেষ পর্যন্ত বৃটিশ এনসাইক্লোপিডিয়া অব ব্রিটেনিকাতে স্থান পেয়েছে 'বড়ুয়া' শব্দের অর্থ হলো পাচক। কারণ, ব্রাহ্মণ্যবাদের নিষ্পেষণ এবং ইসলামের প্রবল সাম্প্রদায়িক শোষণ বঞ্চনার শিকার হয়ে এই প্রবল ক্ষাত্রবীর্যের অধিকারী বড়ুয়ারা একসময় জেলে ও বাবুর্চি জীবিকাকে আপন করে নিয়েছিলেন একারণে বড়ুয়াদের প্রায় সকলের বসতি গড়ে উঠেছে খালের পাড়ে, ঝিলের ধারে। তারা এক্ষেত্রে জেলে

হলেও বংশগত পরিচিতিতে ধারণ করতে গিয়ে অনেকে গোষ্ঠীগত উপাধি রেখেছিলেন 'রাজবংশী' বলে। পারস্যের আঙ্গুর মদ-মাংসের ভোজন বিলাসী সংস্কৃতি এদেশের নবাবী বংশ গুলোর মধ্যে ও অব্যাহত ছিল। বৃজি রাজকীয় ভোজ্য শিল্পের ঐতিহ্যিক গুণের বাহক এই বড়ুয়ারা তাই রন্ধন শিল্পের গুণে সমাদৃত হতো। নবাবী পাচক রূপে। নবাবদের শাসন ক্ষমতা বৃটিশের হস্তগত করতে গিয়ে তাদের পাচক 'বড়ুয়াদের রন্ধন দক্ষতা এবং বৌদ্ধোচিত অনন্য বিশ্বাস যোগ্যতার পরিচয় পায়। তাই তারা খাদ্যের মতো জীবন সংশ্লিষ্ট বিষয়ে 'বড়ুয়া পাচক' কে সবচেয়ে উত্তম ও নিরাপদ বিবেচনা করে বড়ুয়া সম্প্রদায়কে ব্যাপক ভাবে এই কাজে প্রায় প্রত্যেকটি উপনিবেশিক বৃটিশ পরিবারে স্থান দেন। লক্ষণীয় যে, শুকর পালন ও তার মাংসের ব্যবহার করতে গিয়ে এবং মৎস্য ব্যবসার ধারক হতে গিয়ে বড়ুয়ারা হিন্দু সমাজের চোখে একসময় নিম্নবর্ণের অস্পৃশ্য সম্প্রদায়ে পরিণত হয়েছিলেন। কিন্তু তাদের অতীত রাজকীয় রন্ধনের সাথে সম্পর্কিত 'রন্ধন শিল্প' তাদেরকে হিন্দু সমাজ প্রদত্ত অভিশাপ হতে মুক্ত করে নবাবী আমলে সিকদার, তালুকদার, মুৎসুদ্দি, চৌধুরী-এসকল ভূমিগত পদবীর সৌভাগ্য এনে দিয়েছিলেন। আর বৃটিশ শাসনে এই রন্ধন শিল্পের গুণেই বড়ুয়া সমাজ আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা-সংস্কৃতিও সভ্যতার পরশ পেয়ে বড়ুয়া সমাজে ধর্মীয় ও জাতীয় জাগরণের আবার সৌভাগ্য এনে দিয়েছিল। শিক্ষায়, সংস্কৃতিতে, ও ধর্মে এদেশের বড়ুয়ারা এখন এদেশের যে কোন সম্প্রদায় হতে কোন অংশে পিছিয়ে না থাকার সে সৌভাগ্য তা বৃটিশ জাতি কর্তৃক বড়ুয়াদের রন্ধন শিল্পের সমাদর জাত আশীর্বাদ এই সত্য অনস্বীকার্য।

কিন্তু অদূরদর্শী বড়ুয়ারা বুদ্ধ প্রেমে নিজের পারিবারিক ও সামাজিক জীবন হতে প্রাণী হত্যা ত্যাগ না করলে ও তাদের জাগতিক সৌভাগ্যদাতা এই রন্ধন শিল্পকে ক্রমে অবজ্ঞা ও সামাজিক হেয় প্রতিপন্নতার শিকার করলো। যে শাখায় বসে আছ সেই শাখার গোড়া কর্তন তুল্য হীন মুখ মুক্তির পালনকারী এই বড়ুয়াদেরকে বরাবরই দেখা যাচ্ছে তাঁরা যেই বিদ্যা, বাণিজ্য বা শিল্পকে আশ্রয় করে একটু আর্থিক স্বচ্ছলতা লাভ করেন ক্রমে সেই আয়ের উৎসের দোষ-সন্ধানে রত হন, উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। ফলে, নিজের অধিগত বিদ্যা বুদ্ধি ও অভিজ্ঞতাকে নিত্যনতুন উপায় উদ্ভাবনের দ্বারা আরো শাণিত, আরো উন্নত-উৎকৃষ্টতার দিকে অগ্রসর না করে, প্রজন্ম পরম্পরা তাকেও সম্প্রসারণ ও সমৃদ্ধি দানে উদ্যোগী না হয়ে, হাত গুঁটিয়ে ঘরে ফেরায় ব্যস্ত হয়ে উঠেন। ফলে বড়ুয়াদের অর্জিত সম্পদ ও বিদ্যাবুদ্ধি হয়তো নিজের হাতেই শেষ করেন, অথবা অযোগ্য উত্তরাধিকারীর হাতেই নিঃশেষ হয়ে যায়; কখনো এক পুরুষের অধিকাল স্থায়িত্ব পায় না।

বড়ুয়াদের বৃজী রক্তগত অতিদাস্তিকতা হতে উৎপন্ন অহংকার, স্থূল আবেগ প্রবণতা, অদূরদর্শীতা আর অমিতব্যয়ীতা এই চারি মহাপাপ তাঁদেরকে হাজার বছর ধরে কোন দিন একক নেতৃত্বে স্বীকার করতে দেয়নি; আপন ধন, আপন গুণের সমাদর করতে দেয়নি। ফলে বড়ুয়ারা যেখানেই গেছেন সেখানে তাঁরা কোন সুনির্দিষ্ট ভূখণ্ডে দলবদ্ধ হয়ে বসবাস করতে পারেনি এবং নিজের নিকট জ্ঞাতী বা নিজের সমাজে কোন গুণী প্রতিভার বিকাশ সাধনে উদার হৃদয়ে মনযোগী হতে পারেনি। কোন পরিবার বা জনগোষ্ঠী ছন্নছাড়া হতে অপরের দ্বারা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য ও অবজ্ঞার শিকার হয়ে চিরদিন লাক্ষিত অপমানিক জীবন যাপন করতে উপরোক্ত দুই অগুণই যথেষ্ট। বড়ুয়া সম্প্রদায় এই দুই অভিশাপে নিজেরা নিজেকে অভিশপ্ত করে রেখেছেন অদ্যাবধি। অথচ কিছুতেই বুঝতে চাইছেন না যে, ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে শুধু মাত্র দুইটি নেতৃত্বকে স্বীকার করে নিতে পারলে, উভয় নেতৃত্বের যৌথ উদ্যোগে বর্তমানের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাম্প্রদায়িক, ধর্মীয় এবং সাংস্কৃতিক যেই অসহায়ত্ব তা খুব সহজেই অতিক্রম করতে পারতেন। রাষ্ট্রীয় পরিষদে বড়ুয়াদের সুখ-দুঃখের ছবি তুলে ধরার মতো কোন সুযোগ বর্তমান গণভোটের পদ্ধতিতে বড়ুয়াদের ভাগ্যে কোন দিন আসবে না। কিন্তু সাগরে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো বসবাসকারী বাংলাদেশের সমস্ত বড়ুয়ারা যদি একটি মাত্র সামাজিক নেতৃত্বের অনুগত হয়ে জাতীয় পরিষদে জোরালো দাবী অব্যাহত রাখলে মাত্র পাঁচ বছরের মাথায় বড়ুয়ারা বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধার সকল ক্ষেত্রে নিজেদের অবস্থান গড়ে নিতে পারেন সাংবিধানিক ভাবে। বড়ুয়ারা একজন মাত্র ধর্মীয় নেতৃত্বের অনুগত হতে পারলে তাদের ধর্মীয় ও সামাজিক নীতি-শৃঙ্খলা, শিক্ষা ও চারিত্রিক যোগ্যতা মাত্র দশ বছরের মাথায় এদেশের সকল সম্প্রদায়কে অতিক্রম করে বিশ্বের দরবারে একটি সত্যিকার গুণী শিক্ষিত, ভদ্র ও সভ্য জনগোষ্ঠী হিসেবে পরিচয় তুলে ধরতে পারবেন। ভাবতেও আশ্চর্য লাগে যে, দিবালোকের মতো স্পষ্ট সহজ সত্যটি বড়ুয়াদের সামান্য সদিচ্ছার অভাবে সত্যিকার কোন জোরালো উদ্যোগ এযাবত গ্রহণ করা সম্ভব হলো না। বড়ুয়ারা বৃজিরক্তের প্রভাবে খুবই সংগঠন প্রেমী। বড়ুয়ার সন্তানেরা মাত্র দু'জন এক জায়গায় মাত্র দু'টি রাত অতিবাহিত করলেও কোন না কোন সংগঠন সৃষ্টির ভাবনায় তাদের পেয়ে বসে। এটা শুভ লক্ষণ। কিন্তু, সেই বৃজি রক্তের প্রবল ব্যক্তি দাস্তিকতা অচিরেই অনৈক্যের মতভেদের জন্ম দেয়। তারা প্রত্যেকেই চায় নিজের অভিরুচির প্রতিফলন, সকলের চিন্তা-অভিরুচির সমন্বয় সাধনের মতো সহনশীল প্রবৃত্তি বড়ুয়া মেজাজে মোটেই গভীর নহে। তাই স্বল্পতম সময়ে এক সংগঠন ভেঙ্গে দু'তিনটে হওয়া, এক সমাজ ভেঙ্গে অনেক সমাজের জন্ম দেয়া, এক বিহারের স্থলে একাধিক বিহার প্রতিষ্ঠা করা- এ সকল অনৈক্যের চর্চা চলছে এই

অতি ক্ষুদ্র বড়ুয়া সমাজের বুকে অবিরাম, অব্যাহত গতিতে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পল্লীতে বিচ্ছিন্ন; রাজনৈতিক অধিকার বঞ্চিত এই বড়ুয়া সমাজের প্রাণের মূল উৎস এই একতার উপর কুঠারঘাতকারী বিচ্ছিন্নতাবাদী মানসিকতাকে নির্মূল করতে গেলে অচিরেই পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন গ্রামভিত্তিক সকল সামাজিক, সাংস্কৃতিক, অর্থনৈতিক ও সেবামূলক সংগঠনগুলোর প্রতিনিধি নিয়ে জোন, ইউনিয়ন ও থানা ভিত্তিক কেন্দ্র গড়ে তোলা। অতঃপর থানা ভিত্তিক ও নগর ভিত্তিক কেন্দ্র গুলোর প্রতিনিধি নিয়ে জাতীয় কেন্দ্রের জন্ম দেয়া। এভাবে খুব সহজেই বড়ুয়া সমাজের বুকে সামাজিক একক জাতীয় নেতৃত্বের জন্ম দেয়া সম্ভব।

ধর্মীয় ভাবে উন্নত শিক্ষা, আচরণ ও চারিত্রিক প্রতিযোগীতা বিহীন নাম সর্বস্ব নিকায়বাদকে সামাজিক ভাবে উৎখাত অথবা বর্জনের পদক্ষেপ এই ক্ষুদ্র সমাজে একান্তই জরুরী। যদি দেখা যায় বুদ্ধের শিক্ষা ও আদর্শের অনুকূলে ভিক্ষু জীবনের গুণগত উন্নয়নের দৃঢ় প্রত্যয়ে ভিক্ষুদের কোন ব্যক্তি বা সমষ্টি পৃথক নিকায় বা আদর্শ জীবন যাত্রার গ্রুপ সৃষ্টির পক্ষে কথা বলছেন; তাঁর সেই দাবীর বাস্তবতা এবং ভবিষ্যত কল্যাণময় সম্ভাবনা যাচাই করে যুক্তিযুক্ত প্রমাণে তেমন দাবীর বাস্তবায়নে সহযোগীতা প্রদান করা অবশ্যই কর্তব্য। তবে, বড়ুয়া সমাজে বর্তমান নিকায়গত দ্বন্ধের তিক্ততা যে পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তার পরিমাপ করা আমার পক্ষে বহুগুণে সহজ। কারণ বাংলাদেশ সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার ১৯৮৯-৯৬ খৃঃ পর্যন্ত সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব পালন কালে উভয় নিকায়ে দ্বন্দ্ব এক চরম পর্যায়ে পৌঁছার পর শান্তি সমঝোতার বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। এতে দশ বারোটি বৈঠকের পর আমাদের পক্ষ থেকে উভয় পক্ষের গ্রহণ যোগ্য নূন্যতম সমঝোতার প্রস্তাবটি এ ভাবেই উত্থাপন করা হয়েছিল- “কে বড়ো, কে ছোট; কে শুদ্ধ, কে অশুদ্ধ- এ সকল বিতর্ক বাদ দিয়ে সংঘরাজ নিকায় ও মহাস্থবির নিকায় উভয়ে বুদ্ধের নির্দেশিত বিধি মতে শ্রীলংকা বা বার্মা হতে শীলবান বিনয়ধর সংঘকে আহ্বান করে কর্মবাক্য শুনবো এবং একই সাথে সামগ্রিক উপোসথ করে ধর্মতঃ এক হয়ে যাবো। তখন প্রয়োজন এক সংগঠন অথবা পৃথক সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় রাখলেও উভয়ের মধ্যে উপোসথ, উপসম্পদা জাতীয় ধর্ম সম্মেলন এবং তিথি, সংঘদানাদিতে একসাথে ভোজনাদি আমিষ সম্মেলনে আর কোন প্রকার ধর্ম-বিনয়গত বাঁধা থাকবে না।” এমন উদ্যোগ শ্রীলংকা এবং থাইল্যান্ডের ইতিহাসেও দেখা যায় এবং স্বয়ং বুদ্ধের সময়েও কৌশাঘীতে সংঘ বিভেদে তা অনুসৃত হয়েছে।

সেদিন আমাদের এমন নমনীয় উদার প্রস্তাবে মহাস্থবির নিকায়ের মাত্র দু’জন প্রবীণ ভিক্ষু ছাড়া সকলেই সাধুবাদ দিলেও উক্ত দুই প্রবীণের অযৌক্তিক একান্তবাদীতা দীর্ঘদিনের শ্রমকে পশুশ্রমে পরিণত করে দিল। তাঁদের মতে পরম্পরের মধ্যে ভোজন নিমন্ত্রণাদি চললে সব ঠিক হয়ে যাবে। মহান বুদ্ধের

ধর্ম বিনয়ের প্রতি শ্রদ্ধা-গৌরবহীন হয়ে সামাজিক ভোজন নিমন্ত্রণের মাধ্যমে নিকায় মিলনের এই অদ্ভুত মানসিকার পরিচয় অতীতে ও মহাস্থবির নিকায় হতে বহুবার প্রদর্শিত হয়েছে। অথচ, তারাই যে কোন সভা সমাবেশে নিকায় মিলনের বড়ো বড়ো বুলি আওড়িয়ে উপস্থিত জনতার বাহ বা নিতে তৎপর থাকেন বেশী। নিকায় মিলনে আমার এই তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও বলবো- কেহই অমর নয়। সেদিন নেতৃত্ব হারানোর কাল্পনিক ভয়ে নিকায় মিলনে আমাদের আন্তরিক প্রয়াসকে নষ্ট করে দিয়ে এই ক্ষুদ্র বড়ুয়া সমাজকে শতাব্দীকালের অভিশাপ হতে যারা মুক্ত হতে দিলেন না, তাদের মতো গুটিকয় নেতৃত্ব লোভী হীনাচারীদের অপ প্রয়াসকে সামাজিক প্রবল চাপের মাধ্যমে রুখে দিয়ে বড়ুয়া জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব রক্ষার জোরালো পদক্ষেপ আগামীতে যত সহসা গ্রহণ করা যায় ততই মঙ্গল।

অন্যথায় বড়ুয়া সমাজের বর্তমান নিকায় দ্বয়ের মধ্যে ধর্ম সম্ভোগ ও আমিষ সম্ভোগের কাজটি সমাধা করার পর, উভয় নিকায়ের প্রধান গুণী ও ব্যক্তিত্বশালী ভিক্ষুদের নিয়ে একটি কেন্দ্রীয় সভা গঠন করা যায়। এ সভার প্রতিনিধি নির্ধারণে প্রতি বিশ জনে একজন প্রতিনিধি এই পদ্ধতি ছাড়াও উভয় নিকায়ের শীলবান, ধ্যান সমাধি পরায়ণ এবং ত্রিপিটক শাস্ত্রে অভিজ্ঞ ভিক্ষুগণকেও সেই কেন্দ্রীয় সভার সভ্য হিসেবে গ্রহণ করে সমাজে ও জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে ধর্মকার্যক্রমের পদক্ষেপ নেয়া যেতে পারবে। বড়ুয়া সমাজে বর্তমানের ভিক্ষু সংঘ সাংগঠনিকভাবে ভীষণ দুর্বলতার কারণে ভিক্ষুরা দিক নির্দেশনা বিহীন হয়ে পড়েছে। বস্তুতঃ বুদ্ধ সমকালীন সাংঘিক জীবনকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে চলমান যুগের প্রেক্ষাপটে ভিক্ষুদেরকে এভাবেই গড়ে উঠার সুযোগ সুযোগ দিতে হবে- ১. বিনয়ধর সাধক ভিক্ষু, ২. শাস্ত্রজ্ঞ ও গবেষক ভিক্ষু, ৩. প্রাতিষ্ঠানিক ও আচার্য ভিক্ষু, ৪. প্রচারক ভিক্ষু এবং ৫. সাংগঠনিক ভিক্ষু। ভিক্ষু সমাজকে এভাবে বিন্যাস করে সকল ভিক্ষুর স্ব স্ব প্রতিভার বিকাশে স্থানীয়, আঞ্চলিক ও কেন্দ্রীয় ভাবে শক্তিশালী সংঘ ফাও সৃষ্টির মাধ্যমে তাদের যাবতীয় সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা করা দরকার। এই লক্ষ্যেই ব্যবহার করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। ব্যক্তিগত তিথি-শ্রাদ্ধেয় দান ব্যক্তিগত ভাবেই ব্যবহার করতে পারবেন।

আরো নিত্য-নতুন নিকায়ের জন্ম হয়ে ভাঙ্গা-কপাল বড়ুয়া সমাজকে আরো ভাঙ্গণের শিকার করবে অচিরেই। এদেশের বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী ত্রয়ের মধ্যে আরকান ও বার্মার আদর্শে মারমা সমাজে বিহার ভিত্তিক শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা ও ধর্মীয় শিক্ষার প্রথা চালু থাকলে ও বড়ুয়া এবং চাকমা সমাজে তা দেখা যায় না। শুনেছিলাম বড়ুয়া সমাজেও অতীতে সেই প্রথা বিদ্যমান ছিল। কিন্তু, দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক প্রাথমিক শিক্ষার দায়িত্ব গ্রহণ করার ফলে বিহার ভিত্তিক শিশুদের প্রাথমিক শিক্ষা দানের

প্রয়োজনীয়তা এমন এক ভয়ানক ভুল বিশ্বাস বড়ুয়া সমাজকে পেয়ে বসেছে। যে কোন ক্ষুদ্র সম্প্রদায় বৃহৎ সম্প্রদায়ের রাষ্ট্রীয় ধর্মীয়, শিক্ষা, সংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক আগ্রাসন হতে আত্মরক্ষা করতে হলে বৃহৎ সম্প্রদায়ের চেয়ে অবশ্যই বহুগুণ বেশী তৎপর ও সজাগ থাকতে হয়। অন্যথায় তারা ক্রমেই হারিয়ে যেতে বাধ্য হয় বৃহৎ সম্প্রদায়ের আগ্রাসনে। এদেশের বিশাল মুসলিম সমুদ্রে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের ন্যায় বিচ্ছিন্ন ভাবে বসবাসকারী বড়ুয়ারা তাদের ভৌগলিক অবস্থানগত এই অসহায়ত্বকে উপলব্ধি করতে না পেরে বিহার ভিত্তিক প্রাথমিক ও ধর্মীয় শিশু শিক্ষার অতীত প্রথাটি মুছে দেয়ার কারণেই বর্তমান বড়ুয়া সন্তানেরা একদিকে হারিয়েছে ধর্ম প্রেম, অপরদিকে হারিয়েছে মেধার প্রতিযোগিতায় স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়, চাকুরী ও ব্যবসায় বাণিজ্যে টিকে থাকার ক্ষমতা। ধর্মপ্রেম ও মেধা শক্তি এ দুই প্রধান গুণ বঞ্চিত বর্তমান বড়ুয়া প্রজন্ম সফল উচ্চশিক্ষায় ব্যর্থতা এবং চাকুরী ও ব্যবসার প্রতিযোগিতায় অসাফল্যতার শিকার হয়ে এখন তারা বড়ুয়ার ঘরে জন্ম এবং বুদ্ধ ধর্মকে অভিশাপ বলে বিবেচনা করতে শুরু করেছে। বড়ুয়া সমাজের বর্তমান প্রজন্মে ধর্মান্তর গ্রহণের প্রবণতা বৃদ্ধির পেছনে বিহার ভিত্তিক ধর্মীয় ও প্রাথমিক শিক্ষা বর্জনকে বহুলাংশে দায়ী করলে অযথার্থ বলে মনে করার কারণ দেখি না।

গ্রামভিত্তিক বিহার গুলোতে পালার ছোয়াইং এর অভিশাপে একাধিক ভিক্ষু শ্রমণের অবস্থান কষ্টসাধ্য হয়ে পড়ায়, স্কুল কলেজে পড়ুয়া ভিক্ষু শ্রমণের হাতে শিশুদের শিক্ষাদানে সময় না থাকায়, সর্বোপরি সমাজে ধর্মীয় অনুষ্ঠানের বাহুল্যতায় পুরোহিত ভিক্ষুদের অতিমাত্রায় ব্যস্ততার কারণে বড়ুয়া সমাজের বর্তমান ভিক্ষুদের উপর নির্ভর করে বিহার ভিত্তিক ধর্মীয় ও প্রাথমিক শিশু শিক্ষা নামক জাতীয় অস্তিত্ব রক্ষার এই প্রথাটি প্রচলন করা মোটেই সম্ভব নহে। তাই শ্রীলংকার মতো শিক্ষিত গৃহীগণকেই এই পবিত্র দায়িত্ব গ্রহণে এককভাবে এগিয়ে আসতে হবে প্রথম দিকে। পালার ছোয়াইং প্রথাকে গৌণ করে পিণ্ডচারণ প্রথা প্রবর্তনের মাধ্যমে বিহার ভিত্তিক ভিক্ষু-শ্রমণ সংখ্যা বৃদ্ধি করা গেলে তখন ভিক্ষু-গৃহী সমন্বিত উদ্যোগে পরিচালিত হতে পারবে এই আদর্শ সমাজ জীবন গঠনের কার্যক্রমটি। বড়ুয়া সমাজের সন্তানদেরকে এদেশের সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের উপর চাপিয়ে দেয় সমস্ত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে শিক্ষায়, চরিত্রে, বুদ্ধি, মেধায় ও স্বাস্থ্যে উপযুক্ত সৈনিক রূপে গড়ে তুলতে প্রয়োজন বিহার ভিত্তিক একটি সুপরিকল্পিত ও সুনিয়ন্ত্রিত স্বনির্ভর শিক্ষা কার্যক্রম। এই শিক্ষা কার্যক্রমকে একটি স্বতঃস্ফূর্ত জনপ্রিয় সামাজিক অপরির্ত্যাজ্য প্রথায় পরিণত করতে প্রতিটি বিহার ভিত্তিক চার হতে ছয়জন মাত্র শিক্ষিত প্রবীণ ও যুবক নারী-পুরুষের সমন্বিত উদ্যোগই যথেষ্ট। তাঁদের এই উদ্যোগ উদ্দীপনা মাত্র ১২টি বছর নিবেদিত রাখতে পারলে ইহা আর বন্ধ হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা

থাকবে না। শ্রীলংকায় বিহার ভিত্তিক এই শিক্ষা কার্যক্রম বর্তমান সপ্তাহিক ছুটির দিনেই মাত্র চালু আছে এবং তা শুধু মাত্র শিশু যুবক ও প্রবীণদের ধর্মীয় শিক্ষা ও অনুশীলনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়েছে, সরকারী ভাবে প্রাথমিক শিক্ষায় সীমাহীন দুর্বলতার বিষয়টি ছাড়াও সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সন্তান হিসেবে শিক্ষা ও মেধায় সংখ্যা গুরুদের অতিক্রম করার শক্তিদান করতে বিহার ভিত্তিক শিশু শিক্ষাকে দৈনিক করতে হবে। সকালের অতিব্যস্ততার কারণে সন্ধ্যা ৭টা হতে রাত ১০টা পর্যন্ত এই শিক্ষা এবং দুই ঘন্টা স্কুলের পরবর্তী দিবসের গুরুত্বপূর্ণ পাঠ্য বিষয়ের উপর শিক্ষা দান করে বিদায় দেয়া। ধ্যান অনুশীলনকে প্রতিদিন গুরুত্বে অত্যাৱশ্যকীয় করলে পরবর্তী ২ ঘন্টায় ৫/৬ ঘন্টার পাঠ আয়ত্ত্ব করণ শিশুদের পক্ষে সম্ভব হবে তাদের শান্তসৌম্য চিত্ত ভাবের আশীর্বাদে। শিশুদের জীবনে ধ্যান অনুশীলনকে অভ্যাসে পরিণত করতে পারলে শুধুমাত্র তাদের সমগ্র জীবনই সুশৃঙ্খল হবে না, এ শিশুরা মাতাপিতার স্বপ্ন এবং জাতীয় জীবনের স্বপ্নকে ও সমুজ্জ্বল করে তুলতে পারবে।

জনগোষ্ঠীর অবস্থান ভারতের বর্তমান বিহার প্রদেশের প্রাচীন বৈশালী রাজ্য হতে পশ্চিম বঙ্গ, ত্রিপুরাও আসাম হয়ে চট্টগ্রাম পর্যন্ত বিস্তৃত হতে দেখা যায়। অপরদিকে চাকমাদের অবস্থান থাই; মায়ানমা সীমান্ত হতে আরকান ও দক্ষিণ চট্টগ্রাম হয়ে বর্তমান ত্রিপুরা, নাগাল্যান্ড ও অরুণাচল পর্যন্ত বিস্তৃত হতে দেখা যায়। কিন্তু, আরকান হতে বরিশালের পটুয়াখালী পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল আরকান সম্রাজ্যের অধিকারী বর্তমান বর্মী এবং মারমা বা রাখাইন জনগোষ্ঠীর উৎস স্থল কোথায়? দৈহিক বর্ণ ও শারীরিক গঠনের দিক থেকে বিচার করলে বড়ুয়া বর্মী ও মারমা প্রায় কাছাকাছি। তারা ভারতের মধ্য অঞ্চল বিহার, উত্তর প্রদেশ ও উড়িষ্যা আর্য এবং দ্রাবিড় রক্তের মিশ্রিত ধারক বললে, নৃতাত্ত্বিক দিক থেকে যুক্তি সংগত মনে হয়। তবে, বরাবরই সমতলবাসী বড়ুয়াদের মধ্যে যৎ কিঞ্চিৎ মঙ্গোল রক্তের সংমিশ্রণ হলে ও বর্মী জনগোষ্ঠী এবং মারমাদের উপর মঙ্গোলীয় রক্তের সংমিশ্রণ হলেও বর্মী জনগোষ্ঠী এবং মারমাদের উপর মঙ্গোলীয় রক্তের মিশ্রণ খুব বেশী। ঠিক একই ভাবে, এই দুই জনগোষ্ঠীর লিখিত অক্ষর শ্রীলংকার ন্যায় দক্ষিণ ভারতীয় হলেও ভাষাগত দিক থেকে থাই, কম্বোডিয়া মঙ্গোল প্রভাব প্রবল। কিন্তু মঙ্গোল রক্তের ধারক এই চাকমা সমাজ আশ্চর্যজনক ভাবে মঙ্গোলী ভাষার ধারক অথচ চট্টগ্রাম অঞ্চলে তাদের অবস্থান বেশী প্রাচীন দক্ষিণ ভারতীয়। বর্তমান অন্ধ্রপ্রদেশের এই বর্ণমালা দক্ষিণ ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সমুদ্রপথে শ্রীলংকা, আরাকান এবং বার্মাতে প্রচলন করেছিলেন। অপরদিকে উত্তর-ভারতীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা সম্রাট অশোক ব্যবহৃত প্রাচীন দেবনাগরিক আর্য লিপি প্রভাবিত খবোষ্টা লিপি থাই, কম্বোডিয়া প্রচলন করেছিলেন। বাংলা অক্ষরও এই অক্ষরের বিবর্তিত রূপ।

গবেষণা তত্ত্বের উপাত্তে দেখা যায় মানব সভ্যতার বিবর্তনে এক একটি জনগোষ্ঠীর আদি উৎস নির্ণয়ে ভাষা ও বর্ণমালা যত দ্রুত ও সহজে আন্তঃপরিবর্তিত (Interchange) হয়, রক্তগত দৈহিক পরিবর্তন তত দ্রুত ও সহজ সাধ্য হয় না। তবুও বিভিন্ন মানব গোষ্ঠীর আদি উৎস নির্ণয়ে ভাষা, বর্ণমালা আচার সংস্কৃতি এবং দৈহিক গঠন- এগুলো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিবেচ্য বিষয়। তাই এদেশের প্রাচীন ধর্মাবলম্বী ও প্রাচীন বাসিন্দা চাকমা, মারমা ও বড়ুয়াদের আদি উৎস নির্ণয়ে আমার পূর্বোক্ত পর্যালোচনা আত্ম পরিচয়ের একান্ত তাগিদ জাত।

এদেশের মাটিতে চাকমা, মারমা, মুন্সিংগ, চাক ও বড়ুয়া- এই সম্প্রদায়গুলো বুদ্ধ ধর্মের আশ্রয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে অবস্থান করে আসছেন পরস্পরের সাথে ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ও সামাজিক সম্পর্কের মাধ্যমে তবুও তাদের মধ্যে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য যত প্রকট, ধর্মীয় পার্থক্য এক্ষেত্রে মোটেই নেই বললে চলে। এদেশে বুদ্ধ ধর্মকে প্রচার প্রসারে ও সুরক্ষা মূলতঃ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের উপরেই ন্যস্ত। কারণ, তাঁরা উদ্যোগী হলেই গৃহী সমাজ ও এগিয়ে আসেন প্রয়োজনীয় সহযোগীতা দিতে। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের সমাজে সাংঘিক সেই চেতনা এখন প্রায় অপসৃত। আমি ভিক্ষু হলাম কিসের জন্যে? স্কুল কলেজে পড়ার জন্যে। কেন এই পড়া? যতদিন এই চীবর নিয়ে থাকবো, ততদিন তিথি, শ্রাদ্ধ, সংঘদান, বিহারের পুরোহিত্ব এগুলো হতেও আয় হবে এবং কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সনদের জোরে যে কোন একটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে চাকুরী পেলে তা থেকেও আয় হবে। এভাবে আর্থিক সমৃদ্ধি আসলে যদি ভিক্ষু জীবনে থাকি, গৃহী পরিচালিত বিহারে থাকতে পারলে থাকলাম, না পারলে স্বনির্ভর হয়ে অবশিষ্ট জীবন অতিবাহিত করবো। এতো গেল আপনার নিজের ভাবনা, বুদ্ধ ধর্মের প্রচার প্রসারে আপনার দায়িত্ব কি? দায়িত্ব তো যে দিন বিহারের পুরোহিত্বের দায়িত্ব নিয়েছি সেদিন থেকে পালন করে আসছি। উপাসক, উপাসিকা যারা আমার কাছে আসে তার শীল প্রার্থনা করলে শীল প্রদান করি; তিথি-শ্রাদ্ধের আমন্ত্রণ করলে তা গ্রহণ করি; ধর্ম শুনতে চাইলে দেশনা করি। তবে লেখাপড়া যখন কিছু জানি, তখন বইপত্র কিছু পড়ি; ইচ্ছা হলে দু'চারটি ধর্মীয় বিষয়ে বই লিখি, আর ভিক্ষুদের সংগঠনে দায়িত্ব পেলে মেয়াদ পর্যন্ত সেই দায়িত্ব ও পালন করি। এগুলো কি ধর্মরক্ষা ধর্ম প্রচার নহে? হ্যাঁ, এগুলোও ধর্মরক্ষা এবং ধর্ম প্রচারের কাজ বটে; তবে আপনার এ সকল কর্মকাণ্ড কোন্ সমাজে? কোন্ জনগোষ্ঠীর মধ্যে? কেন, বড়ুয়া, চাকমা, মারমা যখন যাদের বিহারে থাকে, তখন তাদের মধ্যেই তা করি। যাদের নাম বললেন, তারা তো আগে থেকেই বৌদ্ধ। তাহলে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসারে যে দায়িত্ব তা পালন হলো কৈ? বিজ্ঞ পাঠকগণ! এ প্রশ্নের উত্তর আমাদের বর্তমান ভিক্ষুরা আর দিতে

পারবেন না। এই যোগ্যতা, আমাদের মরে গেছে। আর এ কারণেই জনসংখ্যাও আর্থিক ভাবে দুর্বল বৌদ্ধ চাক্ মুরংরা এখন ধর্মান্তরিত হয়ে হয় খৃস্টান, নয় মুসলিম হয়ে যাচ্ছে। আবার আধুনিক শিক্ষায় উচ্চশিক্ষিত আর্থিকভাবে সচ্চল বড়ুয়া, চাকমা, মারমা পরিবার থেকেও অনেকেই ধর্মান্তরিত হয়ে যাচ্ছে।

এদেশে বৌদ্ধ ধর্মের প্রসার লাভের ইচ্ছা ও উদ্যোগ নেই বলে, স্বাভাবিক নিয়মে ইহা কেবল ক্ষয়ের দিকেই যাচ্ছে। আমার এই বক্তব্যের ইদানিং প্রতিবাদ উঠতে পারে। কারণ, বাংলাদেশের উত্তরবঙ্গের রংপুর, দিনাজপুর, বগুড়া এ সকল স্থানে অতি সাম্প্রতিক কিছু আদিবাসীকে প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বলে আবিষ্কার করা সম্ভব হয়েছে। আর তাঁদের মাঝে আমাদের শীলভদ্র নামে এক কীর্তিমান ভিক্ষু সহ আরো কিছু ভিক্ষু গৃহী সেই আদিবাসীদের মধ্যে বৌদ্ধধর্মের পুণঃজাগরণের চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন। আমি তাঁদের এই কর্মোদ্যোগ এই ত্যাগ-তিতিক্ষাকে আন্তরিক সাধুবাদ জানাই এবং অসীম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিগত ২০০৬, খৃস্টাব্দের জানুয়ারী, ফেব্রুয়ারীর দিকে বিহার প্রদেশের পাটনা থেকে আসামের তিনসুকিয়া পর্যন্ত দীর্ঘ ট্রেন ভ্রমণের পথে সহযাত্রীরূপে মালদেহের কিছু মুসলিম সহযাত্রী দীর্ঘক্ষণ সাথে পেয়েছিলাম। তাদের নিকটে সেই মালদহ সহ ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং আসাম রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত বাংলাদেশ সীমান্ত সংলগ্ন এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বিপুল সংখ্যক আদিবাসীদের অবস্থান সম্পর্কে জানতে পারলাম। তারাও খুব সম্ভব বাংলাদেশের রংপুর দিনাজপুরের আদিবাসী সম্প্রদায় ভুক্ত। বাংলাদেশী এই আদিবাসীদেরকে খৃস্টান এবং ইসলামী করণের চেষ্টা খুব প্রবল হওয়া সত্ত্বেও তাঁদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ এখনো তাদের আদি বৌদ্ধ বিশ্বাস হতে চ্যুত করা সম্ভব হয়নি। অথচ, বুদ্ধকে এবং তাঁর ধর্মের প্রকৃত পরিচয় কি, এসব কিছুই তাদের এখনো অজানা। তারা ধর্ম বলতে শুধু এটুকুই বুঝে, প্রতি বছর বৈশাখ মাসের পূর্ণিমা দিনে সবাই মিলে কোন ব্রাহ্মণ দিয়ে একটি বুদ্ধ পূজা করা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ ও আসাম অঞ্চলের এই আদিবাসীদের আচার-আচরণও প্রায় একই। শুধু তাই নহে, আসাম রাজ্যে স্বায়ত্বশাসিত বোরো ল্যাণ্ডের দাবীদার সংখ্যাগরিষ্ঠ ‘বোরো’ জাতিরাও একই আদিবাসী। এই বোরোদের সাথে চট্টগ্রামী বড়ুয়া, এবং আসামী বুরুয়াদের ঐতিহাসিক সম্পর্ক এখন অনুমান নির্ভর হলেও গবেষণায় তার বাস্তবতা প্রমাণিত যে হবে না, তাকে বলতে পারে? আমি সেবারের এই ট্রেন ভ্রমণে সহযাত্রী হিসেবে একজন, আসামী বুরুয়াকেও পেয়েছি। তিনি বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী একজন শিক্ষিত ভদ্রলোক হলেও যখন আমি তাকে বললাম যে, বড়ুয়া উপাধির কিছু লোক চট্টগ্রামের আদিবাসীন্দা আছে। আমি সেই জনগোষ্ঠীরই একজন। তবে তারা বৈষ্ণব নহেন, বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। একথা বলা সত্ত্বেও আমি অনুভব করলাম, আমরা উভয়ের অন্তরে এক আশ্চর্য অন্তরঙ্গতার জন্ম হয়ে গেল মুহূর্তের

মধ্যে। ধর্ম ও নাম এ দু'টি বিষয় এই মানব প্রজাতিকে সত্যি আশ্চর্যজনক ভাবে প্রভাবিত করে থাকে। এ-কারণেই বলছি, এদেশের চাকমা, মারমা ও বড়ুয়া ভিক্ষুসংঘের উপর এই সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারের এক বিরাট পবিত্র দায়িত্ব বিদ্যমান। তাই তাঁরা নিজেদেরকে কেবল স্ব সমাজে পুরোহিতের দায়িত্বে সীমাবদ্ধ রাখলে বড়ো ধরনের অপরাধের শিকার হবেন। বাংলাদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা ও আসামে বড়ুয়া, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও মারমা সমাজ হতে যে সকল সন্তানেরা এখন ভিক্ষু জীবন ব্রত গ্রহণ করেছেন, তাঁদের কর্তব্য হবে পালি ভাষা, ইংরেজী ভাষা ও ত্রিপুরী, আসামী এবং অরুণাচল ও মেঘালয় রাজ্য সমূহের আঞ্চলিক ভাষা সমূহ আয়ত্ত্ব করা সহ পালি ভাষা এবং ত্রিপিটক শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করা। একই সাথে নিজেকে শীলসংযম ও ধ্যান সমাধিতে উন্নত করে স্ব সমাজের গণ্ডি ছেড়ে দেশে বিদেশে বুদ্ধ বাণীকে প্রচার প্রসারের দায়িত্বে আপন জীবন উৎসর্গ করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হওয়া। বর্তমানের নোংরা মানসিকতার ভিক্ষু নেতৃত্ব ও ক্ষুদ্র পুরোহিতের মোহকে বিসর্জন দিয়ে মহত্ত্বের ভাবনায় জীবন দান করতে পারলেই তবে, বুদ্ধ শাসনের প্রকৃত সেবা আমাদের দ্বারা সম্ভব হবে এবং আমাদের ভিক্ষুজীবনও ধন্য- সার্থক হবে।

শ্রদ্ধেয় বনভণ্ডে বলেন, এদেশের এই চাকমা, মারমা, বড়ুয়া গরীব কেন? অথচ হিন্দু, মুসলিমরা তো ধনী। আমি বুদ্ধজ্ঞানকে যেভাবে জেনেছি ও বুঝেছি, তাতে আমার দৃঢ় বিশ্বাস বৌদ্ধরা কোন অবস্থাতেই গরীব হতে পারে না। আসলে এই চাকমা, মারমা, বড়ুয়ারা প্রকৃত বৌদ্ধ নহে। তারা বুদ্ধ ধর্মটা প্রকৃত পক্ষে কি তা জানেও না, বুঝেও না। যদি জানত বুঝতে পারতো, তাহলে গভীর ভাবে বুদ্ধের শিক্ষাকে তারা ভালোবাসতে পারতো, বিশ্বাস করতে পারতো, তখন দেখতে যে, বিশ্বের যে কোন ধনী জাতি হতে এই বৌদ্ধরা সেরা ধনী হতে পারতো, সুখী হতে পারতো। কারণ, বুদ্ধজ্ঞানের মতো এতো সর্বোচ্চ জ্ঞান অন্য কোথাও নেই। ইসলাম, খ্রিস্টান, বা হিন্দু ধর্ম জ্ঞানের দিক থেকে তেমন উন্নত না হলেও সেই ধর্মের অনুসারীরা নিজ নিজ ধর্মের প্রতি অনুরাগটা গভীর। তাই তারা ধনী হতে পারছে। তিনি খুবই জোর দিয়ে বলেন এই বড়ুয়া, চাকমা, মারমারা যদি নিখুঁত ভাবে মনে প্রাণে যদি শুধু পঞ্চশীলটি মাত্র তিনটি বছর প্রতিপালন করে, দেখবে তারা আর গরীব থাকবে না। তিনি বলেন দেখ না, আমাকে লোকে যে প্রতিদিন এত দান করে, তা তো বুদ্ধই আমাকে দিচ্ছেন। এগুলো সবই বুদ্ধের ধন। আমি বুদ্ধকে মনে প্রাণে বিশ্বাস করেছি, মনে প্রাণে গ্রহণ করেছি বলেই লোকেও আমাকে বিশ্বাস করে, আর দান দেয়।

মহাপুরুষ বুদ্ধ পুত্র বনভন্তের এই উপলব্ধি, এই বিশ্বাসটি যে কোন বুদ্ধ অনুরাগীর পক্ষে অর্জন করা কি, অসম্ভব? আসলে আমাদের বিশ্বাসটি বড়ো দুর্বল, ইচ্ছা শক্তিটি ততোধিক দুর্বল বিধায় বৌদ্ধ বলে পরিচয় দিয়েও আজ আমরা এদেশে এতো অসহায়, এতো উপেক্ষিত জনগোষ্ঠীতে পরিণত হয়ে আছি। বড়ুয়া, চাকমা, মারমাদের অর্থনৈতিক দুর্বলতা কাটিয়ে উঠতে, সামাজিক ও ধর্মীয় শৃঙ্খলা সুদৃঢ় করতে আমি বহুস্থানে বহু ভাষণ দিয়েছি, বহু লেখা লেখেছি এবং ইদানিংকার নেতৃস্থানীদের অনেককে ব্যক্তিগত ভাবেও চিঠিপত্র বহু লিখেছি। কিন্তু না, এসবের কোন প্রতিফলন এযাবত লক্ষ্য করা গেল না। অধিকন্তু নানা বিরূপ প্রতিক্রিয়াই সম্মুখীনই কেবল হলাম, কোন কোন ক্ষেত্রে। শ্রদ্ধেয় বনভন্তেও বলেন, আমি বুদ্ধের মতো, সারিপুত্রের মতো নই যে, তোমাদেরকে তাঁদের ন্যায় বুঝাতে পারবো। দীর্ঘ ত্রিশ বছর ধরে বঝাতে চেষ্টা করলাম বুদ্ধ কি, তাঁর ধর্মটি কি। কিন্তু, এই বাংলাদেশে বুদ্ধের ধর্ম বুঝাতে পেরেছে, এমন একজন ও খুঁজে পেলাম না।

আমার প্রিয় ধর্মজ্ঞাতী, বড়ুয়া, চাকমা, মারমারা মহাজ্ঞানী বুদ্ধকে বুঝতে সক্ষম হোক, তাঁর পরম সত্য, একান্ত বাস্তব ধর্মকে অনুধাবন আর অনুশীলনের মাধ্যমে প্রত্যেকেই পরস্পর মৈত্রীময় গভীর জ্ঞাতীর বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জ্ঞাতীর সুশীতল ছায়ায় অবস্থান করুক, এই কামনা করি।

“ভবতু সর্ব মঙ্গলম্!”

এছকারের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি



বাংলা ও ইংরেজীতে বেশ কিছু গ্রন্থের লেখক ও অনুবাদক ভদন্ত- প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরা বাংলাদেশের বৌদ্ধ ভিক্ষু সঙ্ঘে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ভাবে পরিচিত দুজনশীল প্রতিভার এক উজ্জ্বল সাংখ্যিক ব্যক্তিত্ব। তিনি অতিস্বল্পতম সময়ে বৌদ্ধদের পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থ মহান ত্রিপিটকের বিভিন্ন খণ্ডের বঙ্গানুবাদ সহ বিভিন্ন সাময়িকী স্মরণিকায় বহু মূল্যবান প্রবন্ধ - নিবন্ধ লিখে বিদগ্ধ পণ্ডিত মণ্ডলী ও সুদীর্ঘ সমাজে ইতিমধ্যে সমাদৃত হয়েছেন। জাপানের নাগোয়া মহানগরীর প্রাচীনতম বিদ্যাপীঠ আই চি গাকুইন বিশ্ববিদ্যালয়, দক্ষিণ কোরিয়ার ওন-গাং বিশ্ববিদ্যালয় এবং জার্মানীর শতবর্ষীয় হামবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয়ে বুদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ বিষয়ক ভাষণ দান সহ ১৯৯০ খৃস্টাব্দ হতে বর্তমান পর্যন্ত বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বৌদ্ধ ও বুদ্ধ ধর্ম বিষয়ক আন্তর্জাতিক সভা সম্মেলনে তিনি এবারও সক্রিয় অংশগ্রহণ করে এসেছেন।

১৯৫০ খৃস্টাব্দে ২০ শে আগস্ট, বৃহস্পতিবারে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় সংলগ্ন জোবরা বৌদ্ধ পল্লীতে এই পুণ্যময় প্রতিভার জন্ম। পিতা যতীন্দ্র বড়ুয়া এবং মাতা রাজলক্ষী বড়ুয়ার ৯ সন্তানের মধ্যে তিনি সপ্তম সন্তান। গৃহী নাম সুব্রত বড়ুয়া। গৃহী জীবনে তিনি চট্টগ্রাম পলিটেকনিক কলেজে অধ্যয়ন কালে ১৯৭১ এর স্বাধীনতা যুদ্ধের সময়ে কক্সবাজার রাংকুট (রামকোট) বনাশ্রমের তৎকালীন অধ্যক্ষ বিদগ্ধনাচার্য ভদন্ত প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাথেরার প্রেরণায় প্রব্রজ্যা জীবন গ্রহণ করেন। তাঁরই শিক্ষা ও দীক্ষা ১৯৭৩ খৃস্টাব্দের ২৩শে কেব্রুয়ারী বৃহস্পতিবারে বৌদ্ধ ভিক্ষু সংঘে পবিত্র উপদাস্পদা গ্রহণ করেন।

ভদন্ত প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরার জীবনে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব ও কীর্তি সমূহ :

তিনি ১৯৮১ খৃস্টাব্দে বাংলা সাহিত্যে বি, এ, (অনার্স) সহ এম, এ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হন। ১৯৯৩ খৃস্টাব্দে পালি সাহিত্যে এম, এ - প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করেন। ১৯৮১ হতে ৮৫ খৃস্টাব্দে শ্রীলঙ্কার বিখ্যাত বিদ্যাপীঠ মহরাগমা ভিক্ষু ট্রেনিং সেন্টারে সাকল্যের সাথে চার বছরের শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ সমাপ্তির পর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন।

১৯৭৬ খৃস্টাব্দে তিনি ভদন্ত জ্ঞানশ্রী মহাথেরা প্রমুখ হিতৈষীদের নিয়ে মহামণ্ডল ধর্মীয় শিক্ষা পরিষদ গঠন করেন। ১৯৮৭ হতে ২০০৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এ সময় কালে তিনি রাউজান থানার কদলপুরে বাংলাদেশ ভিক্ষু প্রশিক্ষণ ও সাধনা কেন্দ্র, শানন দেবক পালি কলেজ, প্যারীমোহন- সুমনতিব্রা শিশু নদন, চট্টগ্রাম মহানগরীর নন্দনকানন বৌদ্ধ বিহারে ধর্মবংশ ইনিস্টিটিউট, কক্সবাজার রাংকুটে জগতজ্যোতি শিশু নদন, বিশ্বশান্তি প্যাসোডায় সৌবিন্দ- গুণালঙ্কার বৌদ্ধ ছাত্রাবাস, চট্টগ্রাম মহানগরীর মোগলটুলীতে শাক্যমুণি বুদ্ধ বিহার ও প্রজ্ঞাজ্যোতি ধ্যান কেন্দ্র, রাঙ্গামাটির বেতবুনিয়ার অভয়ারণ্য ধ্যান কেন্দ্র ও বাংলাদেশ-জাপান মৈত্রী কে, জি প্রাথমিক বিদ্যালয়, জোবরা M. W. O. & WON BUDDHISM. সম্মেলন কেন্দ্র, মহামণ্ডল কল্যাণ সংস্থা, ও প্রজ্ঞাবংশ - জ্ঞানরত্ন কাউন্সেল সহ বুদ্ধজ্যোতি আন্তর্জাতিক সংস্থা-বাংলাদেশ শাখা, এবং "শরণ" নামে আন্তর্জাতিক মানের বেশ কিছু সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানের প্রতিষ্ঠাতার ভূমিকা পালন করেন।

আমরা এই মহাকর্ম - কীর্তিমান পুণ্য প্রতিভার বুদ্ধজ্ঞানদীপ্ত দীর্ঘায়ু কামনা করছি; নিবেদন করছি বিনম্র হৃদয়ের অকৃত্রিম শ্রদ্ধা।

প্রণতঃ

মুদিতারত্ন ভিক্ষু
গহিরা শান্তিময় বিহার।